এস ডব্লিউ হকিং প্রণীত

এ ব্রীফ হিস্ট্রি অফ টাইম
ফ্রম দ্য বিগ-ব্যাং টু ব্ল্যাকহোল
পর্যালোচনা ও
হিগস-বোসন—ঈশ্বর কণা বিতর্ক

প্রফেসর মতিয়র রহমান

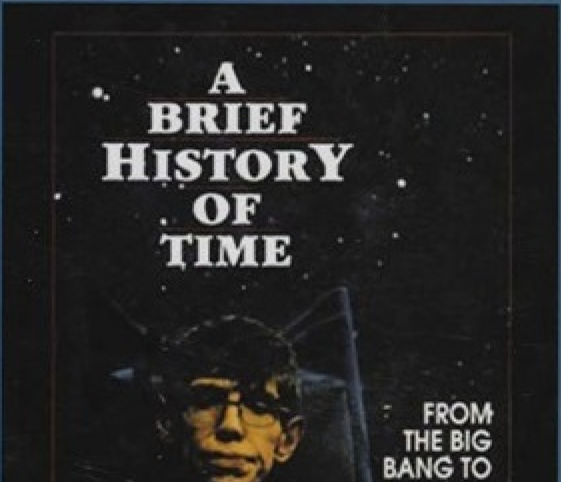

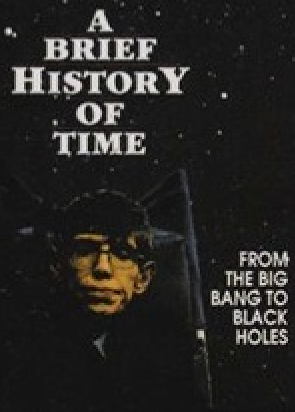

হকিং-এর বহুল আলোচিত 'এ ব্রীফ হিস্ট্রি অফ টাইম' গ্রন্থটির বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হলেও গ্রন্থটির বিষয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা বা আলোচনা হয়নি। প্রফেসর মতিয়র রহমানের 'মহাবিশ্বের স্বরূপ-শুরু ও শেষ-আলবার্ট আইনস্টাইন থেকে স্টিফেন হকিং' নামে একটি গ্রন্থ ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়। তবে তা সরাসরি এ ব্রীফ হিস্ট্রি অফ টাইম বা কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মুখ্য পর্যালোচনা ছিল না। তার লেখা এ গ্রন্থটি পাঠ করে মূল গ্রন্থটির প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ এবং সেই সাথে বর্তমানে বহুল আলোচিত হিগস-বোসন তথা ঈশ্বর কণা বিষয়ে ধারণা আরও স্পষ্ট হবে। বিজ্ঞান ও ঐতিহ্যপ্রিয় প্রফেসর মতিয়র রহমান-এর এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

—প্রকাশক

প্রচ্ছদ। শিহাব বাহাদুর

www.pathagar.com

এস ডব্লিউ হকিং প্রণীত

এ ব্রীফ হিস্ট্রি অফ টাইম

ফ্রম দ্য বিগ-ব্যাং টু ব্ল্যাকহোল পর্যালোচনা

ও

হিগস-বোসন—ঈশ্বর কণা বিতর্ক

www.pathagar.com

এস ডব্লিউ হকিং প্রণীত

এ ব্রীফ হিস্ট্রি অফ টাইম

ফ্রম দ্য বিগ-ব্যাং টু ব্ল্যাকহোল পর্যালোচনা

ও

হিগস-বোসন—ঈশ্বর কণা বিতর্ক

প্রফেসর মতিয়র রহমান

মুক্তচিন্তা

www.pathagar.com

এস ডব্লিউ হকিং প্রণীত এ ব্রীফ হিস্ট্রি অফ টাইম ফ্রম দ্য বিগ-ব্যাং টু ব্ল্যাকহোল
পর্যালোচনা ও হিগস-বোসন—ঈশ্বর কণা বিতর্ক
প্রফেসর মতিয়র রহমান

প্রকাশক
সাঈদ বাহাদুর
মুক্তচিন্তা প্রকাশনা
৭৪ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা ১২০৫
মোবাইল: ০১৭২০৬৩৫৭৮৭, ০১৭১১৫৮৭১৬৯
ইমেইল : muktochinta789@yahoo.com

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪১৯
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

© লেখক

প্রচ্ছদ
শিহাব বাহাদুর

মুদ্রণ
স্বস্তি প্রিন্টার্স
২৫/১ নীলক্ষেত, কাঁটাবন, ঢাকা

মূল্য ২০০ টাকা

ISBN : 978 - 984 - 521 - 091 - 1

A Brief History of Time from Big-Bang to Blackhole Parjalochona O
Hig-Boson—Eyssor Kana Bitarko
By Professor Matiar Rahman
Published by Muktochinta
Price Tk. 200/- US $ 20

www.pathagar.com

আলো-আঁধারের জগৎ যাদের টানে

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

হকিং নামেই যিনি সমধিক পরিচিত। পুরো নাম স্টিফেন উইলিয়াম হকিং সংক্ষেপে এস ডব্লিউ হকিং। পদার্থবিজ্ঞানে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববিজ্ঞানী। গণিতজ্ঞ। কেম্ব্রিজের লুকাসিয়ান প্রফেসর হিসেবে 'নিউটন চেয়ারে' অধিষ্ঠিত। কেম্ব্রিজের ফেলো থাকাকালীন মাত্র ২৪ বছর বয়সে মটর নিউরন রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকগণ বলেছিলেন মাত্র দুবছর বাঁচবেন। তারপরেও তিনি বেঁচে আছেন প্রায় ৪৫ বছর। তবে ঐ রোগে তার সমুদয় শরীর অবশ হতে থাকে এবং একসময় তিনি পঙ্গু হয়ে পড়েন। তিনি চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেন। হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতে থাকেন। এরই মধ্যে তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে তার বাকযন্ত্র কেটে ফেলা হয়। তিনি সম্পূর্ণ বাকরুদ্ধ হয়ে যান। কম্পিউটার যন্ত্রের কেবল সচল দুটি আঙুল টিপে তিনি তাঁর মতো প্রকাশ করেন। তাঁর সবল মস্তিষ্কটি কেবল সচল। আইনস্টাইনের নানা তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা তিনি তাঁর তত্ত্বের দ্বারা উত্তরণে সচেষ্ট। তাঁকে এ কালের আইনস্টাইন বলা হয়।

হকিং আইনস্টাইনের বিপরীতে কণাবাদী কণিকা তত্ত্বের প্রবক্তা। এ তত্ত্বকে কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান (Quantam Machanics) বলা হয়। গাণিতিক নানা রহস্যের দ্বার উন্মোচনে আইনস্টাইনের রয়েছে অনবদ্য আপেক্ষিক তত্ত্ব। কিন্তু রহস্যের প্রকৃতি দ্বার উন্মোচন কেন আপেক্ষিক তত্ত্ব দ্বারা সম্ভব নয় সে বিচ্যুতি তিনি নির্দেশ করেছেন। কেবল বিচ্যুতি নির্দেশই নয়, হকিং তাঁর তত্ত্বমত দ্বারা মহাবিশ্বের রহস্যের স্বরূপ উপস্থাপনে বিস্ময়কর বার্তা প্রদান করে চলেছেন।

প্রকৃত অর্থে তাদেরকেই বিজ্ঞানী বলা হয় যারা প্রকৃতির ভাষাকে গাণিতিক সূত্রের ভাষায় রূপায়ণ করেন। অন্য সব বিজ্ঞানীরা কেবল সেসব সূত্রের ব্যবহারে নতুন কর্ম সম্পাদন করেন। এমন সব সূত্রের সন্ধানী বিজ্ঞানীদের মধ্যে—গ্যালিলিও গ্যালিলি, নিউটন, ম্যাক্সপ্লাঙ্ক, ম্যাক্সবর্ণ, ম্যাক্সওয়েল, ব্রাউন, ওরেস্টেড, রোমার, আইনস্টাইন, ফ্যারাডে, ডাল্টন, নীলস বোর, ওপেন হেইমার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পল ডিরাক, রাদারফোর্ড, সালাম, ফাইনম্যান, স্যাডউইক, ডারউইন, হকিং এ ধারার প্রকৃতি বিজ্ঞানী। বলা যায়, এ ধারার বিজ্ঞানীদের আবির্ভাব না ঘটলে আমাদের বর্তমান সভ্যতা সাধনের জন্য তাদের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত।

www.pathagar.com

আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে অনেক বিষয়কে ভুল পর্যবেক্ষণ করি। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা দেখি পৃথিবী সমতল। বস্তুত পৃথিবী গোলাকার। সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যায়। এ দৃশ্য আমরা প্রতিদিন দেখি। কিন্তু সূর্যের উদয় অস্ত নেই। পৃথিবী তার আপন অক্ষে পশ্চিম থেকে ঘোরে তাই দিন আসে রাত যায়। আবার আমরা বাতাস দেখি না কিন্তু বায়ুমণ্ডলে বিশ্বাস করি। এরূপ জাগতিক বিষয় বা ঘটনার পশ্চাতে থাকে অন্তর্নিহিত কারণ। ঐ কারণগুলো জানা গেলে বোঝা যায় প্রকৃতির ঘটনা নিয়মবদ্ধ। নিয়মটা কী? এ প্রশ্নের উত্তর পেতেই নিয়মের সন্ধান। নিয়মটি যখন জানা যায় তখনি তা হয় সূত্রবদ্ধ বিধি। আর জানা বিধিই আমাদের পর্যবেক্ষণ সিদ্ধ করে। একে আমরা প্রকৃত সত্য বলে মেনে নেই। এভাবেই আমাদের জ্ঞান বিকাশমান। বিগত শতকের মাঝামাঝিতে মনে হয়েছিল বিজ্ঞান যে সব সূত্রের দ্বারা জাগতিক ও মহাজাগতিক সকল বিষয়ের কারণ এবং ব্যাখ্যা এমনভাবে স্পষ্ট করেছে যে সব প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে গেছি। এ সন্ধিক্ষণে হকিং কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তোলেন। এ মহাবিশ্ব কোথা থেকে? কীভাবে? এর কোনো শুরু আছে কিনা? মহাবিশ্বের উৎসই বা কী? এসব প্রশ্ন যে হকিং এর পূর্বে কেউ তোলেনি তা নয়। তবে তার উত্তর এসেছে ধর্ম ও দর্শন থেকে। কিন্তু ধর্ম ও দর্শনের এ প্রশ্নগুলোর উত্তর বিধিবদ্ধ নয়। তা যেন নানা মত নানা পথ। অর্থাৎ নানা মত নানা ভাব নিয়ে সেসব প্রশ্নে নানা স্তর বিন্যস্ত হলো। কিন্তু বিজ্ঞান সকল মতের পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণে একটি নীতিই প্রচার করে যা সকলেই এক সত্য (Generalised truth) বলে মেনে নেয়।

বস্তুত বিগত শতকের মাঝামাঝিতে (১৯৫০) বিজ্ঞানের বিধিগুলো দ্রুতই উৎকর্ষ লাভ করে যা আমাদের সমাজ, সভ্যতা, মনন চেতনা দ্রুতই পাল্টে দেয়। কিন্তু মহাবিশ্বকে নিয়ে চরম প্রশ্নটি এ বিশ্বটি কোথা থেকে? কেন? এই বিষয়ে সকলেই অনেকটা নিরুত্তর। এমনকি আইনস্টাইনও কাজটি স্বয়ং ঈশ্বরের ভেবে আর কোনো মন্তব্য করেন না। কেবলমাত্র হকিংয়ের মনোজগৎ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তিনি সকল বিধি ও উপাত্ত বিশ্লেষণ ও বিন্যস্ততায় তাত্ত্বিকতা গঠন করতে থাকেন। তিনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কণাবাদী তত্ত্বের সহযোগে বিগ-ব্যাং তত্ত্বের পরীক্ষামূলক সমীকরণ উদ্ভাবনে প্রয়াসী হন। তার এ প্রয়াস ফলাফলে ১৯৭৩ সালে কৃষ্ণগহ্বর এবং কৃষ্ণগহ্বরে বিকিরণ বিষয়ে সত্যতা প্রমাণ করেন। এ আবিষ্কার কৃষ্ণগহ্বরে অনন্যতা (Singularity) সৃষ্টি বিগ-ব্যাং তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বর তথা অনন্যতায় বিকিরণ থাকায় মহাবিশ্বের প্রচলিত আরম্ভ তত্ত্ব বিগ-ব্যাং এ সংশয়ী প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। গড়ে তোলেন 'কোয়ান্টাম গ্রাভিটি তত্ত্ব' যা মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ক নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়।

www.pathagar.com

হকিং তাঁর গবেষণাসহ মহাবিশ্বের চিত্র, মহাবিশ্বকে নিয় চিন্তন এবং নানা বিধির সমন্বয়ে রচনা করেন যুগান্তকারী গ্রন্থ এ ব্রীফ হিস্ট্রি অফ টাইম ফ্রম দ্য বিগ-ব্যাং টু ব্ল্যাকহোল (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—বিগ-ব্যাং থেকে কৃষ্ণগহ্বর)। গ্রন্থটি ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হলে যাবৎকালের সাড়া জাগানো গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়। বিপননে পশ্চাতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। গ্রন্থটির প্রতি আকর্ষণ এখনো অপরিমেয়।

তবে গ্রন্থটি নিরেট বোদ্ধাজনের কাছেও জটিল। গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ আদৌ সহজবোধ্য নয়। বলা যায় এর মূলভাব বোঝাই দায় হয়ে ওঠে। গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ আমি সংগ্রহ করি ১৯৯০ সালে। ঐ সালে মূল ইংরেজিটাও হাতে পাই। আমি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র না হওয়ায় এর পূর্বাপর কিছুই বুঝতে পারি না। দুবছর ফেলে রাখি। তবে মাঝে মধ্যে পাতা ওল্টাই। গ্রন্থটি আমাকে টানে অথচ বুঝি না এ নিয়ে বেদনাও অনুভব করি। সিদ্ধান্ত নেই পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান অধ্যায়নের। উল্লেখ্য, আমার শৈশবকাল থেকেই রহস্য ঘেরা আকাশ আমাকে টানে। আমার কর্মময় জীবনের অবসর সময়ের নিভৃত ভাবনার অনেকটা সময় কেটে গেছে আকাশ ভাবনায়। সাবসিডিয়ারী বিষয়ে পাঠ করেছি দর্শন। ধর্ম সকলেরই সাধারণ পাঠ। আমার সকল প্রচেষ্টায় গ্রন্থটিকে আয়ত্ব করতে সক্ষম হই। এরই মধ্যে আমার প্রথম গবেষণা গ্রন্থ ‘রাজবাড়ি জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রকাশিত হলে পাঠকবৃন্দ তা সাদরে গ্রহণ করেন। লেখক হিসেবে আমি আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠি। হকিং প্রণীত এ গ্রন্থটি আমার চেতনায় এমনভাবে নাড়া দেয় যে এ গ্রন্থের সারমর্ম না বুঝলে হয়ত আমি অজ্ঞানতার অন্ধকারেই থেকে যেতাম। দায়িত্ববোধ করি এ জ্ঞান অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার। এ লক্ষ্যে গ্রন্থটির মূল বক্তব্য অবলম্বন করে রচনা করি ‘মহাবিশ্বের স্বরূপ—শুরু ও শেষ-আলবার্ট আইনস্টাইন থেকে স্টিফেন হকিং’। গ্রন্থটি ‘কাশবন ঢাকা’ প্রকাশনী থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর গ্রন্থটির ভাবধারা নিয়ে একটি শিশুতোষ গ্রন্থ ‘কাল ও দুই জমজের বয়স’ কাশবন প্রকাশ করে। এরই মধ্যে ‘ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ’ কাশবন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় ‘ড. মুহম্মদ ইউনুস—নোবেল প্রাপ্তি ও দারিদ্র ভাবনার নানা প্রসঙ্গ’। আমি আবার ফিরে আসি হকিং এর চেতনায়। রচনা করি ‘সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনে বিজ্ঞান—আপেক্ষিক ও বিগ-ব্যাং তত্ত্ব’। গ্রন্থটি প্রকাশ করে মুক্তচিন্তা, ঢাকা। ২০১০ সালে হকিং প্রণীত ‘দ্যা গ্রান্ড ডিজাইন’ গ্রন্থটি ‘পরিচিতি পর্যালোচনা-ঈশ্বর প্রসঙ্গ নামে মুক্তচিন্তা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। শিহাব বাহাদুর (মুক্তচিন্তা প্রকাশনা) আমাকে অনুরোধ করে ব্রীফ হিস্ট্রিকে সহজবোদ্ধ করতে। কাজটি তখন আমার জন্য কঠিন মনে হলো কারণ আমার ঘাড়ের স্পন্ডেলাইসিস রোগটি দীর্ঘদিনে আমাকে প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছে।

www.pathagar.com

কেবল অনুরোধ নয় এ প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রী তথা পাঠকবৃন্দকে আধুনিক জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত করার দায়বদ্ধতা অনুভব করি। গ্রন্থটি লেখার শেষের দিকে ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ (সার্ন) ঈশ্বর কণা তথা হিগস-বোসন আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়। বিশ্বের সকল মিডিয়ায় এ বিষয়ে তর্কের ঝড় বয়ে যায়। বিষয়টি এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়রে সাথে অতিঘনিষ্ট। ফলে একটি অধ্যায় হিসেবে তা সংযোজন করেছি। ঈশ্বর কণা নিয়ে যাদের উৎসুক্য আছে তারা সমগ্র গ্রন্থটিতে গভীর মনোনিবেশ করলে বিষয়টি ভালো বুঝতে পারবেন বলে আশা করি। এ গ্রন্থটি খুব ভালো লিখেছি সে দাবি আমি করব না। আমার উদ্দেশ্য পাঠককে অত্যাধুনিক জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত করা। একজন শিক্ষক হিসেবে এটি আমার কাজ মাত্র। আমি আমার জন্মের ক্ষণটি জানি না। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়ে কোন আলো লেগেছিল চোখে তা আমার জানা নেই। আমার মৃত্যুর ক্ষণটিও আমি জানতে পারব না কারণ মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আসে অচেতনতা। অজানার মধ্যে আমার জ্ঞান, সমৃদ্ধি, অর্জন দান পরিতুষ্টি। যে পরিতুষ্টিতে গ্রন্থটি রচনা করেছি, যে পরিতুষ্টি পাঠককে সামান্য পরিতুষ্ট করলেও তা আমার জন্য হবে প্রেরণা। গ্রন্থটি রচনায় প্রেরণা দান ও গ্রন্থটি প্রকাশ করায় শিহাব বাহাদুরের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমার সকল গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থটির কম্পিউটার কম্পোজে স্নেহধন্য ছাত্র মকবুল হোসেন বাবুর ধৈর্য্য ও কষ্টের ঋণ স্বীকার্য। পত্র-পত্রিকার নানা তথ্য দিয়ে সহায়তা করায় স্নেহের ছাত্র ফারুকের (RDA) প্রতি আমার অশেষ স্নেহ। সবশেষে এ জটিল গ্রন্থটি আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা এবং হকিং এর তত্ত্ব, তথ্যকে আশ্রয় করে গ্রন্থটির সরলীকরণের চেষ্টা করেছি। কতটা সরল হলো তা নির্ভর করবে পাঠকের ওপর। আর এ কথাও সত্য মহাবিশ্বের রহস্য বোঝা এবং এ মহাবিশ্ব এলো কোথা থেকে? জীবনের এ জটিলতম প্রশ্নের উত্তর সহজেই পাওয়া যাবে এ কথা বলা যায় কী করে। কিন্তু পাঠক যদি সঠিক অর্থেই মহাবিশ্বকে বোঝার তাগিদে তাড়িত হন তাহলে গ্রন্থটি পাঠে কিছুটা হলেও পরিতুষ্ট হবেন। বিশেষ করে 'মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল', 'কৃষ্ণগহ্বর', 'সময়ের অভিমুখ', 'হিগস-বোসন—ঈশ্বর কণা বিতর্ক' এ অধ্যায়গুলো থেকে।

প্রফেসর মতিয়র রহমান
বেড়াডাঙ্গা, রাজবাড়ি

www.pathagar.com

উপস্থাপন

একমাত্র মানবজাতি উত্তম শৃঙ্খলায় জগৎ ও জীবন নিয়ে ভাবতে পারে। তাড়িত ভাবনায় বুদ্ধিমান মানুষ জাগতিক রহস্যের দ্বার উন্মোচনে যে সব তত্ত্ব, তথ্য ও সূত্র উদ্ভাবন করেছে সে সব তত্ত্ব ও সূত্রের প্রয়োগ ফলাফল, আমাদের অর্জিত সভ্যতা। এতদ্ব অর্জনের পরেও মানব মনের শেষ প্রশ্নটির উত্তর মিলেছে, এ কথা বলা যাবে না। এ বিশ্ব কোথা থেকে? কীভাবে? বিশ্বের কোনো শুরু ছিল কিনা? থাকলে কালের হিসেবে তা কত? অথবা বিশ্ব কি চির অস্তিমান? যার শুরুও নেই শেষও নেই। আমরাই বা এখানে কেন? কোনো কিছু না থাকার বদলে এত কিছু কেন? বা এত কিছু এলো কোথা থেকে? আমরা না থাকলে বিশ্বের কি কোনো ক্ষতি হত? অথবা এ সব সৃষ্টির পশ্চাতে কোনো স্রষ্টা আছেন? কেনই বা তিনি বিশ্ব সৃষ্টির ঝামেলা কাঁধে নিলেন? তাতে স্রষ্টার কি কোনো উদ্দেশ্য ছিল? এ বিশ্বের কি কোনো সীমানা বা কিনারা (edge) আছে? অথবা বিশ্ব কি সীমানাহীন (No Boundary)? এ সব প্রশ্ন নিয়ে অনেকেই মাথা ঘামান না, আবার অনেকেই মাথা ঘামান। তবে সকলকেই কোনো না কোনো সময়ে এ সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের নানা রহস্য উন্মোচনে মানুষ তৎপর। পৃথিবীর আকার-আয়তন, বস্তুর স্থিতি-গতি, প্রকৃতির গতি-বিধি, থেকে শুরু করে নভোমণ্ডলের আলোকজ্জ্বল সূর্য, রাতের চাঁদ, ছুটন্ত উল্কা, লেজওয়ালা ধূমকেতু, দূরের নক্ষত্রখচিত আকাশ নিয়ে মানুষ ভেবেছে। প্রশ্ন তুলেছে এতসব আয়োজনের নিগূঢ় রহস্য কী? এতসব রহস্যের অনেকটাই এখন মানুষের জ্ঞানের অধীন। এখন আমরা পৃথিবীর আকার, আয়তন নির্ভুলভাবে জানি। সৌরজগতের কাঠামো আমাদের জ্ঞানের আওতায়। আমরা এখন জানি পৃথিবী নয়, সূর্যই সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র। দূরের নক্ষত্রের আকাশ দেবতা বা জ্বীন-পরীদের রাজ্য নয়। এই পৃথিবীটা কচ্ছপের পৃষ্ঠে বা বিশাল মোষের শিং-এর ওপর ভর করে নেই। এখন আমরা জানি অন্তহীন মহাশূন্যে গণনাতীত তারকার সমাবেশ, গ্যালাক্সি, নেবুলা, উল্কাপিণ্ড, লেজওয়ালা ধূমকেতু, শ্বেতবামন তারকা, কৃষ্ণগহ্বর, সুপারনোভা, নোভা, গ্রহ, উপগ্রহ নিয়ে আমাদের মহাবিশ্ব। তবে এখনো যা আমরা সুস্পষ্টভাবে জানি না; তা' হলো এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি হলো কী করে?

মহাসৃষ্টি বিষয়ে ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুগত হলে কোনো সমস্যাই নেই। কারণ সকল ধর্মমতে (Leading Religion) বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন স্রষ্টা (God) । স্রষ্টার সৃষ্টি

www.pathagar.com

কীভাবে? ধর্মমতে এ প্রশ্নের উত্তর তিন কারণ—অতীত, স্বয়ম্ভু, স্ব-সত্ত্বায় সর্বকালে বিরাজমান।

মানুষ বিষয় বা ঘটনার কারণ জানতে চায়। কী? কেন? কোথা থেকে? কীভাবে? বিষয়ের বিবরণে এসব প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞানপিপাসু মানুষ পরিতুষ্ট হতে চায়। এ ধারাটি দর্শন ও বিজ্ঞানের। এ ক্ষেত্রে দর্শন যুক্তি ও ধারণানির্ভর। ফলে দর্শনের সিদ্ধান্ত সংশয়বাদ ব্যক্ত করে। বিজ্ঞান সেক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, সমীকরণ বা গণিতনির্ভর হওয়ায় প্রমাণভিত্তিক সত্য উপস্থাপন করে। বিজ্ঞান পুনরুৎপাদন ফলাফল প্রদর্শনে সমর্থ। বিজ্ঞান যে সূত্র উদ্ভাবন করে তার পুনঃব্যবহারে একই ফলাফল প্রাপ্তি ঘটে। ফ্যারাডে যে সূত্রে (Formula) বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছিলেন তা পুনঃপুনঃ ব্যবহারে পুনঃপুনঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। ফলে বিজ্ঞানের সূত্রে ভবিষ্যদ্বাণী (Predication) করা যায়। দর্শন ও ধর্ম এরূপ ভিত্তিভূমি থেকে বহু দূরে। তাই কেবল বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমিতে মহাবিশ্ব তথা মহাকালের সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনের দ্বারে কড়া নাড়া যায়।

বর্তমানে বিজ্ঞান নানা শাখায় বিভক্ত। তবে জাগতিক ভৌত বস্তুর গঠন, পরিমাপ, স্থিতিগতির বিষয় পদার্থবিজ্ঞান। পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ে সৃষ্টি বিষয়ে নিগূঢ় রহস্য জানা যাবে এ প্রত্যয়ে প্রাচীন ভাবুকেরা নানা মত প্রকাশ করে আসছেন। প্রকৃতির বস্তুর আচার আচরণ বুঝতে তাদের কেটে গেছে অনেক কাল। এভাবে কোনো বিষয়ে প্রকৃত ধারণা নিয়ে তার বিবরণ দিতে সমর্থ হয়েছে। এভাবে সূর্য, চন্দ্র, দেব-দেবী এ বিশ্বাস মুক্ত হয়ে সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রহ, নক্ষত্র হিসেবে চিনেছে। পরবর্তী ধাপে মানুষ বস্তুর অন্তর্নিহিত সহজাত স্বভাব খুঁজে পায় যা প্রকৃতির বিধি (Law of Nature) বলে শনাক্ত করা হয়। এসব বিধির বিস্তৃতি ব্যাপক এবং তা জটিল। বিধির গভীরে যতই প্রবেশ করেছে ততই বিধির জটিল সূত্রেরও সন্ধান পেয়েছে। এভাবে পদার্থবিজ্ঞান সৃষ্টি করেছে গুচ্ছ গুচ্ছ বিধি বা মডেল। এর মধ্যে কোনোটি বর্জন করা হয়েছে আবার ক্ষেত্র বিশেষে তা পরিশোধনে সঠিক তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তত্ত্ব বিকাশের এ ধারায় যাঁদের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত তাদের কালভিত্তিক নাম নিম্নরূপ—

খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ শতাব্দী কালের থেলস, পিথাগোরাস, এনাক্সিমিডার, এ্যামডোকলস, ইউক্লিড, এরিস্টোটল প্রমুখ। খ্রিস্টপরবর্তী—ডেমোক্রিটাস, টলেমি, ডাল্টন, কপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও গ্যালিলি, নিউটন, ফ্যারাডে, ফাইনম্যান, রাদারফোর্ড, স্যাডউইক, ডিরাক, ম্যাক্সওয়েল, ম্যাক্সপ্ল্যাংক, লরেঞ্জ, আইনস্টাইন প্রমুখ। এদের মধ্যে গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন স্মরণকালের তাত্ত্বিক। আর বর্তমান কালে যিনি নবচেতনা ও নতুন ভাবনায় শিহরণ তুলছেন তিনি এস ডব্লিউ হকিং—সংক্ষেপে স্টিফেন হকিং। তাত্ত্বিকতায় তিনি আইনস্টাইনের বিপরীতে

www.pathagar.com

কণাবাদী বলবিজ্ঞান বা কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রবক্তা। তবে তিনি কণাবাদী সকল বিজ্ঞানীদের মতামত অনুসারি নন। তাঁর বিশেষত্ব হল তিনি কোয়ান্টাম গ্রাভিটি (Quantum Gravity Theory) তত্ত্বের প্রবক্তা। সাধারণত কণাবাদী বিজ্ঞানীগণ যারা ভাবেন কেবল কণিকা তত্ত্বের দ্বারাই মহাবিশ্বের তথা পদার্থিক জগতের সকল রহস্য উন্মোচন সম্ভব। সে ধারাতেই সকল গবেষণার অগ্রগামীতায় কণাবাদী বিজ্ঞানীগণ তৎপর। এ ক্ষেত্রে হকিং অতিক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টিতে বৃহদাকার বস্তুর গঠনে যে ঘন কণিকার গুরুত্ব আরোপ করেছেন তেমনি বৃহৎ বস্তু গঠনের ক্ষেত্রে মহাকর্ষকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব যা বৃহদাকার বিশ্ব গঠনে মহাকর্ষ ক্রিয়া করে, এ বিধিকে সমুন্নত রেখে কণিকা বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব আরোপে উভয় তত্ত্বের সম্মিলনে মহাবিশ্ব গঠন তথা আমাদের সকল বিষয়ের চিন্তনের বদ্ধ জানালার দ্বার উন্মোচন করতে চান। এ বিষয়টি কোয়ান্টাম গ্রাভিটি তত্ত্বের মূল বক্তব্য। গ্রন্থটির সকল অধ্যায়ের মনোনিবেশে পাঠক গ্রন্থ থেকে তার মনের কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে পারেন। দৃশ্যমান পদার্থের মূলে আছে পরমাণু। পরমাণু গঠনে নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের উপস্থিতি। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, গঠনে অদৃশ্যমান আবেশী (Touching) কণিকা কোয়ার্ক বা অন্য নামের আরো কণিকা। হকিং কণিকা অনুসারী বিজ্ঞানী। কণিকার বিক্ষেপ, বিচরণ, আচরণ ও গতি প্রকৃতির ভিত্তি করে যে তাত্ত্বিকতা প্রদান করে চলেছেন সে সব তত্ত্ব ধারণা (Idea) ও মতামতের ভিত্তিতে অতিসন্নিকট পদার্থের গঠন কাঠামো থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের দূর-দূরান্তের বস্তুর বর্ণনা দেওয়া যায়। তাঁর তত্ত্ব ও আইডিয়ার গবেষণালব্ধ ফলাফল কৃষ্ণগহ্বর (Black hole) ও কৃষ্ণগহ্বরে বিকিরণ (Radiation) আবিষ্কার। কৃষ্ণগহ্বর গঠন এবং কৃষ্ণগহ্বরে বিকিরণপ্রভা ও ফলাফল বিশ্লেষণে জগত সৃষ্টির অন্যতম কারণের দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করেছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব যেমন অনাদিকালের সংজ্ঞার বিলুপ্তি ঘটিয়ে তা খণ্ডকালের সংজ্ঞায় আরোপিত করেন, তেমনি হকিং কৃষ্ণগহ্বরের অনন্যতা (Singularity) এবং বিকিরণে এ অনন্যতার বিলুপ্তি গবেষণায় বিশ্ব সৃষ্টির আরম্ভের কারণ ও কালের শুরু নির্দিষ্ট করেন। এ কারণে তাঁকে বর্তমান কালের আইনস্টাইন বলে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ হকিং আপেক্ষিক ও কণাবাদী তত্ত্বের সম্মিলনে কোয়ান্টাম গ্রাভিটি তত্ত্বের প্রবক্তা। আইনস্টাইন এমন স্বপ্ন লালন করতেন যে স্বপ্ন পূরণে হকিং প্রয়াসী।

হকিং তাঁর তত্ত্ব, গবেষণা, ধারণা, আবিষ্কার, মতামত, সূত্র মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও তথ্য ভিত্তিক বিবরণ গ্রন্থিত করেছেন, 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-মহাবিস্ফোরণ থেকে কৃষ্ণগহ্বর' (A Brief History of Time- From Big-Bang To Black Hole), 'কৃষ্ণগহ্বর ও শিশু মহাবিশ্ব' (Black Hole And Child Universe),

www.pathagar.com

'মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি' (Ultimate Fate of The Universe), 'কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি; 'নকশাটি মহান' (The Grand Design) গ্রন্থ সমূহে।

এর মধ্যে ব্রীফ হিস্ট্রি অফ টাইম স্মরণকালের আলোচিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিক্রির পরিমাণ দাঁড়ায় কয়েক লক্ষ কপি। গ্রন্থটির নামকরণ যথার্থ। গ্রন্থটির সারসংক্ষেপ নামকরণে নিহিত। গ্রন্থটির নামা 'A Brief History of Time–From Big-Bang To Black-Hole' অর্থাৎ কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মহাবিস্ফোরণ থেকে কৃষ্ণগহ্বর। কাল বা সময় ঘটনা জ্ঞাপক। ঘটনাহীনতায় কাল বোধগম্য নয়। প্রকৃতির বিধি এমন যে নির্দিষ্ট স্থানে যুগপৎ দুটি ঘটনার ঘটার সুযোগ নেই। টেবিলের ওপর যে বইটা রাখা হলো তা একটা ঘটনা হিসেবে টেবিলের নির্দিষ্ট স্থান দখল করল। আর একটি বই রাখতে হলে বইটার ওপরের স্থানে বা পাশে রাখতে হবে। এটি হবে দ্বিতীয় ঘটনা। ঘটনা এরূপ পর পর ঘটে। আমাদের মনে হয় সময় অগ্রগামী হচ্ছে। ঘটনার অগ্রগামীতায় আমারা পূর্বের ঘটনার সাথে পরের ব্যবধানটুকু হিসেব করে সময় মাপি। ঘড়ির কাঁটার সাথে তা তুলনা করে মাপন হিসেবে সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, অব্দ, শতাব্দী ব্যবহার করি। আমরা যদি ঘটমান ঘটনা থেকে পশ্চাতের ঘটনার দিকে মনোসংযোগে দৌড়াতে থাকি তাহলে সংযোজিত ঘটনার তালিকা বা সিরিজ তৈরি হতে থাকবে। পশ্চাতে অতীত, ঘটমান অবস্থায় বর্তমান এবং ভবিতব্য ঘটনার তালিকা প্রস্তুত ক্রিয়ায় থাকে ভবিষ্যত। বস্তুত পর পর সংগঠিত ঘটনার গতি থাকে সামনে। তাই কাল সম্মুখে অগ্রগামী।

এখন বিশ্বের সৃষ্টি ক্রিয়ায় কাল ঘটনাকে যদি পশ্চাৎগামী করা হয় তাহলে আমাদের প্রথম ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় যেখান থেকে কালের শুরু। এভাবে কালের দীর্ঘ ইতিহাস সৃষ্টি করবে। তা সত্ত্বেও প্রথম ঘটনার সূত্রপাত ঘটে থাকলে সে ইতিহাস হবে সংক্ষিপ্ত। অনেকের ধারণায় কাল অসীম। এরূপ ভাবার কারণ কালের কোনো শুরুর বিন্দু নেই। বস্তুত এমন চিন্তনের বিষয় কেবল মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে করা যায়। মহাবিশ্বের যদি কোনো আরম্ভ বিন্দু থাকে তাহলে আরম্ভ সাপেক্ষে কাল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু আরম্ভ না থাকলে কালের দৈর্ঘ্য অপরিমেয়। গ্রন্থটির নাম কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এর অর্থ কালের একটি আরম্ভ বিন্দু আছে। এই আরম্ভটি মহাবিস্ফোরণে বা বিগ-ব্যাং-এ। ফলে বিগ-ব্যাং থেকে বর্তমান পর্যন্ত সৃষ্টি বিষয়ক যে বিবর্তন ঘটনার ইতিহাস সে অর্থে গ্রন্থটি কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। A Brif History of Time from Big-Bang to Black-Hole কালের শুরু এবং কালের শেষ বিষয়ে গ্রন্থটিকে অর্থবহ করেছে। অসীম ঘনত্ব ও ভরের একক অনন্যতায় (One singularity) মুহূর্ত ক্ষণের মহাবিস্ফোরণ বা বিগ-ব্যাং-এ কালের বা সময়ের শুরু। এরূপ মহাবিশ্বের বিকাশমান ধারায় যদি কৃষ্ণগহ্বরের অনন্যতা বা সিংগুলারিটির

www.pathagar.com

সাথে সমপাতন ঘটে তবে তা হবে কালের শেষ। কারণ কৃষ্ণগহ্বরের কোনো ঘটনাই জানা সম্ভব নয়। বলা যায় ঘটনার প্রবাহে যে কাল আমরা পরিমাপ করি, সে ঘটনার সমাপ্তি। তবে নামকরণে শেষাংশ যোগ না করে কেবল Brief History of Time হলে গ্রন্থটির মূল বক্তব্যের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ হত।

কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থটি মূলত পদার্থবিজ্ঞানের একটি জটিল গ্রন্থ। ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ পাঠকের কাছে তা দুর্বোদ্ধ। তবে হকিং পদার্থবিজ্ঞানের জটিল সমীকরণ ও তত্ত্ব উপস্থাপন ছাড়া যে ধারাবাহিকতায় গ্রন্থটি রচনা করেছেন তা পাঠকবৃন্দকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে জগত সৃষ্টির তথা জাগতিক রহস্য জানতে আপেক্ষিক ও কোয়ান্টাম (কণাবাদী বা কণিকা তত্ত্ব) তত্ত্বের সমীকরণে যে সব তথ্য উপস্থাপন করেছেন তা বিশ্ববাসীকে নতুনভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। মহাবিশ্বকে নিয়ে এতকাল যে ধারণা বিজ্ঞানী, ভাবুক, দার্শনিকরা করে আসছিলেন সে সব ধারণাকে গ্রন্থটি মোচড় দিয়েছে। উপসংহারসহ মোট ১১ টি বিজ্ঞান প্রবন্ধে গ্রন্থটি রচিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১২। উপসংহারের শেষে আলবার্ট আইনস্টাইন, গ্যালিলিও গ্যালিলি এবং নিউটনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় রয়েছে। প্রবন্ধগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও চিন্তনের ধারাবাহিকতায় মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনের তলদেশে পৌঁছে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে। উপন্যাসের মতোই বিজ্ঞানের সূত্রের উত্থান পতনে শিহরিত হতে হয়। মানব মনের কয়েকটা প্রশ্ন যেমন আমরা অতীত স্মরণ করতে পারি কেন ভবিষ্যৎ বলতে পারি না? সময়ের বোধ কী? স্থান কালের ধারণা, মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং আকার আয়তন বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যা এ যাবৎকালে এভাবে কেউ জানান দেননি। গ্রন্থটির শুরু প্রাচীন জগৎ বিষয়ে প্রাচীন ধ্যান ধারণা এবং যুক্তিভিত্তিক কাঠামো সৃষ্টির প্রয়াসে শেষ হয়েছে কিছুটা সংশয়ী প্রত্যয়ে। আমার এ গ্রন্থটির রচনা চলাকালে ইউরোপভিত্তিক বিজ্ঞান সংস্থা 'সার্ন' (CERN) ঈশ্বর কণার সন্ধান পেয়েছেন যার নামকরণ করা হয়েছে 'হিগস-বোসন'। এ আবিষ্কার বিশ্বে জুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করে। ঈশ্বর কণা বা হিগস-বোসন যাই বলি এ নিয়ে নানা বিতর্ক ওঠে। হকিং এর গ্রন্থ আলোচনায় আমার তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সুবাদে অনেক ছাত্রছাত্রী এবং বোদ্ধাজনের নিকট নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হই। এ ছাড়া বিষয়টি এ গ্রন্থের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হওয়ায় আলোচিত গ্রন্থে হিগস-বোসন ও ঈশ্বর কণা বিতর্ক প্রবন্ধটি সংযোজিত হল। ফলে প্রবন্ধের সংখ্যা দাঁড়াল ১১টির পরিবর্তে ১২টি। আর তা সন্নিবেশিত হল উপসংহারের পূর্বে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১। মহাবিশ্ব নিয়ে আমাদের চিত্র / ১৯

২। স্থান এবং কাল / ২৫

৩। মহাবিশ্ব প্রসারমান / ৩৯

৪। অনিশ্চয়তাবাদ নীতি / ৪৯

৫। মৌলিক কণা এবং প্রাকৃতিক বল / ৫৩

৬। কৃষ্ণগহ্বর/ ৬৪

৭। কৃষ্ণগহ্বর অত কালো নয় / ৭১

৮। মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও পরিণতি/ ৭৫

৯। সময়ের অভিমুখ/ ১০৩

১০। পদার্থবিজ্ঞানকে ঐক্যবদ্ধ করা / ১১৫

১১। হিগস-বোসন—ঈশ্বর কণা বিতর্ক / ১২১

১২। উপসংহার / ১৩৯

১৩। তত্ত্ব ও তথ্য বিন্যাস / ১৪৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মহাবিশ্ব নিয়ে আমাদের চিত্র
Our Picture of the Universe

এটি মহাবিশ্বকে নিয়ে ভাবনার একটি ঐতিহ্যগত প্রবন্ধ। এ যাবৎকালে মহাবিশ্বকে নিয়ে কী ভাবনা করা হয়েছে এবং সে সব বিষয়ে কীরূপ মডেল ও তত্ত্ব দাঁড় করানো গেছে তা নিয়েই আমাদের মহাবিশ্বের চিত্র। পৃথিবী ও আকাশকে নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে মানুষ বিস্তর ভেবেছে। পৃথিবীর আকার আয়তন, স্থিতি গতি থেকে শুরু করে গ্রহের গতি প্রকৃতি, নক্ষত্রের সমাবেশ, মহাশূন্যতা তাদের ভাবিয়ে তুলেছে। প্রাচীনকালে বিশ্বের প্রতিরূপটি ছিল অনুমান ও কল্পকাহিনীনির্ভর। তারা ভাবত পৃথিবীটা গোলাকার আর তা কোনো কিছুর ওপর ভর করে আছে। কাছের ও দূরের তারকাদের রাজ্যকে তারা পরী বা দেবদেবীদের রাজত্ব বলে বিশ্বাস করত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অশেষ কল্যাণে মানুষ এখন বিশ্বকে নিয়ে যুক্তিভিত্তিক কাঠামো প্রস্তুত করেছে। তবে এ কাজটি সম্পন্ন হতে কেটে গেছে অনেক কাল। ধারণা, অনুমান, তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, গাণিতিক হিসেবসহ নানা মডেল ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে সে প্রতিরূপের ওপর আমরা আস্থা স্থাপন করতে পেরেছি। আমরা এখন বিশ্বাস করি পৃথিবী নয়, সূর্য সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র। পৃথিবী তার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। অন্যসব গ্রহের কক্ষ ভ্রমণের সময়ের হিসেবও জানি। এরূপ প্রতিরূপের ভিত্তিভূমি বহুলাংশে বিস্তৃত। হকিং এ অধ্যায়টি শুরু করেছেন এরূপ ভিত্তিভূমিকার পটভূমিতে। শুরুটা বেশ মজার...

> A well known scientist (some say it was Bertrand Russell) once gave a public lecture on astronomy. He described how the earth orbits around the sun, in turn, orbits around the centre of a vast collection of stars, called galaxy. At the end of the lecture, a little old lady at the back of the room got up and said, "What you have told up is rubbish. The world is really a flat plate supported on the back of a giant tortoise." The scientist gave a superior smite before replying "What is that, tortoise standing on"? You're very cleaver young man, you are very clever" Said the old lady "But it turtles all the way down."
>
> [একজন বিশেষ বিজ্ঞানী (অনেকে বলেন বার্ট্রান্ড রাসেল) একবার সাধারণ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন কীভাবে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ

www.pathagar.com

করে। আবার সূর্য কীভাবে আমাদের ছায়াপথ (মিল্কিওয়ে) অর্থাৎ বিরাট এক তারকা সমাবেশেকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে। বক্তৃতার শেষে ঘরের পিছনে থেকে ছোট খাটো এক বৃদ্ধা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এতক্ষণ আপনি আমাদের যা বললেন তা সব বাজে কথা। পৃথিবীটা আসলে চ্যাপ্টা, আর রয়েছে বিরাট এক কচ্ছপের ওপর। বিজ্ঞানী মৃদু হাসি হেসে বললেন, কচ্ছপটা কার ওপর দাঁড়িয়ে আছে? বৃদ্ধা বললেন, ছোকরা তুমি বেশ চালাক, তুমি বেশ চালাক তবে তলায় পর পর সবই কচ্ছপ রয়েছে।।

বিশ্বটা কচ্ছপের স্তম্ভ নয় এবং তা হাস্যকর। বস্তুত পৃথিবী তথা বিশ্বের আকার-আয়তন, স্থিতি-গতি এবং স্বরূপ নির্ণয় কাজ চলেছে ধাপে ধাপে। তত্ত্ব ও তথ্য বিকাশের ধারায়। ৩৪০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে এরিস্টোটল 'অন দি হ্যাভেনস' (On The Heaven's) গ্রন্থে পৃথিবীর আকার-আয়তনের আভাস দেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি মত প্রকাশ করেন পৃথিবী একটি বৃত্তাকার গোলক। তা চ্যাপ্টা থালা নয়। তিনি চন্দ্রগ্রহণকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বুঝতে পারেন চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীটা সূর্য ও চাঁদের মাঝে অবস্থান করে। পৃথিবীর ছায়া এ সময় চাঁদকে ঢেকে দেয়। এই ছায়া গোলাকৃতির। এ থেকে তিনি ব্যক্ত করেন পৃথিবীর আকার গোলাকৃতির হবে। এ ছাড়া গ্রীক নাবিকেরা দেখতে পান দূরাগত জাহাজের প্রথমে পালের মাস্তুলের অগ্রভাগ দেখা যায়। জাহাজটি যতই নিকটে আসতে থাকে ততই এর কাঠামো দৃশ্যমান হয়। পৃথিবী সমতল হলে প্রথমেই জাহাজটির সব অংশ দৃশ্যমান হত। এরিস্টোটল পৃথিবীর পরিধির একটি অনুমান করেছিলেন যা ছিল চার লক্ষ স্টেডিয়া (Stadia)। এক Stadium এর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ২০০ গজ। তবে বর্তমান কালের মাপে তা ছিল দ্বিগুণ। এরিস্টোটলের ধারণা ছিল পৃথিবী স্থির এবং কেন্দ্র বিশেষ। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকারা বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে। এরিস্টোটলের ধারণা অবলম্বন করে খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে টলেমি বিশ্বের একটি সম্পূর্ণ প্রতিরূপ প্রস্তুত করেন যা টলেমির মডেল বলে খ্যাত। টলেমির মডেলে পৃথিবী ছিল কেন্দ্র। তাকে ঘিরে চাকার ওপর চাকা (Wheels after Wheels), সেগুলো গোলকের মতো ঘোরে। সূর্য, চন্দ্র, তারকা এবং তখনকার জানা পাঁচটি গ্রহ যথা—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি গোলকের পথে পরিভ্রমণ করে। টলেমিই প্রথম একটি বিশ্বতাত্ত্বিক মডেল (Cosmological Model) প্রস্তুত করেন যা সবাই বিশ্বাস করত। খ্রিস্টিয় চার্চ এ প্রতিরূপ গ্রহণ করেছিল কারণ ধর্মশাস্ত্রের সাথে এর মিল ছিল। প্রতিরূপের সুবিধা ছিল যে গ্রহ ও তারকাগুলোর পরিভ্রমণ পথের নির্দিষ্টতা ছিল। আর গোলকের বাইরের জগৎ বিস্তৃত সেখানে স্বর্গ ও নরকের ব্যবস্থা আছে।

পৃথিবীকেন্দ্রীক টলেমির এ মডেলটি প্রায় দেড় হাজার বছর যাবৎ মানুষ বিশ্বাস করে আসছিল। কিন্তু ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে নিকোলাস কপারনিকাস নামের একজন পোলিশ

www.pathagar.com

ধর্মযাজক একটি সরলতর প্রতিরূপ উপস্থাপন করেন। কারণ টলেমির চাকার ওপর চাকার গ্রহগুলোর ঘুর্ণন ক্রিয়াটি ছিল জটিল। নিখুঁত পর্যবেক্ষণে তা মিলত না। কেন তারা ঘুরছে তার কারণও জানা যেত না। কপারনিকাসের প্রতিরূপটি ছিল পৃথিবী নয়, সূর্য কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহগুলো আবর্তন করছে। বিষয়টি প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধী হওয়ায় তিনি নিজের নাম না দিয়ে তা প্রচার করেন। তার জীবনকালে তো নয়ই একশত বছরের মধ্যে এ মতের সমর্থনে লোক ছিল না। শত বছর পর জোহান্স কেপলার এবং গ্যালিলিও গ্যালিলি কপারনিকাসের মত প্রচার করতে থাকেন। মূলত একটি ঘটনা ১৬০৯ সালে এরিস্টোটল ও টলেমির তত্ত্বের ওপর মরণ আঘাত আসে। এ বছর গ্যালিলিও তাঁর নিজের তৈরি দূরবীণ দ্বারা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি দেখতে পান বৃহস্পতি গ্রহের চাঁদগুলো (উপগ্রহ) বৃহস্পতিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এর নিহিতার্থ হল এরিস্টোটল ও টলেমির মডেল অনুসারে সব কিছুকেই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করা উচিত কিন্তু বৃহস্পতির চাঁদগুলো তা করছে না। তাহলে সব কিছু যেহেতু পৃথিবীটাকে প্রদক্ষিণ করে না, ফলে পূর্ব তত্ত্বের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। এ কাজটি করেন কেপলার। কেপলার দেখালেন গ্রহগুলোর পথ বৃত্তাকার নয় তা উপবৃত্তাকার। তিনি কপারনিকাসের সূর্য কেন্দ্রীক মডেল প্রস্তুত করেন।

কেপলারের ধারণা ছিল গ্রহগুলোকে সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে বাধ্য করে চৌম্বক বল। কিন্তু এর প্রকৃত সমাধান আসে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ বল আবিষ্কারের পর। ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে নিউটনের 'ফিলোজোফিয়া ন্যাসারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ভৌত বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে তিনি কেবল গ্রহগুলোর ঘোরাফেরার বিষয়ই উল্লেখ করলেন না, গতিগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য জটিল গণিত প্রয়োজন তাও উপস্থাপন করেন। তাছাড়া তিনি মাধ্যাকর্ষণ ও সর্বব্যাপী মহাকর্ষ বলের প্রভাব আবিষ্কার করেন যা থেকে জানা গেল কেন মহাবিশ্ব ভারসাম্য রক্ষা করে আছে।

মহাবিশ্ব নিয়ে আরেকটি চিন্তন ছিল মহাবিশ্ব সীমানায় আবদ্ধ? নাকি অসীম? মহাবিশ্ব কি স্থির নাকি এর বিস্তার ঘটছে? বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বাস করা হত বিশ্ব সীমায়িত এবং স্থির। তারা আরো ভাবত মহাবিশ্ব চিরন্তন ও অপরিবর্তনশীল। এরূপ ভাবার কারণ মানুষ জন্ম থেকে বৃদ্ধ হয়ে মরে গেলেও পরবর্তী প্রজন্ম বিশ্বকে সেভাবেই দেখে। মহাবিশ্বের কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। ফলে মহাবিশ্ব চিরন্তন এ ভাবনা অস্বাভাবিক নয়। এমনকি যারা নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্ব থেকে বুঝতে পেরেছিলেন এ তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্ব স্থিতি অবস্থায় থাকতে পারে না, তারাও মহাবিশ্ব প্রসারমান এ প্রস্তাব রাখেননি। মহাবিশ্ব যদি চিরন্তন ও স্থিতিশীল হয় তাহলে এর আরম্ভ থাকবে এ কথা বলার যুক্তি নেই। কিন্তু

www.pathagar.com

যদি এর প্রসারমানতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তার একটি আরম্ভ বিন্দু থাকতে হবে।

মহাবিশ্বের কোনো আরম্ভ ছিল কিনা এ বিষয়ে প্রাচীন কাল থেকে নানা মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে ইহুদি, খ্রিস্ট ও মুসলিম ধর্ম মতে সৃষ্টিকর্তা স্ব-ইচ্ছায় বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। যে কোনো সৃষ্টি কাল নির্দেশক। ফলে একটি বিশেষ কালে বিশ্বের শুরু। তবে শুরুর এ কাল ক্ষণ দূরতর নয়। সেন্ট অগাস্টিনের 'The City of God' (ঈশ্বরের নগর) এবং ভিন্ন আরেকটি গ্রন্থ 'The Book of Genesis' এ উল্লেখ আছে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বিশ্বের সৃষ্টি। শেষ তুষার যুগের শেষ কাল ছিল দশ হাজার বছর পূর্বে। অনেকে এখন হিসেবে করে মনে করেন বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে শেষ তুষার যুগের পরে। কিন্তু বিজ্ঞান বর্তমানে সূর্যের বয়স হিসাব কষেছে প্রায় ৫০০ কোটি বছর। আর পৃথিবীর বয়স প্রায় সাড়ে চারশত কোটি বছর।

মহাবিশ্বের যদি শুরু থাকে তাহলে কালেরও শুরু থাকবে। মহাবিশ্বের শুরু যখন থেকে, কালের শুরু তখন থেকে। তা সত্ত্বেও শুরুর পূর্বে কালের বোধ মানসপটে ভেসে ওঠে। শুরুর পূর্বে কাল কী অবস্থায় ছিল? ধর্মমতে স্রষ্টাই সেখানে কালের জ্ঞাপক। স্রষ্টা চিরন্তন, ফলে কালও চিরন্তন। স্রষ্টার সৃষ্টির পরের কাল এবং সৃষ্টির পূর্বের কালের ভিন্ন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। আমরা সৃষ্টির পরের কালের বিবরণ পাই কিন্তু পূর্বের কালের বিবরণ দিতে পারি না। প্রশ্ন জাগে সৃষ্টির পূর্বের অসীম কালে স্রষ্টা কী করছিলেন? আবার কেনইবা তিনি বিশ্ব সৃষ্টির মাধ্যমে কালের শুরু করলেন? এমন সব চিন্তায় এরিস্টোটল ও নিউটন চিরন্তন, স্থির বিশ্বে বিশ্বাস করতেন। এ বিশ্ব চিরকাল এমনি বিরাজ করছিল। ফলে স্রষ্টার সহগামী বিশ্ব তথা কাল চিরন্তন, শাশ্বত, স্থির। পরম স্বত্ত্বায় স্থান ও কাল পরম (Absolute)।

১৯২৯ সালে এক যুগান্তকারী ঘটনা স্থির মহাবিশ্বের (Static Universe) ধারণা বদলে দেয়। এ বছর এডুইন হাবল তাঁর আবিষ্কৃত উন্নত টেলিস্কোপ দ্বারা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন দূরের গ্যালাক্সিসমূহ একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর অর্থ বিশ্ব স্থির নয়। এ থেকে ধীরে ধীরে প্রতিয়মান হতে থাকে বিশ্ব প্রসারমান বা বিস্তারণশীল। আর বিশ্ব প্রসারণ হলে এ কথাও ভাবা যায় বিশ্বের কোনো আরম্ভ বিন্দু ছিল সেখান থেকে কালের শুরু। কালের এ শুরু হতে পারে অসীম ঘনত্বরূপ অনন্যতায় মহাবিস্ফোরণ থেকে। যাকে বিগ-ব্যাং বলা যায়। এই অসীম ঘনত্বরূপ অনন্যতা (Singularity) আয়তনে ছিল শূন্য প্রায়। কিন্তু ভর ছিল অসীম। বিগ-ব্যাং থেকে মহাবিশ্ব তথা কালের শুরু এমনটি বর্তমান বিজ্ঞানের বিশেষ গবেষণার বিষয়।

www.pathagar.com

মহাবিশ্বকে নিয়ে আমরা যে ভাবনাই করি না কেন, এর সঠিক বিবরণ পেতে হলে বিজ্ঞাননির্ভর হতে হবে। নিছক চিন্তা, যুক্তি এবং কাহিনীনির্ভরতায় এর কূল কিনারা সন্ধান সম্ভব নয়। এ কথা বলার অর্থ মহাবিশ্বকে নিয়ে আমরা যতটুকু জেনেছি তা বিজ্ঞানের তত্ত্ব, সূত্র এবং সমীকরণলব্ধ জ্ঞান। বিশ্ব প্রকৃতি যাদৃচ্ছিক নয়। এর সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাষা আছে। ধারণা করা হত এ বিধিগুলো জানা গেলে বিশ্বের চরিত্রও বোঝা যাবে। তবে মহাবিশ্বের বিস্তৃতির মতো এর বিধিও বিস্তৃত। ফলে যে কোনো একটি সাধারণ বিধি জানা গেলে বিশ্বকে বর্ণনা দেওয়া যাবে এমন কথার হেতু নেই। আমরা মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, প্লাবন কেন হয় তার বিধি জানি। কিন্তু তা দিয়ে বিশ্বের সামগ্রিক বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মহাবিশ্বের একটি সামগ্রিক প্রতিরূপ আছে। তা জানার কৌশল কী? এটাই বড় প্রশ্ন। সমগ্র বিশ্বের বিধি আমরা তাৎক্ষণিক জেনে যাব এমন কথা বলার কোনো অর্থ নেই। তবে সে সব সামগ্রিক বিধির মধ্যে যতটুকু আমরা জেনেছি তা আমাদের আশা জাগায় এই ভেবে যে, অজানা অন্যসব বিধির উদ্ভাবনে বিশ্বের সৃষ্টিসহ এর প্রকৃত অবস্থান, আয়তন, অস্তিত্ব, পরিণতি জানা সম্ভব।

প্রকৃতির বিধি অর্থ প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতিকে আমরা নিয়ম ভঙ্গ করতে দেখি না। তরল পদার্থ সব সময়ই ঢালু দিক অনুসরণ করে। বৃক্ষের বৃন্তচ্যুত ফল ভূতলগামী হয়। কখনো তা উপরে ধাবমান হয় না। এরূপ অসংখ্য নিয়ম আমরা লক্ষ্য করে বলি এটি স্বাভাবিক ঘটনা। স্বাভাবিক ঘটনা পর্যবেক্ষণে বিশ্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝা যায় না। তা বুঝতে হলে বিধিগুলো যে উপাদানে সংগঠিত হচ্ছে ঐ সমস্ত উপাদানের পরিমাপিত সংখ্যা আরোপ করতে হবে। যেমন এরিস্টোটল বলতেন বিশ্ব আগুন, পানি, মাটি, বাতাস, শূন্যতার নামান্তর। এখানে উপাদানের সংখ্যা ভিত্তিক পরিমাপ নেই যা দ্বারা পদার্থ সৃষ্টির বিধি বা সূত্র আছে। এটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও অনুমান ভিত্তিক। পক্ষান্তরে নিউটনের বিধি উপাদানের পরিমাণভিত্তিক পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তথা মহাকর্ষ বিধি বস্তুর ভর ও দূরত্ব ভিত্তিক পরিমাপ। ভর যত বেশি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও তত বেশি। এছাড়া মহাকর্ষ বল ব্যবস্থানুপাতে হ্রাস পায়। সূর্য ও পৃথিবীর বর্তমান দূরত্বে যে মহাকর্ষ শক্তি, দূরত্ব দ্বিগুণ হলে এ শক্তি অর্ধেক হবে। ফলে নিউটনের তত্ত্ব বা সূত্র থেকে সঠিক বিবরণ পাওয়া যায়। ফলে এটি এরিস্টোটল তত্ত্ব থেকে ভালো এবং তা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (scientific theory)।

বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য হল এমন একটি তত্ত্ব (Single Theory) উদ্ভাবন করা যা বিশ্বের সকল কিছুর তত্ত্ব হিসেবে বিশ্বের সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে পারে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান দুটি ধারায় চলমান আছে এবং দুটি প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায়। প্রথমটি হল কালে মহাবিশ্বের কিরূপ পরিবর্তন হয় সে সম্পর্কে একগুচ্ছ বিধি। দ্বিতীয়টি হল

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের আরম্ভ বা প্রারম্ভিক অবস্থার প্রশ্ন। অনেকের ধারণা বিজ্ঞানের কেবল প্রথম অংশটি নিয়ে ভাবা উচিৎ। বিশ্বের আরম্ভের প্রশ্নটা অধিবিদ্যা অথবা ধর্মের। এ বিষয়ে হকিং এর বক্তব্য—ঈশ্বর মহাবিশ্বকে যেমন ইচ্ছা তেমন করেই সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তা শৃঙ্খলায় বিরাজিত। বিশ্ব সুনিয়ন্ত্রিত বিধি দ্বারা পরিচালিত। এই বিধিগুলো জানা গেলে বিশ্বের আরম্ভের কারণটি জানা সম্ভব।

বিজ্ঞান এখন নানা বিধির উদ্ভাবনে আমাদের চারপাশের প্রকৃতির ঘটনার কারণ বা ব্যাখ্যা দিতে পারে। বাতাসের গতি-প্রকৃতি, ঝড়, প্লাবন, বৃষ্টিপাত, ভূ-কম্পন, অগ্নিগিরিসহ প্রকৃতির নানা ঘটনার বিধি এখন আমরা জানি। দূর আকাশের নক্ষত্র, গ্রহের অবস্থান, আয়তন, ঘুর্ণন, চলাচলের বিধিও আমরা জানি। তাছাড়া বৃহৎ বস্তুর গঠন থেকে শুরু করে পরমাণুর গঠন,এমনকি আরো ক্ষুদ্র কণার (ইলোকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন) আচরণ বিচরণের বিধিও জানি। এসব বিধির সমাবেশকে বিজ্ঞান মোটা দাগে দুই ভাগে বিভক্ত করে বিশ্বের বিধি বুঝতে চায়। এর এক ভাগে আপেক্ষিক তত্ত্ব, অন্যভাগে কোয়ান্টাম তত্ত্ব (বিশেষ অর্থে কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান) এ দুটি তত্ত্ব বিগত শতাব্দীর বিশাল কৃতিত্ব।

আপেক্ষিত তত্ত্ব বিশেষ করে ব্যাপক আপেক্ষবাদ (General Theory of Relativity) অনুসারে মহাকর্ষীয় বল, মহাবিশ্বের বৃহৎ মানের গঠন সম্পর্কে বিবরণ দান করে। যে গঠনের মাপ মাত্র কয়েক ইঞ্চি থেকে শুরু করে মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন (একের পৃষ্ঠে চব্বিশটি শূন্য) পর্যন্ত পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের রূপ। অন্যদিকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা কণাবাদী বলবিজ্ঞানের কাজ অতিক্ষুদ্র মানে পরিঘটনা নিয়ে। যথা এক ইঞ্চির এক মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ। যেমন অতিক্ষুদ্র বস্তুর গঠনে পরমাণু। পরমাণু গঠনে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। এসবের গঠনে আরো ক্ষুদ্র কণা প্রতিকণা।

সর্বশেষ হকিং এ অধ্যায়ে যা বলেছেন তাই এ গ্রন্থের মূল বক্তব্য। তা হল তত্ত্ব দুটি ত্রুটিমুক্ত নয়। ফলে প্রচেষ্টা হল এমন একটি তত্ত্বের সন্ধান করা, যার ভিতরে দুটি (আংশিক তত্ত্ব বা Partial theory) থাকবে। সেটি হতে পারে মহাকর্ষ সম্বন্ধীয় কোয়ান্টাম তত্ত্ব (Quantum Gravity Theory)। এ রকম তত্ত্ব আবিষ্কার হয়তো দেরি হতে পারে। তার পরেও এমন তত্ত্ব আবিষ্কার হবে না, তা নয়। কারণ সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ বিভিন্ন ঘটনাকে ব্যাখ্যার অতীত ভেবে সন্তুষ্ট হয়নি। মানুষ আশা করেছে বিশ্বের অন্তর্নিহিত নিয়ম বুঝতে। আমরা জানতে চাই কেন আমরা এখানে এসেছি? কোথা থেকে এসেছি? আমরা জানতে চাই, যে মহাবিশ্বে আমরা বাস করি তার সম্পূর্ণ বিবরণ। এ আলোকে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে হকিং বিশ্ব প্রকৃতির প্রচলিত তত্ত্বের গভীরতর ব্যাখ্যা উপস্থাপনসহ নিজের তাত্ত্বিকতা তুলে ধরেছেন।

www.pathagar.com

স্থান এবং কাল
Space and Time

এ অধ্যায়ে হকিং বিশ্বের গতি প্রকৃতি বিধি মোতাবেক উপস্থাপন করেছেন। আমরা যা সাধারণ পর্যবেক্ষণে অবলোকন করি তার অন্তর্নিহিত বিষয় কী? এ অধ্যায়ে তা জানা যাবে। অধ্যায়ের নাম স্থান এবং কাল। প্রচলিত অর্থে স্থান হল জায়গা, কাল-সময়। কিন্তু যখন আমরা স্থান ও কালের ব্যাপ্তি নিয়ে গভীর ভাবনায় নিমগ্ন হই তখন বিহ্বল হয়ে পড়ি। আমি যেখানে এখন বসে লিখছি যেমন স্থান, পৃথিবীর সমগ্র পৃষ্ঠতলও স্থান। আমরা যখন শূন্যে হাত মেলে ধরি সে শূন্যতা যেমন স্থান, তেমনি মহাশূন্যের দিকে যখন দৃষ্টি মেলাই তাও স্থান। কাল বিষয়ক প্রশ্নে আমাদের ঘড়ির কাঁটায় এক টিকের সময় এক সেকেন্ড থেকে মিনিট, ঘণ্টা, দিন, বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দীতে কালের প্রবাহ। স্থানের ব্যাপ্তি কতদূর তা যেন আমরা জানি না, সময়ের প্রান্তও ছুঁতে পারি না। শূন্যতার সীমান্ত বোধ এবং সময়ের প্রান্ত ছোঁয়ার সূত্র কী? সাধারণ দৃষ্টিতে স্থান এবং কাল ভিন্ন মনে হয়। স্থানে ঘটনা ঘটে এবং আমাদের মনে সময়ের বোধ জন্মে। আমরা ঘটনার স্থানকে 'স্থান' বলি এবং ঘটনার কালকে 'কাল' বলি। ফলে স্থান এবং কালের সংজ্ঞায় স্থান একটি বিষয় এবং কাল অন্য আর একটি বিষয়। ক নামক স্থানে খ নামক এক ব্যক্তি রাত ১১ ঘটিকায় শয়ন করল। এখানে ক নামক স্থান এবং সময় ১১টা একক সম্পর্কে আবদ্ধ নয়। স্থানের মতো স্থান, সময়ের মতো সময়। এ অধ্যায়ের স্থান ও কালের এমন সংজ্ঞা বদলে মহাবিশ্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে একক সম্পর্কে স্থান কাল (Space and Time) ব্যক্ত হয়েছে। এ অধ্যায়ে গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইনের যুগান্তকারী তত্ত্বসমূহের আলোকে জাগতিক বিধির বিশ্লেষণধর্মী উপস্থাপনসহ নব ভাবনা ও ধারণা ব্যক্ত করেছেন।

অধ্যায়টি শুরু হয়েছে এরিস্টোটল, গ্যালিলিও ও নিউটনের বিশ্বের প্রতিরূপ উপস্থাপনায়। জড় পদার্থকে আমরা অনড়, স্থির ও স্থবির অবস্থায় দেখি। বস্তুর অন্তর্নিহিত ধর্ম কি স্থবিরতা, নাকি গতিময়তা? বস্তুর স্থিতি ও গতির প্রশ্নসহ আলোর গতির মুখে পরিঘটনার বিবরণ কী? এ বিষয়ে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব উপস্থাপন এবং সে তত্ত্বের আলোকে নানা অজানা রহস্যের দ্বার উন্মোচনে হকিং সচেষ্ট হয়েছেন।

এরিস্টোটল ভাবতেন বস্তুর ধর্ম স্থিরতা রক্ষা করা। সকল স্থিতিশীল বস্তুই চিরন্তন

www.pathagar.com

স্থিতিশীল। এরিস্টোটল ভাবতেন তা গতিশীল হয় বাইরের কোনো বল বা শক্তি প্রয়োগের দ্বারা। যে পুস্তকটি আমার টেবিলে আছে তা স্থিতিশীলতাই রক্ষা করবে। আমার হাতের বলের দ্বারাই তা কেবল গতিশীল হয়। জড়বস্তুর এমন স্থিতিশীলতার ধারণায় এ্যারিস্টোটল বিশ্বাস করতেন বিশ্ব অনড়, স্থবির ও চিরন্তন। এরূপ চিন্তনের পরিবর্তন ঘটান গ্যালিলিও (মৃত্যু ১৬৪২)। পদার্থের গতি প্রকৃতি নিয়ে তিনি বিস্তর ভাবতেন। কপারনিকাসের তত্ত্বের সমর্থন করায় নানারূপ প্রতিবাদ এবং নাজেহাল হতে হয়। এরিস্টোটলীয় ধারণার পরিবর্তে তিনি ঘোষণা করেন বস্তুর ধর্ম স্থিতিশীল হওয়া নয়। এর ধর্ম গতিশীল হওয়া। পূর্বে ধারণা করা হত যেহেতু বস্তুর ধর্ম স্থিতিশীলতা ফলে বেশি ওজনের বস্তু এবং কম ওজনের বস্তু ওপর থেকে ছেড়ে দিলে বেশি ওজনের বস্তুটির পতন আগে হবে। গ্যালিলিও পিসা নগরীর উঁচু হেলান টাওয়ার থেকে বিভিন্ন ওজনের প্রস্তরখণ্ড ছেড়ে দিয়ে বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন তাদের পতন একসাথে হয়। কেবল তাই নয় দ্রুতির হারও সমান। পতনের গতির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। প্রথম সেকেন্ড যদি তা হয় ৫ মিটার, দ্বিতীয় সেকেন্ড দ্বিগুণ এবং পরবর্তী সেকেন্ডগুলোতে এভাবে বৃদ্ধি পায়। এই দ্রুতির হার সকল ওজনের বস্তুর ক্ষেত্রে সমান। এর অর্থ গতির ক্ষেত্রে বস্তুগুলো বিশেষ নিয়মবিধি মেনে চলে। গ্যালিলিও ধারণা দেন স্থিতিশীল বস্তু আসলে গতিশীল হতে চায় কিন্তু অজানা কোনো বল গতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। তখন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে গতির ভাষা সৃষ্টি হয়ে ওঠেনি।

বস্তুর ধর্ম আসলে কী, তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় ১৬৮৭ সালে নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা' (Principia Mathematica) প্রকাশ হওয়ার পর। নিউটনের তিনটি ঐতিহ্যগত বিধি থেকে স্পষ্ট হল জড় বস্তুর স্থিতিশীলতা নয় গতিশীলতাই বস্তুর ধর্ম। মূলত নিউটন গ্যালিলিওর গতির বিধিকে ভিত্তি করেন। নিউটনের প্রথম বিধি জানান দেয় কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করলে বস্তুটি সরল রেখায় একই দ্রুতিতে চলতেই থাকবে যদি দ্রুতির ক্ষেত্রে বিপরীত বল প্রয়োগ না করা হয়। নিউটনের দ্বিতীয় বিধি বস্তুপিণ্ডের ওপর প্রযুক্ত বলের দ্রুতির হার ব্যাখ্যা করে। বল যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে দ্রুতির হারও দ্বিগুণ হবে। তবে বস্তুপিণ্ডের ভরের সাথে গতির সম্পর্ক বিপরীত। ভর যত বৃদ্ধি পাবে, গতি তত হ্রাস পাবে।

নিউটন গতির বিধি ছাড়াও অন্য আর একটি বিধি আবিষ্কার করেন তা হল মহাকর্ষীয় বলের বিধি। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ বিধির (Law of Gravitation) আবিষ্কারকর্তা বলে আমরা সবাই জানি। ছোড়া তীর সরল রেখায় চিরন্তন চলতে থাকবে এটাই ছিল প্রথম বিধির প্রস্তাবনা। কিন্তু দেখা যায় তা বাঁকাপথ সৃষ্টি করে ভূতলে পতিত হয়। কথিত আছে নিউটন আপেলের পতন দেখা মাত্রই মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন। আসলে গতির প্রশ্নে নিউটন নানা ভাবনায় বিভোর থাকতেন।

www.pathagar.com

হয়ত আপেলের পতন তার চিন্তার মোড় ফিরিয়েছিল। কোন শক্তি আপেলকে টেনে নামায়। যা হতে হবে সমগ্র পৃথিবীর ভরের শক্তি। মাধ্যাকর্ষণ বল বলে আমরা এখন যা সহজে বলে দেই।

নিউটন মাধ্যাকর্ষণকে বিধিতে আরোপ করেন, যা মাহকর্ষ হিসেবে প্রতিটি বস্তু প্রতিটি বস্তুকে আকর্ষণ করে। নিকট দূরত্বে এ আকর্ষণ তেমন বোঝা যায় না। কিন্তু পৃথিবী, সূর্য, চাঁদসহ অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে একের প্রতি অপরের মহাকর্ষ টানে মহাবিশ্ব ভারসাম্য রক্ষা করে আছে। এই আকর্ষণ বল আবার প্রতিটি বস্তুপিণ্ডের ভরের সমানুপাতিক। যে ভরে একটি বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে ঐ বস্তুর ভর দ্বিগুণ হলে আকর্ষণ বল দ্বিগুণ শক্তিশালী হবে। সকল বস্তুর টান ভরের সাথে সমানুপাতিক হওয়ায় মহাকর্ষ সকল বস্তুকে একই ভরে টানে। ফলে সকল বস্তুর পতন একই সাথে হয় (যে বিষয়টি গ্যালিলিও পরীক্ষা করেছিলেন)। মহাকর্ষ বিধির অন্য আর একটি বিশিষ্টতা হল তা দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল। বস্তুপিণ্ডগুলোর দূরত্ব যত বেশি হবে মহাকর্ষ টানের বল তত কম হয়। দূরত্ব দ্বিগুণ হলে মহাকর্ষীয় বল অর্ধেক হবে। দূরত্ব অর্ধেকে নেমে এলে মহাকর্ষীয় বল দ্বিগুণ হবে। সূর্য ও পৃথিবী যে দূরত্বে অবস্থান করে একে অপরের টানে ভারসাম্য রক্ষা করে আছে, সে দূরত্ব সামান্য কম হলে পৃথিবীর কক্ষপথ বৃত্তাকার না হয়ে তা হবে সর্পিল। এক্ষেত্রে সূর্যের টানে পৃথিবী সূর্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। অন্যদিকে দূরত্ব বেশি হলে পৃথিবীর প্রতি সূর্যের টান কম হওয়ায় পৃথিবী সূর্যের টান থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বের অন্য কোথাও ভেসে যাবে। মহাকর্ষ বিধিতে কেবল আপেলের পতনের গতি, ভারি ও হালকা বস্তুর পতনের গতি জানা গেল না, সূর্যকেন্দ্রীক গ্রহসমূহের পরিভ্রমণের বৃত্তাকার/ উপবৃত্তাকার পথের নির্ভুল পরিমাণ জানা গেল। নিউটনের তত্ত্বে সৌরমণ্ডলের প্রতিরূপ অধিকতর যুক্তিকাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত হল।

নিউটনের গতি বিষয়ক সূত্রসমূহ জড় বস্তুর পরম স্থিরতা তথা মহাবিশ্বের চির অস্তিত্বের ধারণার মোড় পাল্টে দেয়। এরিস্টোটল বস্তুর পরম স্থিরতা ভেবে নিলে গতির মান শূন্য হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ সব কিছুই যদি স্থিতিশীল হত তাহলে আমরা সব কিছুই স্থিতিশীল দেখতাম। গতির ভাষা থাকত অজানা। তেমনি সব কিছুই যদি গতিশীল হত তাহলে স্থিতির ভাষা বোঝা যেত না। আমাদের চারপাশের ঘটনায় এমন পরম স্থিতিশীলতা এবং পরম গতিশীলতার দৃশ্য দেখি না। আমাদের চারপাশের ঘটনায় গতিশীলতা ও স্থিতিশীলতার দৃশ্য দেখি। দুটি স্থিতিশীল বস্তুর মধ্যে একটি গতিশীল হলে স্থিতিশীল বস্তুটি সাপেক্ষে অন্যটি গতিশীল এ ভাষা বোঝা যায়। ফলে গতির ভাষা বুঝতে সাপেক্ষ (Reference body) প্রয়োজন। এরূপ রেফারেন্স বডি থেকে গতির মান বা গতির হিসেব নির্ণয় করা যায়। নিউটনের তত্ত্বসমূহ থেকে এই ফলশ্রুতি পাওয়া গেল।

www.pathagar.com

বস্তুত বস্তু স্থিতিশীল বা গতিশীল যে ঘটনাতেই একে আরোপ করা হোক তা স্থান বিশেষে ঘটে। ফলে স্থানের মান কী হবে? স্থানও কি বস্তুর মতো গতিশীল হবে? আমরা তো সব সময়ই অনড়, স্থবির স্থানকে দেখি। স্থানের গতিশীলতা কি আসলে প্রযোজ্য? ধরা যাক চলমান ট্রেনের কামরায় একটা লোকের হাতের পিংপং বল দুইবার ঠোক্কর দিল। ট্রেনের দর্শক দেখছে পিংপং বলটি একই স্থানে পর পর ঠোক্কর দিল। কিন্তু ট্রেনের বাইরের দর্শক দশ গজ ব্যবধান স্থানে ঠোক্কর দেখবেন। কারণ দুই ঠোক্করের মাঝে ট্রেনটি দশ গজ অতিক্রম করেছে। এমন পর্যবেক্ষণে স্থান তার পরম অস্তিত্ব হারায়। কিন্তু নিউটন ও এরিস্টোটল উভয়েই স্থানের পরম অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। আর এমন ফলাফলে তিনি উদ্বিগ্নও ছিলেন। উদ্বিগ্নতার কারণ ঈশ্বরের পরম অস্তিত্বের প্রতি তাঁর অটুট বিশ্বাস। যে পরম অস্তিত্বে ঈশ্বর অন্তহীন কালে বিরাজিত। সে অস্তিত্বের বোধে স্থান ও কাল হয়ে ওঠে পরম স্থিতিশীল ও অচঞ্চল।

নিউটনের বিশ্বাসে স্থান এবং কাল পরম অবস্থান গ্রহণ করায় দুটি স্থানের দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী কাল নিশ্চিতভাবে মাপা সম্ভব। মাপনক্রিয়া যেভাবেই করা হোক কালের পরিবর্তন হবে না। 'ক' ২০০ মিটার দুরত্ব ২ মিনিটে দৌড়ে অতিক্রম করল। দুজন পর্যবেক্ষক উভয়ের ঘড়িতে একই সময় মাপন করবেন। অবশ্য স্বল্পগতির ক্ষেত্রে সকলেই তাদের ঘড়িতে দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তী কালের একই মাপন হিসেব করবেন কিন্তু ঘটনা যদি দ্রুত গতি বা আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে ঘটে তাহলে ভিন্ন ভিন্ন দর্শক তাদের ঘড়িতে ভিন্ন ভিন্ন মাপন দেখবেন। এ ছাড়া কাঠামো পরিবর্তন হলেও কালের পরিমাপ সকল দর্শকের নিকট অভিন্ন হবে না। ভিন্ন ভিন্ন কাঠামো থেকে ভিন্ন ভিন্ন দর্শক ভিন্ন ভিন্ন কাল পরিমাপ করবেন।

ধরা যাক, একটি জেট প্লেন ঘণ্টায় ৫০০ মাইল গতিতে চলমান। প্লেনের মধ্যে একজন লোক ঘণ্টায় ৫ মাইল বেগে হাঁটছে। প্লেনের কাঠামোতে যে দর্শক আছেন তারা দেখছেন লোকটি ঘণ্টায় ৫ মাইল বেগে হাঁটছেন। কিন্তু যারা পৃথিবীর কাঠামোতে আছেন তারা দেখবেন প্লেনের গতির সাথে ঘণ্টায় ৫০০ মাইল বেগে হাঁটছেন।

বিষয়টি আলোর গতি মুখে হলে কী ফলাফল বয়ে আনতে পারে নিউটনের পর থেকেই এ ভাবনায় বিভোর ছিলেন তত্ত্ববিজ্ঞানী ও দার্শনিক ভাবুকবৃন্দ। আলোক দ্রুত গতিশীল তা জানা ছিল কিন্তু আলোকের গতি সীমিত কিনা তা তখন জানা ছিল না। ফলে আলোর অসীম বেগের সাথে পরিঘটনার তত্ত্ব বিকাশ ঘটেনি। তবে আলোকের গতি সসীম কি অসীম এ বিষয়ে বিস্তর ভাবনা চলছিল। এ বিষয়ে ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্রিস্টেনসন রোমার ধারণা দেন আলোক সীমিত গতিতে চলমান। রোমার লক্ষ্য করেছিলেন বৃহস্পতি গ্রহ যত দূরে

www.pathagar.com

থাকে তার চাঁদগুলোর গ্রহণও তত দেরিতে দেখা যায়। তার যুক্তি ছিল, আমরা যখন দূরে অবস্থান করি তখন বৃহস্পতির চাঁদগুলো থেকে আগত আলোক আমাদের কাছে দেরিতে পৌঁছায়। অর্থাৎ সময় বেশি লাগে। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় চাঁদগুলোর দূরত্ব থেকে আলো পৃথিবীতে যতটুকু সময়ে পৌঁছাল তা হিসেব করে আলোর গতির হিসেব করা যায়। রোমার একটি হিসেব তখন করেছিলেন। তাঁর হিসেবে আলোর গতি ছিল সেকেন্ডে ১ লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল। অবশ্য সঠিক মাপ ১ লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

আলোক বিস্তার সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব আসে জেমস ম্যাক্সওয়েল, লয়েঞ্জ, মিসেলসন মর্লির থেকে। ম্যাক্সওয়েল আলোককে রেডিও তরঙ্গ (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ১ মিটার বা সামান্য বেশি), মাইক্রোওয়েভ (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কয়েক সেন্টিমিটার), অবলোহিত (এক সেন্টিমিটারের দশ হাজার ভাগের এক ভাগের বা সামান্য বেশি)। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটারের চল্লিশ মিলিয়ন ভাগ থেকে আশি মিলিয়ন ভাগের মাঝামাঝি। এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলোর নাম অতিবেগুনী, রঞ্জনরশ্মি (X-Ray), গামা রশ্মি (Gama Ray)।

ম্যাক্সওয়েলের ধারণা ছিল আলোক তরঙ্গ স্থির গতিতে চলমান। তবে নিউটনের পরমকালের মাপনে কী সাপেক্ষে তা মাপা যাবে? তখন ধারণা করা হল সমস্ত শূন্যস্থান ইথার বলে একটি পদার্থে পূর্ণ। অতএব ইথার সাপেক্ষে তা চলমান এবং পরিমাপ সম্ভব। কিন্তু ১৮৮৭ সালে আলবার্ট মিসেলসন (তিনিই প্রথম আমেরিকান যিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পান) এবং এডওয়ার্ড মার্লি এক পরীক্ষায় দেখেন তা নির্ভুল ভাবে মাপা হয় না। ১৮৮৭ থেকে হেনরি লরেঞ্জসহ মিসেলসন ও মার্লির পরীক্ষা নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এর একটি বিশেষত্ব ছিল কাল্পনিক ইথার নামক পদার্থের মধ্য দিয়ে দ্রুত চলমান বস্তুপিণ্ডগুলো সঙ্কুচিত হয় এবং ঘড়ির কাঁটা ধীরতর হয়। এর অর্থ প্রচলিত (পরমকালের) পরিমাপনে বিচ্যুতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে উচ্চতর বিধির প্রতিস্থাপন প্রয়োজন। ১৯০৫ সালে সুইজারল্যান্ডের প্যাটেন্ট অফিসের একজন অখ্যাত কেরানী বিখ্যাত গবেষণাপত্রে প্রমাণ করে দেন পরমকালের ধারণা বাদ দিলে ইথার সম্পর্কিত সকল জটিলতা দূর হবে।

বলাবাহুল্য এই অখ্যাত কেরানী স্মরণকালের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। তাঁর প্রকাশিত তত্ত্বের নাম বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব (Special Theory of Relativity)। এ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী কাল পরিমাপনে চিরন্তন বা পরমকালের পরিবর্তে আলোর গতির মানে কালের পরিমাপন। যে কোনো ভালো তত্ত্বের বিশিষ্টতা হল তত্ত্বের আলোকে সকল দর্শক একই ফলাফল পর্যবেক্ষণ করবেন। তা না হলে তত্ত্বটি কেবল সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতাই হারাবে না, পর্যবেক্ষণ এবং চিন্তনে গোলমাল সৃষ্টি করবে। স্বল্প

www.pathagar.com

গতির ক্ষেত্রে নিউটনের চিরন্তন বা নিরপেক্ষ পরমকালের ব্যবহার কাল মাপনে ভালো তত্ত্ব সন্দেহ নেই, কিন্তু অতিদ্রুতশীল ঘটনা বা আলোর গতির মানে কাল মাপনে এ তত্ত্ব কাজ করে না। এ ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব পরমকালের পরিবর্তে আলোর গতিকে মান ধরে পরিঘটনার সার্বজনীন ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। বিষয়টি নানা পরীক্ষায় স্বীকৃতি ও সঠিক ফলাফল প্রাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য আলোক চিরন্তন বা পরম বিষয় নয়। আলোক যে কোনো উৎস থেকে (যেমন সূর্য থেকে উৎসারিত) প্রবাহমান। ফলে আপেক্ষিক তত্ত্ব চিরন্তন পরমকালের বিলুপ্তি ঘটায়। আপেক্ষিকতার নীতি গ্রহণ করে কালে শুরু অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আপেক্ষিক তত্ত্বের ফলশ্রুতি হল দ্রুত গতির মুখে যার যার অবস্থান থেকে পর্যবেক্ষক তার তার কালের মাপন করবেন। যে ঘড়ি সে বহন করছে সেই ঘড়িই তার কালের মাপন করবে। নিউটনের তত্ত্বের স্বল্প গতির ক্ষেত্রে সকলের ঘড়ি কালের মাপনে অভিন্ন সময় নির্দেশ করে। কিন্তু আলোর গতির সাথে চলমান হলে ঘড়ির কাঁটা অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে চলমান হবে। আপেক্ষিক তত্ত্বে সময় হল স্থানের পরিবর্তনের সাথে আলোকের গতির ভাগফল।

$$\text{অর্থাৎ সময়} = \frac{\text{স্থানের পরিবর্তন}}{\text{আলোর গতি}}$$

আলোকের গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার।

$$\text{এখন সময়} = \frac{৩০০০০০}{৩০০০০০} = ১ \text{ সেকেন্ড।}$$

যেহেতু আলো ১ সেকেন্ডে ৩০০০০০ লক্ষ কিলোমিটার স্থান অতিক্রম করে তাই স্থানের পরিবর্তনকে আলোকের গতি দ্বারা ভাগ করলে সময় এক সেকেন্ড পাওয়া গেল। কিন্তু স্বল্প গতির ক্ষেত্রে কেউ যদি প্রতি সেকেন্ডে ১ মিটার হাঁটেন তাহলে তার ৩০০০০০ কিঃ মিঃ হাঁটতে সময় লাগবে ৩০০০০০০০০ সেকেন্ড বা ৯ বছর ১৮৭ দিন ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট। ফলে আলোর গতির মুখে সময়ের সংকোচন ঘটে। ফলে ধীর গতির লোকটি যখন এক মিটার হাঁটেন তার ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা এক টিকের মাত্রায় অগ্রসর হয়। কিন্তু যে আলোর গতিতে আছে, এক মিটার স্থান অতিক্রমণে তার ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা স্থির থাকবে। কেবল ৩০০০০০মিটার স্থান অতিক্রম করলে তার ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা ঘুরবে। আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তি যার যার স্থান থেকে তার তার কাল পরিমাপ করবে। ফলে স্থান এবং কাল ভিন্ন নয়। বরং স্থান ও কাল একীভূত স্থান-কাল (Space-Time) । ফলে স্থান কালানুরূপ। কাল স্থানারূপ। যা স্থান তাই কাল। যা কাল তাই স্থান। স্থানের প্রতিটি বিন্দু কাল নির্দেশক। কালের প্রতিটি সেকেন্ড স্থানের অনুরূপ। স্থান এবং

www.pathagar.com

কাল একে অপরের বুনন (Space-Time is interwoven)। কালের নিরবচ্ছিন্ন ভাবনায় আমরা যেমন বিভোর হই, তেমনি স্থানের ভাবনাতেও রোমাঞ্চিত হই। কালের ও স্থানের প্রান্ত ছুঁতে পারি না কখনো। কালের বোধে ভাবি কালের কত কত কত দূরের প্রান্তে এর শেষ সীমানা? তেমনি স্থান কত কত কত দূরে যায়? মাথার ওপরে তাকালে কেবলই আকাশ নামক স্থানের ব্যাপ্তি। ঐ আকাশটা কত দূরে যায়?

মজার ব্যাপার, আপেক্ষিক তত্ত্বের পরমকালের বিনাশে কালের একটি শুরুর অনিবার্যতা ভাবতে পারি, তেমনি দূরের স্থানের বিন্দুগুলো চেনা যায়। আপেক্ষিক তত্ত্বে আলোর গতির মানে আমরা দূরস্থিত স্থানের মাপন করতে পারি। আলো প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার স্থান ভ্রমণ করে। এরূপ এক বছরে যতদূর আলো যায় তাকে বলি এক আলোকবর্ষ (Light Year)। দূরের স্থান এক বা দুইশত বা শত শত বা লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের হতে পারে। এভাবেই এখন আমরা দূরে নক্ষত্রের স্থান আলোকবর্ষে প্রকাশ করি। আমাদের সৌরজগৎ ছায়াপথ (Milky-way) নামক গ্যালাক্সির (প্রায় দশ হাজার কোটি তারকার সমাবেশ) বাহুতে অবস্থান করছে। এই ছায়পথের এপার থেকে ওপারে পাড়ি দিতে সময় লাগবে ২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। আপেক্ষিক কাল এভাবেই আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করছে।

|So it follows automatically that every observer will measure light to have the same speed (by distance 1 meter per 0.000000003335640952 seconds). There is no need to introduce an idea of ether whose process any way cannot be detected, as the Michelson-Morley's experiment showed. The theory of relativity, lows, however forces us to change fundamentally our ideas of space and time. We must accept that time is not completely separate from and independent of space, but is combined with it to from an object called Space-time"
—(Brief History- Page-24)"

[সুতরাং এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হল প্রতিটি পর্যবেক্ষকের মাপনে আলোকের গতিবেগ একই হবে (সংজ্ঞা অনুসারে প্রতি ০.০০০০০০০০৩৩৩৫৬৪০৯৫২ সেকেন্ডে এক মিটার) ইথার নামক ধারণা উপস্থিত করার কোনো প্রয়োজন নেই। মিশেলসন-মার্লির পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ইথারের অস্তিত্ব কোনো ক্রমেই আবিষ্কার করা যায়নি। অপেক্ষবাদ কিন্তু স্থান এবং কাল সম্পর্কে আমাদের ধারণা মূলগতভাবে পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। আমাদের মানতেই হবে কাল স্থান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। বরং দুটির সমন্বয়ে স্থান-কাল নামক বস্তু পঠিত হয়েছে]

www.pathagar.com

পরিদৃশ্যমান জগতকে সাধারণ দৃষ্টিতে যা দেখি তার সত্যতা কতটুকু? স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্ন রাখা যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা সূর্যকে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তন করতে দেখি। এ পর্যবেক্ষণে আমরা এখন আর পরিতুষ্ট নই। আমরা এখন বিশ্বাস করি এবং এই সত্য মেনে নিয়েছি যে সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্র আর পৃথিবী নিজ কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এ সত্য মেনে নিতে হয়েছে গভীর পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং গাণিতিক সমীকরণের শুদ্ধতার কারণে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব নিউটনীয় তত্ত্বের বিচ্যুতি পরিশোধনে সত্যতার অন্তঃগভীরে প্রবেশের দ্বার উন্মোচন করেছে। এ তত্ত্বের কিছু অদ্ভুত ফলাফল যেমন আমাদের বিস্মিত করে, তেমনি তা মেনে নিতেই হয়। কারণ তত্ত্বটি সাধারণ পর্যবেক্ষণের বাইরে সমীকরণে পরিশুদ্ধ। পরীক্ষাতেও মিলে যায়। ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ বিশ্লেষণে তা তুলে ধরা হল।

কোনো বিষয়ের প্রতি জ্ঞান অর্থ বিষয়ের বর্ণনা। বর্ণনা অর্থ বস্তুটি কী? কেমন? এগুলি আমাদের সাধারণ বুদ্ধিজাত ধারণা। তাই ভৌত বস্তুর ক্ষেত্রে সঠিক পর্যবেক্ষণ হবে আকার-আয়তনের ওপর ভিত্তি করে। বস্তুটি কতটা দীর্ঘ, কতটা উঁচু বা কতটা প্রস্থ এটাই হবে সঠিক বিবরণ। বস্তুর মাত্রাগত বিবরণ (Dimensional) পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়। সাধারণত তিন মাত্রায় বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করি, যথা- দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা। ভূ-পৃষ্ঠকে তথা যে কোনো স্থানকে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাত্রায় দেখি। স্থানের কেবল আছে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুই মাত্রা। দুই মাত্রার স্থানে বস্তু তিন মাত্রায় পর্যবেক্ষণ সিদ্ধ কারণ বস্তুটির আছে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা। সাধারণ দৃষ্টিতে সকল বস্তুই তিন মাত্রায় পর্যবেক্ষণ করা হয়। কিন্তু বস্তুটিতে স্থান এবং কাল মাত্রা আরোপিত না হলে পর্যবেক্ষণগত বিবরণ সত্যতা হারাবে। যেমন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার তিনমাত্রার পেয়ালার বিবরণে স্থান ও কালের অবস্থান নির্ণয় অত্যাবশ্যক। কেবল স্থান কালের মাত্রা যোগ হলে বলা যাবে ওমুক স্থানে নির্দিষ্ট কালে পেয়ালাটির বিবরণ সঠিক। ফলে দৈর্ঘ্য + প্রস্থ + উচ্চতা + স্থান-কাল (স্থান-কাল অভিন্ন) মোট চার মাত্রায় (Four Dimension) পর্যবেক্ষণ তথা বিবরণ সিদ্ধ হল। আপেক্ষিক তত্ত্বের অদ্ভুত ফলাফল হল তিন মাত্রার বস্তু, চার মাত্রার স্থান-কালের সূত্রে আরোপিত হলে বস্তুটির আয়তন, আকার, ভর, সময় মানের পরিবর্তন ঘটে। বস্তুটি আলোর গতির মানে স্থান-কালের পরিবর্তনের ফলাফল-অতিশক্তির বিকাশ ঘটায় যা আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E = Mc^2$ এ ব্যাখ্যা করা যায়। গতির সাথে বস্তুপিণ্ডের স্থান-কালের পরিবর্তন ঘটে। গতির মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বস্তুপিণ্ডটির ভর তথা শক্তি বৃদ্ধি পায় (ভর ও শক্তি একই কথার নামান্তর যা ভর তাই শক্তি। আইনস্টাইনের তত্ত্বে ভর ও শক্তির বাক্যবিন্যাস ভর-শক্তি)। সাধারণ অভিজ্ঞতায় ঝড়ের বেগের গাছের ছিন্ন পত্রটি শরীরে অধিক শক্তিতে আঘাত করে।

www.pathagar.com

আর তা যদি আলোর গতিতে আঘাত করে তাহলে এর ফলাফল কতটা ভয়ানক হতে পারে। $E = Mc^2$ সমীকরণে E শক্তি M ভর c আলোর গতি। সামান্য ভরের বস্তুপিণ্ড আলোর গতির কাছাকাছি বেগে চালনা করলে কত ভয়ানক হবে তা এই সূত্র দ্বারা উদ্ভাবিত আনবিক বোমার শক্তির ভয়াবহতা থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি।

$E = Mc^2$ সমীকরণের আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী হল কেবল আলোক ছাড়া কোনো বস্তুই আলোকের দ্রুতিতে চলতে পারে না। শক্তি ও ভরের সমতূল্যতা থাকার দরুণ বস্তুপিণ্ডের গতির সাথে যে পরিমাণ শক্তি বৃদ্ধি পায় তা ভরের সাথে যুক্ত হয়। বস্তুটির ভর বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ অপেক্ষাকৃত আরো বেশি শক্তিতে তা চালনা করতে হবে। ১০ কেজি ভরের বস্তুকে আমরা সহজেই চালনা করতে পারি কিন্তু ১০০ কেজি ওজনের চালনা করতে বেশি শক্তি ব্যবহার করতে হবে। বস্তু অধিক গতিতে চলমান হলে যে শক্তি বৃদ্ধি পায় তা ভরের সাথে যোগ হয়ে বস্তুপিণ্ডটি অধিকতর ভারি হতে থাকে। এই ভারি বস্তুকে চালনার জন্য শক্তির পরিমাণও বাড়াতে হবে। যে সমস্ত বস্তুপিণ্ডের দ্রুতি আলোকের দ্রুতির কাছাকাছি, কেবল সেই সমস্ত বস্তুপিণ্ডের ক্ষেত্রেই এই অভিক্রিয়ার গুরুত্ব রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বস্তুপিণ্ডের দ্রুতি যদি আলোর দ্রুতির ১০ শতাংশ হয়, তাহলে তার ভর বৃদ্ধি পাবে স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৫ ভাগ মাত্র। কিন্তু তার দ্রুতি আলোকের দ্রুতির ৯০ শতাংশ হলে তার ভর হবে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। বস্তুপিণ্ডের দ্রুতি আলোকের দ্রুতির যত নিকটতর হয় তার ভরও ততই তাড়াতাড়ি বাড়ে। ফলে তার দ্রুতি বাড়াতে আরো বেশি বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়। আসলে বস্তুপিণ্ডের দ্রুতি কখনো আলোকের দ্রুতির সমান হতে পারে না। কারণ তাহলে তার ভর হবে অসীম। আর ভর ও শক্তির সমতুল্যতার তত্ত্ব অনুসারে ঐ অবস্থায় চালনা করতে হলে প্রয়োজন হবে অসীম শক্তি। এ জন্য স্বাভাবিক বস্তুপিণ্ডের গতি আপেক্ষিক তত্ত্ব দ্বারা আলোর গতির চাইতে নিম্নগতিতে চিরকাল সীমাবদ্ধ। কেবলমাত্র আলোক বা অন্য যে সমস্ত কণার ভর নেই তারাই আলোকের দ্রুতিতে চলতে পারে। $E = Mc^2$ সূত্রের আর একটি চিরন্তন সত্য হল শক্তি ও পদার্থ একই বিষয়। এ সমীকরণে যা শক্তি তাই পদার্থ এবং যা পদার্থ তাই শক্তি। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু তা যেমন পদার্থ তেমনি শক্তি। এ ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু তা অদৃশ্য হলে থাকবে শক্তি। আবার শক্তির রূপান্তরে হবে পদার্থ। মহাবিশ্ব কীভাবে? কোথা থেকে? এ সূত্র তার ইঙ্গিত দেয়।

আলোক অভিক্রিয়ার বিশেষ তাৎপর্য হলো তা থেকে আমরা স্থান-কালের ঘটনার বিবরণ পাই। আলোক অভিক্রিয়ায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল নিয়ন্ত্রিত এর কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। অতীত এবং বর্তমান কালের ঘটনা আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। কেন নয় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাছাড়া দূরস্থিত

www.pathagar.com

তারকা এবং বিশ্বের অবস্থা আলোক অভিক্রিয়ায় জানা যায়।

স্বভাবতই আমরা একটা কালের গতি অনুভব করি। স্থূল অর্থে এ গতি সূর্য সম্পর্কীত। সূর্যের উদয় ও অস্তের ঘটনার মধ্যবর্তী কাল একদিন। এরূপ পরের উদয় ও অস্তের ঘটনায় দুই দিন। এভাবেই দিন, মাস, বছর অতিবাহনে কালের স্রোত। বস্তুত পৃথিবীর আবর্তন বা স্থূল দৃষ্টিতে সূর্যের উদয়াস্ত যাই ভাবি না কেন সূর্য থেকে উৎসারিত আলোক অভিক্রিয়ায় অন্তস্থিত ঘটনা কাল প্রবাহ। ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল আলোকের উৎসের দ্রুতি যাই হোক না কেন, আলোকের দ্রুতি অপরিবর্তীত থাকবে। দ্রুতির ক্ষেত্রে যে কোনো বিন্দু থেকে আলোকের একটি স্পন্দন উৎসারিত হলে তা গোলকরূপে বিস্তার লাভ করবে। উৎসারিত আলোক এক সেকেন্ডের এক মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ সময়ে বিস্তারিত আলোক এমন একটা গোলক গঠন করবে যার ব্যাসার্ধ হবে ৩০০ মিটার। এক মিলিয়ন ভাগের ২ ভাগে হবে ৬০০ মিটার। এই ভাবে আলোক তরঙ্গ বিস্তারে চলতে থাকবে। বিষয়টি শান্ত পুকুরে বস্তুখণ্ড ছুঁড়ে দিলে যে ভাবে ঢেউয়ের গোলকের পর গোলক সৃষ্টি হয় তেমনি। ঢেউয়ের প্রথম গোলকের চেয়ে দ্বিতীয় গোলক দ্বিগুণ। পরবর্তী গোলকগুলো এ হারে বিস্তার লাভ করে। আলোক প্রবাহের এ অভিক্রিয়া বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ ধারণ করে। শান্ত পুকুরের দুই মাত্রার (পুকুর একটি তল বা স্থান। স্থান দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের দুই মাত্রা ধারণ করে) স্থানে ছুঁড়ে দেওয়া বস্তুপিণ্ডটির সময় আরোপ করলে তা হবে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও কাল সংযোজনে তিন মাত্রার কোণ। পরবর্তী ঢেউগুলোও তিন মাত্রার কোণ বা শঙ্কু সৃষ্টি করে বিস্তার লাভ করবে। এভাবে আলোক কোণ সৃষ্টি (Light cone) ক্রিয়ায় প্রবাহমান। আলোক শঙ্কুর প্রথম ধাপে ঘটনার ধারাবাহিকতা (event series) থাকে বর্তমান (যেমন বস্তুপিণ্ডটি পুকুরে নিক্ষেপের ঘটনা জানা) কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে থাকে ভবিষ্যৎ। দ্বিতীয় শঙ্কু সৃষ্টি হলে প্রথমটি অতীত, দ্বিতীয়টি বর্তমান তৃতীয় ধাপ ভবিষ্যৎ। যেহেতু আলোক শঙ্কু তাৎক্ষণিক তৃতীয় ধাপ গ্রহণ করেনি ফলে সে ধাপের ঘটনা থাকবে অজানা। কোনো কিছুই যেহেতু আলোর গতির চেয়ে দ্রুততর নয়, ফলে আলোক শঙ্কুর বাইরের ঘটনা জানা সম্ভব নয়। এ কারণেই আমরা ভবিষ্যৎ বলতে পারি না। আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে শতভাগ ভবিষ্যদ্বাণী (Prediction) নিষিদ্ধ। কেবল অতীত ঘটনার আলোকে সম্ভাব্যতা স্বীকার্য। উদাহরণে বিষয়টি তুলে ধরা হল। ধরা যাক এই মুহূর্তে সূর্যটি নিভে গেল। যারা সূর্যের মধ্যে আছেন তারা আলোক শঙ্কুর ভিতরে থাকায় দেখবেন সূর্যটি মরে গেছে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে আছেন তারা এ ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হবেন না কারণ তারা আছেন আলোক শঙ্কুর বাইরে। সূর্য থেকে আলোক পৌঁছাতে লাগবে আট মিনিট। আট মিনিট পর পৃথিবীর মানুষ তা জানবেন। এরূপ দূরস্থিত নক্ষত্রের

www.pathagar.com

আলোকে শঙ্কু যখন কয়েক হাজার বা লক্ষ বছর পর আমাদের নিকট পৌঁছালো তখন নক্ষত্রটির নিশানা পাওয়া গেল বটে, হয়ত তত দিনে নক্ষত্রটি মরে গেছে। আসলে যখন আমরা দূর আকাশের দিকে তাকাই তখন অতীত আকাশকেই দেখি। আপেক্ষিক তত্ত্বে আলোক অভিক্রিয়ার অন্য আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল স্থান ও কালের সংকোচন। অদ্ভুত শোনালেও বিষয়টি প্রমাণিত যে আলোর গতির মুখে সময়হ্রাস পায়, সে সাথে স্থানের সংকোচন ঘটে। আলোকের গতিতে ৩ লক্ষ কি. মিটার দূরত্বের পরিমাপ এক সেকেন্ড, যা সাধারণ গতির ক্ষেত্রে হবে দশ থেকে ১৫ বছর। অন্যদিকে আলোর গতির মুখে চলমান কোনো ব্যক্তি সর্বদাই আলোক শঙ্কুর অগ্রভাগে থাকায় তার নিকট কোনো অতীত আসবে না। ফলে তিনি সময় ভ্রমণ করবেন বর্তমানে। আপেক্ষিক তত্ত্বে টুইন প্যারাডক্স (Twin Paradox) বলে প্রচলিত মন্ত্রকথা চালু আছে। ধরা যাক দুটি যমজ শিশুর মধ্যে একটিকে পৃথিবীতে রেখে অন্যটিকে আলোর শঙ্কুর গতির মুখে গতিশীল রাখা হল। যে শিশুটি পৃথিবীর কাঠামোতে আটকে আছে সে আলোক শঙ্কুর পশ্চাতে অবস্থান করবে। উৎসারিত আলোক শঙ্কুটি যত দূরতর হবে সে তুলনায় শঙ্কুটির বিস্তৃতি বৃদ্ধি পাবে। ফলে পশ্চাতে পৃথিবীপৃষ্ঠের শিশুটির বয়সও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যে শিশুটি আলোক শঙ্কুর মুখে অবস্থান করছে, সে কেবল ভবিষ্যৎ আলোক শঙ্কু গঠনের মুখে থাকায় অতীত তাকে ধরতে পারছে না। এভাবে শত বছর চলতে থাকলে পৃথিবীর যমজটি বৃদ্ধ হয়ে হয়ত মরে যাবে। কিন্তু আলোর গতির মুখের যমজটি শিশুই থেকে যাবে। কালে বেঁচে থাকা এটি আশার কথা বটে কিন্তু $E = Mc^2$ সূত্রে কোনো কিছুই আলোকের দ্রুতিতে চলা সম্ভব নয়।

গ্যালিলিওর গতি বিষয়ক পরীক্ষায় নিউটন তা বিধিতে আরোপ করেন। নিউটনের গতিশীল বিশ্ব আরো নিখুঁত ও পরিমাপিত। এরপর ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব গতি, স্থান, কাল প্রশ্নে তথা জাগতিক রহস্য উন্মোচনে এক বিপ্লবী চেতনা। আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে যখন কোনো বস্তু আলোকের গতির কাছাকাছি দ্রুতিতে চলমান হয় তখন কী ঘটে তার ভালো বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু নিউটনীয় মহাকর্ষীয় তত্ত্বের সাথে অসঙ্গতি দেখা দেয়। নিউটনীয় মহাকর্ষ তত্ত্বে বস্তুপিণ্ডগুলো পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং আকর্ষণ বল অন্তর্বর্তী দূরত্বে নির্দিষ্ট হারে পরিবর্তন হয়। দূরত্ব দ্বিগুণ হলে আকর্ষণ বল অর্ধেকে নেমে আসে এবং দূরত্ব অর্ধেকে নেমে এলে আকর্ষণ বল দ্বিগুণ হয়। এর সাধারণ ফলাফল হল কোনো বস্তুর ওপর মহাকর্ষ বল তাৎক্ষণিক ক্রিয়া করে এবং বলের পরিবর্তন হয়। এর অর্থ মহাকর্ষ বল অসীম গতিতে চলমান হওয়া উচিত। কিন্তু বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের দাবি—মহাকর্ষ বলের দ্রুতি আলোর দ্রুতির সমান বা তার চেয়ে কম হওয়া উচিত। এ বিষয় আইনস্টাইন বিস্তর ভাবেন এবং নিউটনীয়

www.pathagar.com

মহাকর্ষের সাথে আপেক্ষিক তত্ত্বের সমন্বয় করতে চেষ্টা করেন। সব শেষে ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন সাধারণ বা ব্যাপক আপেক্ষিক তত্ত্বের (General theory of Relativity) ঘোষণা দেন।

সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ভর ও শক্তির সমতুল্যতা এবং মহাকর্ষ বলের সংশোধিত ধারণা। বস্তুর ভর তার শক্তির সমান। অর্থাৎ ভর ও শক্তি একই কথা। পৃথিবী বা সূর্য অতিভরের বস্তু এবং শক্তির টানও বেশি। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বে এদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বা টান রয়েছে। কিন্তু আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে মহাকর্ষ স্থানকে টেনে বেঁকে দেবে। কেবল পৃথিবী আর সূর্য নয় মহাজাগতিক সকল বস্তুর ভর ও শক্তির টানে স্থান-কাল বাঁকা। নিউটনের তত্ত্বে স্থানকে সমতল ভাবা হত কিন্তু আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্বে স্থান-কাল বাঁকা। আইনস্টাইনের তত্ত্বে মহাকর্ষ বল অন্যান্য বলের মতো নয়। মহাকর্ষ বল মহাজাগতিক সকল বস্তুর ভর ও শক্তির প্রকাশ। যার ফলাফলে স্থান ও কাল বঙ্কিম (space time is warpth)। নিউটনের তত্ত্বে পৃথিবী সূর্যের মহাকর্ষ টানে সূর্যকে আবর্তন করে। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের ফলাফল স্থান-কাল নিজেই বাঁকা পথ সৃষ্টি করে আছে। পৃথিবী তার কক্ষপথ পরিভ্রমণে সব সময় সোজা পথ (Geodesic) অনুসরণ করে। যেহেতু স্থান-কাল নিজেই বাঁকা ফলে পৃথিবী বাঁকাপথ অনুসরণ করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী একটি গ্রেট সার্কেল (Great Circle)। কেউ পৃথিবীকে আবর্তন করলে তার পথের নিশানাও হবে বৃত্তাকার।

স্থান-কাল যে বাঁকা তা সূর্য গ্রহণের সময় আলোক প্রবাহের গতিপথ পর্যবেক্ষণে প্রমাণ করা গিয়েছে। আলোক সোজা পথে ভ্রমণ করে। দূরনক্ষত্র থেকে বা সূর্য থেকে প্রবাহিত আলোক পথের এমন বিচ্যুতি (Deflection) সূর্যগ্রহণের সময় পর্যবেক্ষণ করা যায়। সূর্য গ্রহণের সময় চাঁদের ছায়া সূর্যরশ্মিকে ঢেকে দেয়। এ সময় দূরনক্ষত্র থেকে আলো সূর্যের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় দেখা যায় আলোকরশ্মি সূর্যের দিকে বেঁকে (Bented) গেছে। এ পর্যবেক্ষণে আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রমাণিত। স্থান-কাল (Space-time) সমতল নয় আসলে স্থান-কাল বঙ্কিম। আমরা যখন দূর নক্ষত্রের দিকে তাকাই তখন নক্ষত্রের অবস্থান আপাত দৃষ্টিতে যা দেখি সেটা তার সঠিক অবস্থান নয়।

www.pathagar.com

উল্লেখিত চিত্রে সঠিক অবস্থানের তারকা থেকে উৎসারিত আলো সূর্যের নিকট দিয়ে প্রবাহমান কালে আলোক শঙ্কু সূর্যের মহাকর্ষ টানে সূর্যের দিকে বেঁকে গেছে। আলোক প্রভা অনুসরণে পৃথিবী থেকে তারকাটিকে ভুল অবস্থানে (আপাত অবস্থান) দৃষ্ট হচ্ছে। তারকাটির সঠিক অবস্থান চিত্রে প্রদর্শিত। তাই আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব সাধারণ দৃষ্টিতে দৃশ্যমান জগতকে এলোমেলো করে। ফলে বিজ্ঞানীদের আপেক্ষিক তত্ত্বের অনুসরণে প্রস্তাবিত তত্ত্বের সমন্বয় করতে হয়।

ব্যাপক অপেক্ষবাদের আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী হল পৃথিবীর মতো অতিভারি বস্তুর নিকটে সময়ের গতি ধীর মনে হবে। এর কারণ আলোক, স্পন্দন সমষ্টির তরঙ্গ প্রবাহ। স্পন্দনের সাথে আলোক শক্তির একটি সম্পর্ক রয়েছে। আলোক পৃথিবীর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে চলার সময় তার স্পন্দন শক্তির ক্ষয় হবে। ফলে এর কম্পাঙ্ক কমে যাবে। এর অর্থ একটি তরঙ্গ শীর্ষ থেকে পরবর্তী তরঙ্গশীর্ষের মধ্যবর্তী কালের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে। ওপরে অবস্থিত প্লেন থেকে কোনো দর্শক পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখবে সব ঘটনাই ধীরে ঘটছে। একটি লোক যে গতিতে হাঁটছে তা ধীর বলে মনে হবে। তাছাড়া একটি ঘড়ি পাহাড়ের ওপর রেখে এবং আরেকটি সমতলে রেখে প্রমাণ করা গেছে সমতলের ঘড়িটি ওপরের ঘড়ি থেকে ধীরতর। স্থান ও কাল অধ্যায় আলোচনার সারসংক্ষেপ হল, পূর্বে ধারণা করা হত স্থান এবং কাল এক একটি স্থির ক্ষেত্র। ঘটনাগুলো স্থানে ঘটে কিন্তু ঘটনার দ্বারা স্থান বা ক্ষেত্র প্রভাবিত হয় না। নিউটন এমনকি আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বেও এমনটি ভাবা হত। গ্রহ, নক্ষত্র বা বস্তুপিণ্ড চলমান। তারা পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে। কিন্তু স্থান ও কাল নিরন্তর, শাশ্বত। তার কোনো পরিবর্তন নেই। কাল চিরন্তন। স্থান মহাশূন্য। কাল বলতে স্থবির চিরস্থায়ী মহাকাল। কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশের পর এ যাবৎকালের সকল ধারণাই বদলে গেল। ভর শক্তির সূত্রে স্থানের বঙ্কিমতা বা বক্রতার ওপর বলের ক্রিয়া কাজ করল। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে স্থান ও কাল একীভূত রাশি। ফলে স্থান কালের ওপর প্রভাব রাখল। স্থান-কাল হয়ে পড়ল গতিশীল রাশি। মহাবিশ্বের যা কিছু ঘটছে সেগুলো কেবল স্থান-কালকে প্রভাবিত করছে না, স্থান-কাল নিজেও তাদের ওপর প্রভাব রাখল। সূর্যের মহাকর্ষ শক্তি স্থান-কালকে বাঁকিয়েছে, পৃথিবীর শক্তি আলোর গতিকে শ্লথ করেছে। এর আর একটি অর্থ হল মহাবিশ্বে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে বা ঘটছে স্থান-কাল সম্পর্কে ধারণা ছাড়া তা বলা সম্ভব নয়। গ্যালাক্সি, গ্রহ, নক্ষত্র, নোভা, সুপার নোভা, শ্বেতবামন, কোয়াসার, কৃষ্ণগহ্বর এসব আকাশমণ্ডলীয় বস্তুসমূহ নিয়ে যে বিশ্ব তার ভর ও শক্তির টানে মহাবিশ্বের বক্রতার একটি সীমানা (Boundary) ভাবা গেল। মহাবিশ্বের এমন সীমানা বা

www.pathagar.com

কিনারের বাইরের ঘটনার কথা বলা অর্থহীন হয়ে পড়ল।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব বিকাশের পর স্থান-কাল সম্পর্কে এ বোধ মহাবিশ্বের ধারণা বিষয়ে নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করল। মহাবিশ্ব অপরিবর্তণশীল বলে যে ধারণা করা হয়েছিল, তার পরিবর্তে মহাবিশ্বের গতিশীলতা প্রতিষ্ঠা লাভ করল। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে বিশ্ব গতিশীল ও প্রসারমান।

"In the following decades this new understanding of space and time was to revolutionize out views of the universe. The old idea of are essentially unchanging universe that could have existed, for ever was replaced by the notion of dynamic, expending universe that seemed to have begun at a finite tome ago, and that might and at a finite in future. That revolution from the object of the next chapter. And years later, it was also to be the starting point for may work in the theoretical physics. Roger Penrose and I showed that Einstein's general theory of relativity implied that the universe must have a beginning and possibly, are end."

—(Brief History page-36)

[পরবর্তী বছরগুলোতে স্থান-কাল সম্পর্কে এই নতুন বোধ আমাদের মহাবিশ্ব সম্পর্কীয় ধারণায় বিপ্লব এনেছে। পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল মহাবিশ্ব মূলত অপরিবর্তনশীল। তার অস্তিত্ব চিরকাল ছিল এবং থাকবে। এর জায়গায় বর্তমান ধারণা মহাবিশ্ব গতিশীল এবং প্রসারমান। পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয়বস্তু এই বিপ্লব। বহু বছর আগে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে আমার গবেষণা শুরু হয়েছিল এই বিন্দু থেকে। রজার পেনরোজ এবং আমি দেখিয়েছিলাম, আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের ভিতরে নিহিত রয়েছে এই তত্ত্ব- মহাবিশ্বের একটা শুরু রয়েছে এবং হয়ত একটা শেষ ও আছে]

www.pathagar.com

মহাবিশ্ব প্রসারমান
The Expanding Universe

মহাবিশ্ব কি চিরন্তন স্থিতিশীল? নাকি কালে এর সৃষ্টি ছিল? এ দুটি প্রশ্নে ধর্ম, দর্শন এবং বিজ্ঞান অনেক কাল পূর্ব থেকে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে আসছিল। তাওরাত, কোরআন, বাইবেল, বেদ ধর্মগ্রন্থ মতে কালে বিশ্বের শুরু ছিল। শুরুটা করেছিলেন স্রষ্টা। স্রষ্টা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তাই জগৎ সৃষ্টি হল। ধর্মমতে স্রষ্টাই কর্ম নিয়ন্তা। এখানে কার্যকরণ বিধি অন্বেষণ অনুপস্থিত। দর্শন ও বিজ্ঞান কার্যকরণ বিধি তথা যুক্তি প্রমাণে বিষয়টির সত্যতা জানতে চায়। বিশ্বের শুরু আছে কি নেই এর একটি যুক্তি ভিত্তিক কাঠামো সৃষ্টিতে দর্শন ও বিজ্ঞান নিরন্তর সচেষ্ট। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত বিশেষ করে বিজ্ঞান কেবল অনড়, স্থির, স্থবির ও চিরন্তন বিশ্বের রূপায়ণ করে। বিশ্ব চির অস্তিমান। এর শুরু বা শেষ নেই (No Starting and ending) । তা সত্ত্বেও প্রকৃতির ভাষা, বিশ্বের গঠন কাঠামো, জাগতিক বিধি বিধান নিয়ে অনেকেই ভেবেছেন। চেষ্টা করেছেন প্রকৃতির আচরণ বুঝতে। ইতিহাসের পাতায় তাদের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু তারা প্রকৃতির বিধিগুলোর সমুন্নত মডেল প্রকাশ করেন। এরূপ একটি মডেল গতি সম্পর্কীত। গ্যালিলিওর পূর্ব পর্যন্ত গতির ভাষা স্বচ্ছ ছিল না। গ্যালিলিও প্রথম গতি বিষয়ক তত্ত্ব প্রকাশ করেন। যার মূল কথা বস্তুর প্রবণতা গতিশীলতা রক্ষা করা। গতির প্রশ্নে নিউটন স্বচ্ছ ও বিধিবদ্ধ নীতি প্রকাশ করেন। এরপর আলবার্ট আইনস্টাইন এমন সব সূত্র ও তত্ত্ব প্রকাশ করেন যা বিশ্ববোধে বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। স্থান-কাল অধ্যায়ে আমরা স্থির বিশ্বের (Static Universe) পরিবর্তে গতিশীল বিশ্বের প্রতি আস্থা স্থাপনে বাধ্য হয়েছি।

গতিশীল বিশ্বের রূপায়নে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক মডেল প্রমাণ, পরীক্ষা, তথ্য বিন্যাসের চেয়ে বেশি তত্ত্ব ও গণিতনির্ভর। হকিং এ অধ্যায়ে গতিশীলতার ক্ষেত্রে তাবৎ মহাবিশ্বটা কীভাবে গতির মুখে ছুটে চলেছে, কীভাবে এর সম্প্রসারণ ঘটছে, তা প্রমাণ ভিত্তিক উদাহরণে এবং নানা মডেল আলোচনায় ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া বিশ্বের যে একটা শুরু থাকতে পারে এবং তা কীভাবে সে আলোচনায় বিগ-ব্যাং (Big-Bang) তত্ত্বকে উপস্থাপন করেছেন। অধ্যায়টি পাঠে নিমগ্ন হলে রহস্যের গভীরে প্রবেশ করা যায়।

www.pathagar.com

অধ্যায়টি শুরু হয়েছে বিশ্বের প্রতি আমাদের সাধারণ দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে আর শেষ হয়েছে আইনস্টাইনের তত্ত্বের অসম্পূর্ণতায়। তবে প্রাধান্য পেয়েছে সম্প্রসারণ এবং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশ্বের আরম্ভ বিষয়ে। বিশ্বের যে একটা শুরু ছিল তা উপস্থাপনা করেছেন প্রমাণ ভিত্তিক তাত্ত্বিকতায়। অন্ধকার রাত। আকাশটা নির্মল। দূর আকাশের তারার খেলা মোহনীয়। শরতের আকাশটা আরো স্বচ্ছ। দূর আকাশটা দুভাগ করেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে কয়েক শত মিটার প্রশস্থ একটি ধোঁয়াশা স্বচ্ছ মেঘের পথ। পথটি উত্তর থেকে দক্ষিণে যেতে যেতে দিগন্তের রেখায় দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসে। যেন একটি পথের নিশানা। অসংখ্য তারকার ঝাঁক এ পথের নিশানা এঁকেছে। মনে হয় দূরতারকারা খুবই কাছে কাছে একে অপরের গায়ে লেপ্টে আছে। একটির পর একটি গাদাগাদি করে ওদের অবস্থান। তারাগুলোর দূরত্ব একে অপর থেকে দুএক মিলিয়ন থেকে কয়েকশত মিলিয়ন আলোকবর্ষ হলেও আমরা অনেক দূর থেকে দেখি বলে এমন মনে হয়। আসলে এরা স্থানের একটি সীমানার মধ্যে প্রায় দশ হাজার কোটি তারকার সমাবেশ (Constellation of stars)। এর নাম গ্যালাক্সি। আমারা দূরআকাশের যে তারকা সমাবেশের পথরেখাটি দেখি, এটা আমাদেরই গ্যালাক্সি। এর নামকরণ করা হয়েছে মিল্কিওয়ে (Milky way)। আমরা বলি ছায়াপথ। অনেকে বলে আকাশগঙ্গা। আবার অনেকে বলে আকাশ নহর। সাধারণ লোকেরা ভাবে পরীদের পথ (way of fairies)। বৎস্যয়ানার লোকেরা বলে 'ব্যাকবন অফ দি স্কাই' (Backbone of the sky) আকাশের শিরদাঁড়া।

বস্তুত ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি 'ছায়াপথ রাজ্যে'র শিরদাঁড়া যার বন্ধনীতে ঘন তারকার সমাবেশ। বন্ধনীর বাইরেও এ রাজ্যে অসংখ্য তারকা যারা দূরে দূরে অবস্থান করছে। আকাশের দিকে তাকালে অপেক্ষাকৃত কয়েকটা উজ্জ্বল তারকা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো তারকা নয়, এরা শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহ। আরো দূরে তাকালে কম উজ্জ্বল ও ছোট ছোট তারকা দেখা যায়। এগুলোকে স্থির বলে মনে হয়। তারকাগুলোর অবস্থান আবার উপর নিচে মনে হয়। তারকাগুলো যত ছোটই মনে হোক কোনোটা সূর্যের আয়তনের সমান, কোনোটা বা সামান্য ছোট, কোনোটা আবার সূর্যের দ্বিগুণ বা তিনগুণ। তারাগুলো অবস্থান ভেদে দূরে দূরে এবং কত দূরে তা আমরা এখন আলোক গতির হিসেবে মাপতে পারি। আমাদের নিকটতম তারকার নাম প্রক্সিমা সেঞ্চুরী (Proxima century)। পৃথিবী থেকে এ দূরত্ব চার আলোকবর্ষ বা ২৩ মিলিয়ন মিলিয়নস মাইল। সেখানে সূর্যের দূরত্ব মাত্র ৮ মিনিট ৭ সেকেন্ড। খালি চোখে যে সমস্ত তারকা দেখা যায় তাদের বেশির ভাগের দূরত্ব আমাদের নিকট থেকে কয়েক শত আলোকবর্ষ। আমাদের সূর্য একটি হলুদ তারকা। আমরা যে ছায়াপথে আছি সেটা আড়াআড়ি মাপে প্রায় এক লক্ষ

www.pathagar.com

আলোকবর্ষ (আলোকের গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিমি হিসেবে এক লক্ষ বছরে যতদূর যায়)। আমাদের ছায়াপথটি ধীর গতিতে ঘূর্ণায়মান। আমাদের সৌরজগতের অবস্থান ছায়পথের সর্পিল বাহুগুলোর একটির কিনারায়।

মহাবিশ্বের এমন একটি চিত্ররূপ আমরা এখন জানি। ১৭৫০ সাল থেকে অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী নানা মত ব্যক্ত করতে থাকেন। তখন পর্যন্ত তারকার দূরত্ব, গ্যালাক্সি (ছায়াপথ) বিষয়ে তেমন কিছু জানা ছিল না। এ সময়ের মধ্যে স্যার উইলিয়াম হারশেল (Sir Williume Harshel) বিরাট সংখ্যক তারকার অবস্থান ও খুব পরিশ্রমের সাথে তালিকাভুক্ত করেন।

১৯২৪ সালে এডুইন হাবলের পর্যবেক্ষণের পর মহাবিশ্বকে নিয়ে আধুনিক মানসচিত্রের গঠন শুরু হয়। হাবল অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন যা 'হাবলের টেলিস্কোপ' বলে খ্যাত। হাবল তার টেলিস্কোপ দ্বারা দেখতে পান আমাদের ছায়াপথই একমাত্র ছায়াপথ নয়। আরো অনেক ছায়াপথ রয়েছে যাদের মধ্যে মধ্যে রয়েছে বিরাট বিরাট শূন্যতা। হাবল তারকার ঔজ্জ্বল্য (luminosity) পরীক্ষা করে ছায়পথ বা গ্যালাক্সিসমূহের নয়টি গ্যালাক্সির দূরত্ব পরিমাপ করতে সমর্থ হন। এখন আমরা জানি মহাবিশ্ব শত শত কোটি গ্যালাক্সির সমষ্টি। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে হাজার হাজার কোটি তারকা থাকে। বস্তুত মহাবিশ্ব এক অবাক বিস্ময়।

এমন মহাবিশ্বকে আমরা স্থির ও স্থবির বিশ্ব হিসেবে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। আমরা যখনই বিশ্বের দিকে তাকাই বিশ্বকে অমন দেখি। সামগ্রিকভাবে বিশ্ব সম্প্রসারিত (Expanding) না কি সঙ্কুচিত (constricting) হচ্ছে তা আদৌ বুঝতে পারি না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বৌদ্ধিক বৈপ্লবিক চেতনা হল মহাবিশ্ব স্থির নয়। মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল। মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীলতার অর্থ হল যে ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি সমষ্টিতে আমাদের বিশ্ব, ঐ সকল গ্যালাক্সি স্থির অবস্থানের থাকছে না। গ্যালাক্সিসমূহ দ্রুত গতিতে একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

এ অধ্যায়ে হকিং আলোক বর্ণালি (Spectrum) আলোকের লাল বিচ্যুতি (Red Shift), ডপলার অভিক্রিয়া (Dofler effect), হাবলের পর্যবেক্ষণ, ফ্রিডম্যান মডেল, আপেক্ষিক তত্ত্ব, পেনজিয়াস উইলসনের ম্যাক্রোওয়েভ গুঞ্জন পরীক্ষা ইত্যাদির আলোকে সম্প্রসারণের বিবরণ তুলে ধরেছেন।

আলোক হচ্ছে (আলোক কোয়ান্টাম) মূলত বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল সাতটি রঙের গুচ্ছ Spectrum। আলোক প্রবাহিত হওয়ার কালে এসব রঙ বর্ণালি সৃষ্টি করে। নিউটন প্রথম ত্রিকোণ কাচের মাধ্যমে তা পরীক্ষার সুযোগ করে দেন। আমরা যখন রঙধনু দেখি তখন বিভিন্ন রঙের আলোক বর্ণালি

www.pathagar.com

দেখতে পাই। আলোক তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হয়। তরঙ্গ আবার সেকেন্ডে প্রতি স্পন্দনের (Frequency) সমষ্টি। স্পন্দনের সংখ্যা ৪ থেকে সাত লক্ষ মিলিয়ন প্রতি সেকেন্ডে। আমরা আলোক বর্ণালিতে যে রঙ এর বিভিন্নতা দেখি তা এই স্পন্দনের পরিমাণগত পার্থক্য। স্পন্দনের সংখ্যা ঘন হলে বা মাত্রাগত পরিমাণ বেশি হলে নীল দেখাবে এবং হালকা বা কম হলে লাল দেখায়। আমরা যে লাল, নীল, হলুদ, কমলা বাহারী রঙের জিনিষ দেখি, এর কোনোটিরই নিজের কোনো রং নেই। কেবল আলোকপাত ঘটলেই রঙের কেতা দেখতে পাই। আলোহীন অন্ধকারে রঙের প্রশ্ন আছে কি? আসলে যা ঘটে তা হল কোনো জিনিষের ওপর আলোক ঘটলে বস্তুটি নিজস্ব গুণে আলোক বিশোষণে যে স্পন্দন অভিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা আমাদের চোখে রঙ হিসেবে ধরা দেয়। বস্তুর স্বগুণ থাকায় বস্তুভেদে স্পন্দনের সংখ্যা কম বেশি হয়। স্পন্দনের এরূপ পার্থক্যের কারণে নানা রঙ আমরা দেখি।

১৯২০ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যখন দূরের গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তারা দেখতে পান যে সব রঙের সেট আমাদের গ্যালাক্সির তারায় অনুপস্থিত সে সব সেট অন্যান্য গ্যালাক্সির তারাতেও অনুপস্থিত। কিন্তু একটি বিষয় দেখে অবাক হন। অন্য সকল গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে সবকটিতেই রঙগুলো লোহিত প্রান্তের দিকে বিচ্যুত বা সরে এসেছে। উপলার অভিক্রিয়ার দ্বারা তারা এর ব্যাখ্যা দেন এবং নিশ্চিত হন গ্যালাক্সিসমূহ অতিদ্রুত সরে যাচ্ছে বলেই লাল বিচ্যুতি (Red-Shift) ঘটছে।

কল্পনা করা যাক আমাদের থেকে স্থির দূরত্বে অবস্থিত কোনো তারকা বা আলোর উৎস থেকে আলোক আমাদের দিকে আসছে। যে আলোক, উৎসে উৎসারিত হচ্ছে তার স্পন্দন সমষ্টি আর আলোক তরঙ্গ যখন আমাদের নিকট পৌছাল তার স্পন্দন সমষ্টি সমান হবে। এবার কল্পনা করা যাক আলোক উৎসটি আমাদের দিকে সরে আসছে। সরে আসার কারণে উৎসারিত তরঙ্গটি আমাদের নিকট পৌছাতে কম সময় লাগবে। (দূরত্ব হ্রাস পাবে বলে)। ফলে উৎসারিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে যে পরিমাণ স্পন্দন থাকবে তরঙ্গটি যখন আমাদের নিকট পৌছাবে তখন তার স্পন্দন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ফলে তার নীল বিচ্যুতি ঘটায় উৎসটি নীলাভ দেখাবে। আবার উৎসটি যদি দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে স্পন্দন সংখ্যা কম হওয়ায় লাল বিচ্যুতি (Red Shift) ঘটবে এবং তা লাল দেখাবে। বিষয়টির আবিষ্কারকর্তা উইলিয়াম ডপলার। জোতির্বিজ্ঞানীগণ যখন দূরের গ্যালাক্সির প্রতি নজর রাখছিলেন, তারা দেখতে পান তাদের সকলের ক্ষেত্রেই লাল বিচ্যুতি ঘটছে। ডপলার অভিক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করে নিশ্চিত হন গ্যালাক্সিসমূহ ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে বলে লাল বিচ্যুতি ঘটছে। ওরা যদি আমাদের গ্যালাক্সির দিকে সরে আসত তাহলে নীল বিচ্যুতি ঘটত। এর ফলাফল মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

মহাবিশ্ব স্থিতাবস্থায় (Static) নেই তার আরো প্রমাণ মেলে ১৯২৯ সালে হাবলের পর্যবেক্ষণে। হাবল তারকার বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করে তারকা তথা গ্যালাক্সির দূরত্ব পরিমাপে ব্যস্ত ছিলেন। তখন পর্যন্ত ধারণা ছিল গ্যালাক্সিগুলোর দূর অপসারণ এলোমেলো ভাবে হচ্ছে। এর মধ্যে নীল বিচ্যুতির গ্যালাক্সিরাও থাকতে পারে। কিন্তু হাবলের পর্যবেক্ষণ ফলাফল প্রকাশে জানা গেল সকল গ্যালাক্সিরই লাল বিচ্যুতি রয়েছে এবং তাদের অপসারণের হার সমানুপাতিক। অর্থাৎ যে গ্যালাক্সি যত দূরে তার অপসারণ গতির হার তত বেশি। সত্যই এ কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে শতকোটি গ্যালাক্সি সমষ্টির এ বিশ্ব সামগ্রিকরূপে ছুটে চলেছে অন্তহীন শূন্যের পানে। আমরা যে আমাদের ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে গ্রহের গতি, ঢেউয়ের গতি, বাতাসের গতি, পালে নৌকার গতি, আমাদের চলা ফেরা গতি লক্ষ্য করি, সার্বিকভাবে সমগ্র বিশ্বটাই গতিশীল।

মহাবিশ্বকে নিয়ে চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে বড় অর্জন, মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল, এ বিশ্বাসে আস্থাশীল হওয়া। নিউটন এবং অন্যদের উচিৎ ছিল সম্প্রসারণতার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা। কারণ তাদের ভাবা উচিত ছিল স্থির বিশ্ব অচিরেই মহাকর্ষের টানে সংকুচিত হবে। নিউটনের ধারণা ছিল বিশ্বের একটি কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রটি মহাকর্ষ বলের ভারসাম্য রক্ষা করে স্থির বিশ্বের অস্তিত্ব ঠিক রেখেছে। সপ্তদশ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষ এ বিশ্বাসে অটল ছিল। এমনকি আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে স্থান-কাল গতিশীল এ অনিবার্যতা দেখা দেওয়ায় স্থির বিশ্বের বিশ্বাসে তিনি এ্যান্টিগ্রাভিটি নামক কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট মতামতটি আরোপ করেন। পরে অবশ্য তিনি স্বীকার করেন এটি ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।

মহাবিশ্ব স্থির নয়। তার বিপরীতে অনুমান করা যায় মহাবিশ্ব প্রসারমান। এই প্রসারমানতা যদি যথেষ্ট ধীর গতিতে হয় তাহলে মহাকর্ষ এর প্রসারণ বন্ধ করে সংকোচন ঘটাবে। কিন্তু প্রসারণ যদি একটি বিশেষ হারের (ক্রান্তিক হার) চেয়ে বেশি হয় তাহলে মহাকর্ষ এর প্রসারণ ঠেকাতে পারবে না। কারণ মহাকর্ষ বল প্রসারণ ঠেকানোর জন্য হবে কম শক্তিশালী। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে রকেট ছাড়লে যা হয়, ব্যাপারটা তাই। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষিপ্ত রকেটের গতি যদি যথেষ্ট ধীর হয় তাহলে মহাকর্ষ বল তাকে টেনে নামাবে। কিন্তু রকেটের গতি যদি বিশেষ দ্রুতির হার যথা সেকেন্ডে প্রায় সাত মাইল হয় তাহলে পৃথিবীর মহাকর্ষ বল রকেটটিকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে না। রকেটটি অনন্ত কাল ধরে পৃথিবী থেকে দূরে অপসারণ করবে।

www.pathagar.com

আসলে সকল তত্ত্ব, তথ্য, যুক্তি প্রমাণ ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ যখন প্রসারমান বিশ্বের পক্ষে তখনো আইনস্টাইনসহ অনেকে তা অস্বীকার করতে থাকেন। এ সময় ১৯২২ সালে রুশ পদার্থবিদ এবং গণিতজ্ঞ আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তিনি দুটি অনুমানের ওপর তা ব্যাখ্যা দেন। অনুমান দুটি (১) আমরা যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, মহাবিশ্ব একই রকম দেখাবে (২) আমরা যদি মহাবিশ্বের অন্য কোনো স্থান থেকে মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করি তাহলেও মহাবিশ্ব একই রকম দেখাবে। এর অর্থ মহাবিশ্ব সমষ্টিগতভাবে সমরূপ (Uniform)। সমরূপের সাথে প্রসারমানতার তাৎপর্য হল যে হারে (সম্প্রসারণের গতির হার) মহাবিশ্ব অপসারিত হচ্ছে। এর হার সমানুপাতিক হলে মহাবিশ্বের যে কোনো স্থান বা গ্যালাক্সি থেকে তাকাবেন তা সমরূপ দেখাবে। ফ্রিডম্যানের প্রস্তাবনা ছিল অনুমান ভিত্তিক। অবশ্য হাবল ১৯২৯ সালে গ্যালাক্সিসমূহের পরস্পর অপসারণের হার সমানুপাতিক দেখতে পান।

মহাবিশ্ব যে সমরূপ এবং গ্যালাক্সিসমূহের দূরাপসারণ ঘটছে তা প্রমাণিত হয় পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসনের অনুতরঙ্গ (Microwave) পরীক্ষায়। নিউ জার্সির বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিতে পেনজিয়াস ও উইলসন অত্যন্ত স্পর্শকাতর অনুতরঙ্গ (অনুতরঙ্গ আলোক তরঙ্গেরই মতো তবে তাদের স্পন্দনাঙ্ক সেকেন্ডে মাত্র ১০ হাজার মিলিয়ন) অভিজ্ঞাপক যন্ত্র পরীক্ষা করছিলেন। তারা দেখলেন অনুতরঙ্গ থেকে যে পরিমাণ গুঞ্জন আসা উচিত তা থেকে বেশি পরিমাণ গুঞ্জন (noise) আসছে। প্রথমে তারা যন্ত্রে ত্রুটি বলে ভাবলেন। যন্ত্রটি বিভিন্ন ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। লক্ষ্য করলেন গ্রাহক যন্ত্রটি যখন সোজাসুজি উপর অভিমুখী করা হয় তার তুলনায় অন্য যে কোনো দিক করা হলে গুঞ্জন (noise) শক্তিশালী হয়। এর কারণ আলোক রশ্মি যখন সোজাসুজি উপর থেকে আসে তার তুলনায় দ্বিগচক্রবাল (Horizon) থেকে আসে বিধায় অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। ফলে তা শক্তিশালী হয়। এই গুঞ্জনটির কোনো পরিবর্তন হয় না। সমস্ত বছর এমনকি ঋতুভেদে গুঞ্জনটির মাত্রা অপরিবর্তীত থাকে। আসলে এ গুঞ্জনটি আদিম বিশ্বের মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ; যা গুঞ্জন হিসেবে তাদের যন্ত্রে ধরা পড়েছে। মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ মহাবিশ্বের সমরূপ প্রমাণ করে কারণ এর গুঞ্জন নিকট এবং দূর আকাশের দ্বিগচক্রবাল থেকে একই হারে ধরা দেয়। আদিম বিশ্বের অবশেষ এ গুঞ্জনের কারণ। প্রায় একই সময়ে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন পদার্থবিজ্ঞানী বব ডিক এবং জিম পিবলস আলেকজেন্ডার ফ্রিডম্যানের ছাত্র জর্জ গ্যামোর 'অনুতরঙ্গ' বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। জর্জ গ্যামোর প্রবন্ধটি ছিল মহাবিশ্বের আদিম অবস্থা খুব উত্তপ্ত এবং ঘন হওয়া উচিত। এবং তা হবে তাপদীপ্ত। ডিক ও পিবলসের যুক্তি ছিল আদিম মহাবিশ্বের দিপ্তি (Radiation)

www.pathagar.com

এখনো আমাদের দেখতে পাওয়া উচিত। কারণ আলোক বহু দূরবর্তী অংশ থেকে মাত্র বর্তমান কালেই এসে পৌঁছাচ্ছে। মহাবিশ্ব প্রসারমান এ সত্য ডিক ও পিবলসের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর মহাবিশ্ব যদি এভাবে প্রসারমান হয় তাহলে আলোকের লাল বিচ্যুতি এত বেশি হবে যে সেগুলি আমাদের কাছে দেখাবে অনুতরঙ্গ বিকিরণের মতো। ডিক ও পিবলস যখন তা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন সে সময়েই পেঞ্জিয়াস ও উইলসন সে বিকিরণকে গুঞ্জন হিসেবে শনাক্ত করেন। পেঞ্জিয়াস ও উইলসন ১৯৭৮ সালে এ আবিষ্কারে নোবেল পুরস্কার পান। মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই সম্প্রসারণের দিক ঠিকানা কী? বা এর অবয়বগত বৈশিষ্ট্য বা কী? এ বিশ্লেষণে ফ্রিডম্যান প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুধাবনযোগ্য। ফ্রিডম্যান মডেলটি মূলগত তিনটি অনুমানে সম্প্রসারণের দিক ঠিকানার তিন ধরনের প্রতিরূপ পাওয়া যায় যথা (১) বদ্ধ মহাবিশ্ব (Closed Universe) (২) খোলা মহাবিশ্ব (Open Universe) (৩) ঋণাত্মক বাঁকানো মহাবিশ্ব (Negatively curved Universe)। প্রথমটিতে মহাবিশ্ব যথেষ্ট ধীরভাবে প্রাসারমান। এবং গ্যালাক্সিসমূহের (নীহারিকা/ছায়াপথ) পরস্পরের প্রতি মহাকর্ষীয় আকর্ষণের দরুণ প্রসারণ ধীরতর হবে। গ্যালাক্সিগুলো পরস্পরের দিকে যেতে থাকবে এবং প্রসারণ বন্ধ হয়ে সংকুচিত হবে। দ্বিতীয় ধরণের সমাধানে মহাবিশ্ব এত দ্রুত প্রসারমান যে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ কখনই প্রসারণ বন্ধ করতে পারবে না। আর তৃতীয় সমাধান মহাবিশ্ব সরল রেখায় সম্প্রসারিত নয়। কিছুটা বক্রপথে তবে কখনো তা চুপসে যাওয়ার মতো নয়।

সম্প্রসারণে অবয়বগত বৈশিষ্ট্য বিধায় মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে একটা বেলুন ফোটানোর মতো। সংকুচিত অবস্থায় ধরা যাক বেলুনটার গায়ে ফাঁকে ফাঁকে ফোঁটা ফোঁটা রঙ লাগানো আছে। এবার অবিরাম বেলুনটা ফোলানো হলে রঙের ফোঁটাগুলো দ্রুত সরে যাবে। মহাবিশ্বটা এ আবরণে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণশীল বা প্রসারমান বিশ্বের নানা তত্ত্ব এবং ফ্রিডম্যানের সমাধানের একটি দিক হল প্রসারমান বিশ্ব দূর অতীতে (অনুমান ১৪ বিলিয়ন বা ১৪০০ কোটি বছর পূর্বে) সব গ্যালাক্সিগুলো একসাথে ছিল এবং ওরা ছিল ঘনীভূত অবস্থায়। অসীম ঘনত্বে মহাবিশ্ব একক অনন্যতায় (One Singularity) বিরাজ করছিল। এমন অনন্যতার মহাবিস্ফোরণে মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু যাকে বলা হয় বিগ-ব্যাং। বিগ-ব্যাং-ই মহাবিশ্বের প্রথম ঘটনা। এ ঘটনায় কাল বা সময়ের শুরু। বিশ্ব তার গঠন প্রক্রিয়ায় যতদূর পর্যন্ত বর্তমানে এসেছে তাই কালের পরিমাপ। নাসা, কম্ব, ওয়াস্ক সার্ন বিজ্ঞান সংস্থাগুলো যে হিসেব বর্তমান করেছে তা থেকে জানা যায় ১৩.৭ বিলিয়ন বা তেরশত সত্তর কোটি বছর পূর্বে মহাবিশ্বের শুরু। সে হিসেবে বর্তমান মহাবিশ্বকে আমরা যেভাবে বুঝেছি এর বয়স এক হাজার তিনশত

www.pathagar.com

সত্তর কোটি বছর। হকিং তার ব্রিফ হিস্টরি গ্রন্থে ৪২ পৃষ্ঠায় বিগ-ব্যাং থেকে প্রসারমাণ মহাবিশ্বের প্রতিরূপ এভাবে তুলে ধরেছেন—

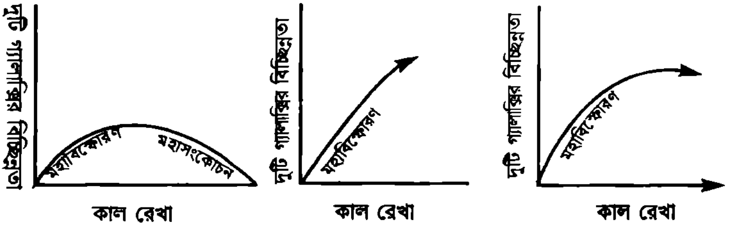

চিত্র-১ (বদ্ধ ইউনিভার্স) চিত্র-২ (খোলা ইউনিভার্স) চিত্র-৩ (ঋণাত্মক খোলা ইউনিভার্স)

প্রথম চিত্রে একক অনন্যতায় মহাবিস্ফোরণে মহাবিশ্বের তথা কালের শুরু। লম্ব রেখায় দুটি গ্যালাক্সির অপসারণে কালের সম্মুখগতি যা কাল রেখায় দেখানো হয়েছে। মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে হতে মূল বিন্দুতেই ফিরে আসবে এবং প্রসারণ বন্ধ হবে। এটি মহা সংকোচন (Big Crunch) বা কালের সমাপ্তি। স্থান নিজের ওপর বাঁকানো এবং বৃত্তাকার। অনেকটা ভূ-পৃষ্ঠের মতো। দ্বিতীয় চিত্রে মহাবিশ্ব চিরন্তন প্রসারণশীল। স্থান ঘোড়ার জিনের মতো বাঁকানো। তৃতীয় প্রতিরূপে প্রসারণের হার শুধুমাত্র ক্রান্তিক অর্থাৎ মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধও হতে পারে অথবা নাও হতে পারে।

এই প্রতিরূপের মধ্যে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ কী তা নির্ভর করছে মহাবিশ্বের বর্তমান প্রসারিত হার এবং মহাবিশ্বের গড় ঘনত্বের ওপর। ঘনত্ব যদি বিশেষ হারের কম হয় তাহলে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ, মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ করতে সক্ষম হবে না। আর যদি ঘনত্ব বেশি হয় তাহলে ভবিষ্যতে কোনো এক সময় প্রসারণ বন্ধ হয়ে মহাবিশ্বে চুপসে যাবে। দুটি বিকল্পের মধ্যে ডপলার অভিক্রিয়ার ভিত্তিতে হকিং এর মতামত—

> So all we know is that the Universe is expanding by between 5 percent to 10 percent every thousand million years ... our galaxies and other galaxies, however must contain a large amount of 'dark matter' that we cannot see directly, but which we know, must be there be because of the influence of its gravitational attraction of the orbit of the stars in the galaxies ... where we add up all these dark matter. we will still get only about one tenth of the amount required to halt expansion. The presence evidence therefore suggests that the universe will probably expand for ever, but all so can really be sure of is that even if the universe re collapse wont do so for at least another ten thousand million million years since it has already been expands

www.pathagar.com

for at least that long this should not worry by that time unless we have colonized beyond this solar system, mentioned with long since have died out distinguish along with our sun.
—(Brief History- page-49).

আমরা যেটুকু জানি সেটা হল প্রতি হাজার মিলিয়ন বছরে মহাবিশ্ব শতকরা ৫ ভাগ থেকে ১০ ভাগ হারে প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব সম্বন্ধে আমাদের অনিশ্চয়তা আরো বেশি। আমরা যদি আমাদের ছায়াপথ এবং অন্যান্য সকল গ্যালাক্সির সমস্ত তারকাগুলোর ভর যোগ করি, তাহলে যে ভর হবে, সেটা মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ করার যেটা প্রয়োজনীয় গড় তার ১ শতাংশের চেয়েও কম। ...আপাতত যা সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় মহাবিশ্ব চিরকালই প্রসারমাণ থাকবে। তবে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি মহাবিশ্ব যদি চুপসেও যায়, তাহলেও সেটা আগামী দশ হাজার মিলিয়ন বছরের আগে হবে না। এ নিয়ে অনর্থক চিন্তার কোনো কারণ নেই। কারণ আমরা যদি সৌরজগতের বাইরে উপনিবেশ স্থাপন করতে না পারি, তাহলে তার বহু আগেই আমাদের সূর্য নিভে যাবে এবং তার সাথে মনুষ্য জাতির মৃত্যু হবে। সূর্যের বর্তমান বয়স ৫০০ কোটি বছর। সূর্যের জ্বালানি ব্যয়ের হিসেব মতে আগামী ৫০০ কোটি বছরের মধ্যে সূর্য জ্বালানি শেষ করে নিভে যাবে।

অধ্যায়ের শেষ অংশে কালের তথা মহাবিশ্বের যে একটা শুরু ছিল সে বিষয় হকিং তার নিজের গবেষণার বিষয় তুলে ধরেছেন। সে সাথে আপেক্ষিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতায় কণাবাদী তত্ত্ব আরোপে বিগ-ব্যাং তত্ত্বের যাচাই বাছাই করার লক্ষ্যে কণাবাদী তত্ত্ব আলোচনায় সঠিক সিদ্ধান্তের প্রতি গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়ে মোড় ঘুরিয়েছেন।

তত্ত্ব, তথ্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল যে মহাবিশ্ব প্রসারমান। কোনো কিছু প্রসারমান এর সাধারণ অর্থ প্রসারমাণতার শুরু থাকতেই হবে। অনুরূপ বিশ্ব প্রসারমান। যার অর্থ বিশ্বের শুরু ছিল। শুরুই যদি থাকে, তাহলে শুরু কীরূপ বিষয় থেকে? সে শুরুটার কারণ কী? বা শুরু পূর্বের অবস্থা কী? এসব প্রশ্ন অবান্তর নয়। ১৯৬৫ সালে বৃটিশ গণিত ও পদার্থবিদ রজার পেনরোজ একটি চিন্তন উপস্থাপন করেন। সাধারণ বা ব্যাপক আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে স্থান-কাল বাঁকা। বৃহৎ কোনো তারকা বা সূর্যের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহমান কালে আলোক রশ্মি বেঁকে কোণ (Cone) সৃষ্টি করে। আলোকের কোণ সৃষ্টি এবং তারকার মহাকর্ষের মধ্যে এমন প্রস্তাব করেন যে, তারকাটি জ্বালানি শেষ করতে করতে যতই চুপসে যেতে থাকবে ততই এর মহাকর্ষ বল বাড়তে থাকবে। তারকাটি চুপসে যেতে যেতে এর পৃষ্ঠদেশ শূন্যে পরিণত হবে এবং মহাকর্ষ বল হবে অসীম। এমন অবস্থায় অঞ্চলটিতে

www.pathagar.com

মহাকর্ষ বল এতটাই প্রবল হবে যে দ্রুতশীল আলোকও পালাতে পারবে না। আলোক মহাকর্ষ টানে অঞ্চলটির ভিতরে প্রবেশ করবে। আর তা হবে গভীর কৃষ্ণগহ্বরের মতো। তারকার ভিতরের সমস্ত পদার্থ সংকুচিত হয়ে শূন্য আয়তন বিশিষ্ট অঞ্চলে অবস্থান করবে। পদার্থের ঘনত্ব এবং স্থান-কালের বক্রতা হবে অসীম। কৃষ্ণগহ্বর নামে পরিচিত স্থান-কালের একটি অঞ্চলে অনন্যতা (Singularity) থাকবে। এর পরবর্তী কয়েক বছরে হকিং কতগুলো গাণিতিক ব্যবহারিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এর সত্যতার প্রমাণ করেন। চূড়ান্ত গবেষণার ফল প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। এ গবেষণায় কৃষ্ণগহ্বর ও কৃষ্ণগহ্বরে অনন্যতা স্বীকৃতি লাভ করে। এর ফলাফল মহাবিশ্ব কৃষ্ণগহ্বরের রূপ অনন্যতায় শুরু হয়েছিল। মহাবিশ্বের যা কিছু দৃশ্যমান তা ছিল না। শূন্য আয়তনে অসীম ভরে তা ছিল বিন্দবৎ। স্থান ছিল অসীম বক্র। কাল ছিল '০'। কাল যদি শূন্য হয় তাহলে এর পূর্বের অবস্থা কী? এ প্রশ্ন নিরর্থক। কেবল বলা যায় কালের শুরু মহাবিস্ফোরণ (Big-Bang) থেকে। হকিং দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন আপেক্ষিক তত্ত্ব সঠিক হলে বিগ-ব্যাং এ মহাবিশ্বের শুরু।

কিন অধ্যায়ের শেষে আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। আপেক্ষিক তত্ত্ব কাল-নির্ভর। কিন্তু অনন্যতায় শূন্যকালের কোনো বিবরণ এ তত্ত্ব দিতে পারে না। কারণ সেখানকার কোনো ঘটনাই জানা সম্ভব নয়। এ অবস্থানে এসে তত্ত্বটি ভেঙে পড়ে। আংশিক তত্ত্ব (partial theory) হিসেবে আপেক্ষিক তত্ত্ব বৃহদাকার বিশ্বের ভালো বর্ণনা দেয়। কিন্তু পদার্থের ক্ষুদ্র কণার সংগঠন যা দিয়ে পদার্থ তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি তার ব্যাখ্যা আপেক্ষিক তত্ত্বে নেই। ফলে আপেক্ষিক তত্ত্ব মহাবিশ্বের আদি কারণ ব্যাখ্যায় তা কেবল আংশিক, একক বা সম্পূর্ণ তত্ত্ব নয়। ফলে ক্ষুদ্র আয়তনের অনন্যতায় কণার আচরণ ভিত্তিক নির্ভরতায় কণাবাদী তত্ত্বের বিশ্লেষণে 'কোয়ান্টায় গ্রাভিটি' বা কণাবাদী মহাকর্ষ তত্ত্বের তালাশে তাঁর পরবর্তী অধ্যায় বিশ্লেষণ।

www.pathagar.com

অনিশ্চয়তাবাদ নীতি
The Uncertainty principle

ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের যাবতীয় বস্তুনিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে নিয়মবদ্ধ বিশ্বকে দেখি। ঋতুর পরিবর্তনে প্রকৃতির নানা রূপ পরিবর্তন, পত্র পল্লবের নানা শোভা, ঝড়, প্লাবন থেকে শুরু করে গ্রহের গতি, নক্ষত্রের আলো, চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধি, দিন ও রাতের আগমন নির্গমন নিয়মবদ্ধ ঘটনা। প্রকৃতি একগুচ্ছ বিধির (set of laws) সমষ্টি। এসব বিধি জানা হলে বিশ্ব প্রকৃতির সকল ঘটনা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে। মূলত বিশ্ববিধির অধীন যা বিজ্ঞানের ভাষায় বিশ্লেষণধর্মী। এভাবে বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক নিয়তিবাদের (scintific determinism) ঘোষণা দেয়। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শতভাগ নিশ্চিত সত্যতার ঘোষণা দিলেও বিশেষ অনিশ্চয়তা দেখা দেয় কণিকার (Pearticle) স্থিতি ও গতির অবস্থান নির্ণয়ে। বিষয়টি তুলে ধরেন বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ। যে কণিকা পদার্থ তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু নিয়ে মূল ভীত তার আচরণ বিচরণ অজানা, খুবই রহস্যের গভীরে নিমজ্জিত। যত বিধিই জানা হোক না কেন নিশ্চিত ফলাফল তথা ভবিষ্যদ্বাণী অনিশ্চিত। সমাধানটি বিজ্ঞান এখনো খুঁজে পায়নি। বিজ্ঞান জগৎ বিষয়টি অনিশ্চয়তাবাদ (Uncertainty principle) বলে মেনে নিয়েছে। কোনো পথ রুদ্ধ হচ্ছে আরাধ্য পথিক যেমন বিকল্প কোনো পথের সন্ধান করে, তেমনি বিজ্ঞান, বিষয়ের জ্ঞান অন্বেষণে বিকল্প পদ্ধতিতে এর সমাধান চেষ্টা করে। এ বিষয়টি হকিং এ অধ্যায়ে ব্যক্ত করেছেন।

অধ্যায়টির শুরু মারকুইস ডি লাপ্লাসের বৈজ্ঞানিক নিয়তিবাদ (Scientific determinism) দিয়ে। লাপ্লাসের প্রস্তাবনা ছিল এরকম। তার যুক্তিতে মহাবিশ্ব একগুচ্ছ বিধি দ্বারা শাসিত। ফলে একটি কালে বা অবস্থায় যদি বিধি জানা থাকে তাহলে মহাবিশ্বের কী ঘটছে তা সম্পূর্ণ রূপে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। লাপ্লাস তা বলতে পেরেছিলেন নিউটনের তত্ত্বের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সূর্য এবং গ্রহগুলোর আবর্তন যদি জানা যায় তাহলে নিউটনের বিধিগুলো প্রয়োগ করে সৌরজগতের যে কোনো গ্রহের অবস্থার সঠিক গণনা করে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। অন্যান্য বিষয় এমনকি মানবিক আচরণ সম্পর্কেও এমন বিধি রয়েছে। অনেকেই এর ঘোর বিরোধী ছিলেন বিশেষ করে এ মতবাদ ঈশ্বরের

www.pathagar.com

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। এ ছাড়া এ প্রশ্নও রাখা হল প্রকৃতির বিধিগুলোই কি সম্পূর্ণ বিধি? এর কি কোনো ব্যত্যয় নেই? এ সময় জার্মান বিজ্ঞানী ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ বিখ্যাত অনিশ্চয়তাবাদ (Uncertainty principle) গঠন করেন। রহস্যময় বিশ্ব তথা পদার্থিক জগতাধারে বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞান অন্বেষণে মানুষ ভেবেছে অনেক কাল। ভাবনা ও অনুসন্ধানের কাজে তারা কারণের কারণ তথা কার্যকর বিধির সন্ধানে ব্যস্ত থেকেছে। বিংশ শতাব্দীতে এসে বৌদ্ধিক চেতনা দৃঢ়তা লাভ করেছে। পদার্থের দূরতর ও নিকটতর বিচার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে। দূরতর বর্ণনায় নিউটন ও আইনস্টাইনের তত্ত্ব, ভালো তত্ত্ব। কিন্তু পদার্থের ক্রমাগত ভাঙন ক্রিয়ায় মূলের সূত্র কী? সে পরমাণু বিষয়ক সূত্র নিউটন, আইনস্টাইনের তত্ত্বে নেই। অথচ বৃহৎ সকল বস্তু গঠনের মূলে রয়েছে পরমাণু (Atom) ও পরমাণুধীন (Sub-Atomic) উপাদান। নিউটন, আইনস্টাইনের তত্ত্ব, পদার্থের স্থান, কাল, মাত্রা, অবস্থান, আয়তন, গতিবেগ, ভর, শক্তি তথা দৃশ্যমান বৃহৎ বস্তুর আচরণ-বিচরণের ব্যাখ্যা দেয়। অনুরূপ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকতে হবে বৃহৎ বস্তু গঠনের উপাদান কণিকায়। কণিকার আচরণ, বিচরণ, গতি, স্থিতি, লয়, গঠন-কাঠামো বিজ্ঞানজগতে ভিন্নমাত্রিক নিরীক্ষা বা কণাবাদী বলবিজ্ঞান বা কোয়ান্টাম তাত্ত্বিকতায় প্রকাশ লাভ করেছে। মূলত কণাবাদী বলবদ্যিা পরমাণুর গঠন কাঠামোসহ এর উপাদান (ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, অন্যান্য কণিকা) বিশ্লেষণ করে। আপেক্ষিক তত্ত্বের মতো কণাবাদী বলবিজ্ঞানেও বিধি বা সূত্র মেনে চলে। কিন্তু সূত্রটির দ্বারা সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে হলে কণিকার স্থিতি ও গতির পরিমাপ অত্যাবশ্যক। এ বিষয়ে রয়েছে অনতিক্রমন্য অনিশ্চয়তা।

১৯২৬ সালে ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ (Warner Heinsenbarg) ব্যক্ত করেন একটি কণিকার ভবিষ্যৎ অবস্থান ও গতিবেগ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হলে তার বর্তমান অবস্থান ও গতিবেগের নির্ভুল মাপন প্রয়োজন। এ কাজ করার সহজ উপায় কণাটির ওপর আলোকপাত ঘটান। তাহলে কিছু আলোক তরঙ্গ কণিকাকে বিক্ষিপ্ত করে (Scattered) দেবে; ফলে কণিকার অবস্থানের নির্দেশ পাওয়া যাবে। তবে পদ্ধতিগতভাবে আলোকের দুটি তরঙ্গ শীর্ষের দূরত্বের বাইরে ঐ কণিকার অবস্থান নির্ধারণ করা যাবে না। সে জন্য প্রয়োজন হবে হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকপাত করা। যাতে কণিকাটির সঠিক অবস্থান মাপা যায়। এ সময় ম্যাক্সপ্লাঙ্ক আলোকের বিকিরণের পরিমাণগত বা কোয়ান্টা প্রকল্প ব্যক্ত করেছেন। আলোক ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দন সমষ্টিতে প্রবাহিত হলেও তা প্যাকেট বা কোয়ান্টা (মুঠো) হিসেবে প্রবাহিত হয়। প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম প্রকল্প অনুসারে যে কোনো ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলোক (মাইক্রোওয়েভ, রেডিও ওয়েভ, এক্স-রে) ব্যবহার সম্ভব নয়। অন্তত এক

কোয়ান্টাম আলোক ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এ পরীক্ষণ আলোক কণিকাকে অস্থির করে তুলবে এবং তার গতিবেগে এমন পরিবর্তন আনবে যে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে না। আবার অবস্থানের মাপন যত নির্ভুল হবে, আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও তত ক্ষুদ্র হবে। ফলে এক কোয়ান্টাম শক্তির পরিমাণ হবে উচ্চতর। ফলে বৃহত্তর শক্তি গতিবেগের স্থিরত্বকে বিঘ্নিত করে তুলবে। অন্যভাবে বলা যায়, একটি কণিকার অবস্থান যত নির্ভুল ভাবে মাপার চেষ্টা করা যাবে তার দ্রুতির পরিমাণ হবে তত ভুল। আর দ্রুতির পরিমাণ যত নির্ভুল মাপনের চেষ্টা করা হবে তার অবস্থানের পরিমাপ হবে তত ভুল। এটাই অনিশ্চয়তার নীতি।

বর্তমান কাল পর্যন্তও এ সমস্যার সমাধান হয়নি। লাপ্লাসের প্রকৃতির নিয়তিবাদ স্বপ্নটি অর্থবোধক বলে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে বহুল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে আছে। মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থাই যদি মাপা সম্ভব না হয় তাহলে ভবিষ্যৎ বিষয়ে নির্ভুলভাবে বলা অসম্ভব। এটি লাপ্লাসের স্বপ্নের অন্তিম অবস্থা বৈকি? অবশ্য আমরা কোনো অতিপ্রাকৃত জীবন (যেমন ঈশ্বর) সাপেক্ষে প্রকৃতির এমন বিধানের ব্যাখ্যা দিতে পারি কিন্তু বিজ্ঞানে সে বিষয়ের আকর্ষণ নেই। তেমন হলে বিজ্ঞানের কৌতূহল থেমে যায়। ফলে যা কিছু অকার্যকর তা ঝেড়ে ফেলে হাইজেনবার্গ, আরডিং শ্রডিংগার, পল ডিরাক উনিশশত বিশের দশকে কণাবাদী তত্ত্বের পুনর্গঠন করে কণাবাদী বলবিজ্ঞান বা কোয়ান্টাম ম্যাকানিকস (Quantum mechanics) নামক নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল ভিত্তি হল অনিশ্চয়তাবাদ। যার সাধারণ অর্থ সম্ভাব্যতা। অর্থাৎ মহাবিশ্বের শুরু, শেষ তথা পুনর্গঠন, পরিণতি বিষয়ে আমাদের সম্মুখে থাকবে পর্যালোচনা, পরীক্ষা ও তথ্যভিত্তিক সম্ভাব্যতা। হকিং কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারী বিজ্ঞানী। তিনি তার তত্ত্ব, তথ্য, পর্যালোচনায় মহাবিশ্বের যে ইতিহাস, পরিণতি পূর্বাভাস প্রদান করেছেন তা থেকে মানুষ বিশ্বকে নিয়ে নবচেতনায় আকৃষ্ট হয়ে উঠছে।

নিউটন ও আইনস্টাইনের সূত্রে গণনার ফলাফল সুনিশ্চিত। ছুঁড়ে দেওয়া পাথর খণ্ডের গতির হিসেব গণনায় দূরত্বের সুনিশ্চিত পরিমাণ জানা যায়। $E = Mc^2$ সূত্রে গতির মুখে শক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু কণাবাদী বলবিজ্ঞান বা কোয়ান্টাম তত্ত্বে এরূপ সুনিশ্চিত ফলাফল প্রাপ্তির অবকাশ নেই। বরং এ তত্ত্বে আছে সম্ভাব্যতা। আইনস্টাইন কখনো এ তত্ত্ব মেনে নিতে পারেননি। এ সম্পর্কে তার মনোভাব সংক্ষেপে তিনি প্রতিবেদনে ব্যক্ত করেন 'God does not play dice..' ঈশ্বর পাশা খেলেন না। তা সত্ত্বেও কোয়ান্টাম তত্ত্বে অবদান রাখার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানকে মেনে নেন। কারণ এ বলবিজ্ঞানের সাথে পরীক্ষামূলক তথ্যের নিখুঁত

www.pathagar.com

ঐক্য ছিল। আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদরা প্রায় অধিকাংশের ভিত্তি এই কণাবাদী বলবিজ্ঞান বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব। ট্রানজিস্টার, টেলিভিশন বিকাশের মূলে রয়েছে এই তত্ত্ব। আধুনিক রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের ভিত্তিও এই তত্ত্ব? তবে যে দুটোর সাথে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানকে যুক্ত করা যায়নি তাহল মহাকর্ষ এবং মহাবিশ্বের বৃহৎ মাত্রিক গঠন।

কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের বিশেষত্ব হল প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য মোতাবেক কণার আচরণ, বিচরণ, স্থিতি, গতির ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। যেমন আলোক প্রবাহ তরঙ্গ এবং কণা হিসেবে স্বীকৃত। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে আলোকের দ্বিত্বকে (Duality) প্রয়োজনমাফিক ব্যবহার করে নিশ্চিত ফলাফলের দিকে অগ্রগামী হয়।

মূলত কণাবাদী বলবিজ্ঞান পদার্থ গঠনের অতিক্ষুদ্রতম কণা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন সমন্বয়ে নিউক্লিয়াসের গঠন ও গতিবিধি ব্যাখ্যায় জাগতিক বিধির সমুন্নত রূপদানে সচেষ্ট। কণার গতিবিধির বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়েছেন কণাবাদী পদার্থবিদগণ। তাদের মধ্যে রিচার্ড ফেনম্যানের (Richard Feynman) তথাকথিত ইতিহাসের যোগফল (Some over histories) তরঙ্গ ও কণার দ্বিত্ব (Duality) অনুভব করার সুন্দর একটা পদ্ধতি। ফেনম্যান তার গবেষণায় দেখান কণিকা স্থান-কালে চিরায়ত (Classical) তত্ত্বের মতো একটি পথ বা ইতিহাস ধারণ করে না। তার বদলে কণিকাটি যে কোনো সম্ভাব্য পথ অনুসরণ করে। কণিকাটির সকল পথের সম্ভাব্যতা যাচাই করে বাস্তব সম্মত ইতিহাসটি গ্রহণ করা হয়। আর এভাবে জগৎ গঠনে সম্ভাব্য ইতিহাস নিয়ে বিজ্ঞান ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে।

আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদ তত্ত্ব মহাবিশ্বের বৃহৎমাত্রিক গঠনের ভালো তত্ত্ব। এ তত্ত্বে আমরা স্থান-কালের বিবরণে মহাবিশ্ব গঠনের মূলে দৃষ্টিপাত করতে পারি। কিন্তু কণাবাদী বলবিজ্ঞানের অনুপস্থিতিতে এবং কী ঘটেছিল বিগ-ব্যাং এ তা জানা যায় না। মূলত কৃষ্ণগহ্বর এবং বিগ-ব্যাং অনন্যতায় মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের অসীম ঘনত্ব বিবরণে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। হকিং এর প্রচেষ্টা অন্তত কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টিতে আপেক্ষিক ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সম্মিলন ঘটান। তার পূর্বে পরবর্তী অধ্যায়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বোঝার আধুনিক প্রচেষ্টাগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

মৌলিক কণা এবং প্রাকৃতিক বল
Elementary Particles and the Forces of Nature

এ অধ্যায়ে হকিং কণাবাদী তত্ত্বে মৌলিক কণার আবিষ্কারের ইতিহাসসহ কণাসমূহের সাধারণ ও গভীর পরিচিতি তুলে ধরেছেন। কণাসমূহের আচরণ, বিচরণ, স্থিতি, শক্তি, লয় বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কণার গঠন, ভাঙনসহ কণা প্রতিকণার স্বরূপে মহাবিশ্বের স্বরূপের চিন্তন স্পষ্ট করেছেন। অ্যাটোমিক ও সাবঅ্যাটোমিক স্তর পর্যন্ত তাত্ত্বিকতায় তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া যে কোনো বিষয় শক্তির বা বলের অনুরণন। আমাদের চিন্তনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক শক্তির লীলা বলে ভাবতে ভালো লাগে। বিজ্ঞানও সে একক শক্তির সন্ধানে ব্যস্ত। কিন্তু বিজ্ঞান পরীক্ষিত ও গাণিতিক হিসেবের বাইরে জ্ঞানকে বাতিল বলে গণ্য করে। এ অধ্যায়ে দেখা যাবে বিজ্ঞানে অনিবার্য বল চারটি। আবার সেসব বলের একীভূত রূপদানের প্রয়াসও এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

ধরুন, আপনি এখন চেয়ারে বসে আছেন। আপনার সামনে ৪ ফুট দৈর্ঘ্য, তিন ফুট প্রস্থ; দুই ফুট উচ্চতার একটি টেবিল। বৃহৎ আকারে এ টেবিলের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার মাত্রায় (Three Dimension) টেবিলটি দেখছেন। এরপর স্থান ও কালের মাত্রা যোগ করলে টেবিলের প্রতি আপনার পর্যবেক্ষণ সঠিক ও সিদ্ধ। টেবিলটিকে ক্ষুদ্র অংশে ভেঙে এবার এর গঠন কাঠামোর দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারেন। দেখছেন টেবিলটি কয়েকটি ছোট আকারের তক্তার (Wood piece) জোড়া, সে সাথে পায়া-পাসির সমন্বয়ে টেবিলটি ভারসাম্যে আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে। আমরা বিশ্বকে এভাবে ভাবতে পারি। এটাই নিউটন ও আইনস্টাইনের পর্যবেক্ষণের তত্ত্ববিকাশ। যা বৃহদাকার বিশ্বের ভালো করে বর্ণনা দেয়।

এবার আপনার দৃষ্টি টেবিলটির ক্ষুদ্র অংশের দিকে ফেরাতে পারেন। টেবিলের একটি পায়ার দিকে দৃষ্টি দেন এবং পায়াটিকে করাত দিয়ে খণ্ড খণ্ড করতে থাকেন। এবার একটি খণ্ডকে হাতে নিয়ে তা ভাঙতে থাকুন। এভাবে ভাঙতে থাকলে কোটি কোটি কণায় তা বিভক্ত হবে। মূলত ঐ কণা সমষ্টির দ্বারা কাষ্টখণ্ড, তা থেকে পায়ার সম্পূর্ণ গঠন। সর্বশেষ সকল পায়া, পাসি, তক্তার সমন্বয়ে সম্পূর্ণ টেবিল। তাই বস্তুর গঠন কাঠামোর মূলের দিকে তাকালে এর ক্ষুদ্রত্বের দিকে তাকাতে হয় যা

www.pathagar.com

কণাবাদী বা কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের বিষয়। পদার্থ তথা বিশ্বের গঠন কাঠামো অনুধাবনে বিজ্ঞানের তত্ত্ব অংশত (Particle) এ দুভাবে ভাগ হয়ে আছে। একটি বৃহদাকার গঠন যা আপেক্ষিক তত্ত্বের বিষয়, অন্যটি ক্ষুদ্রাকার যা কণাবাদী তত্ত্বের বিষয়। মূলত এ দুটি তত্ত্বের সমন্বয় করেই জগৎ বুঝতে হবে।

যে কোনো পদার্থের মূল উপাদান কী? এ ভাবনায় চিন্তাশীল মানুষ অতীত কাল থেকে তাড়না অনুভব করে আসছে। এরিস্টোটল ভাবতেন পদার্থ চারটি উপাদানে গঠিত যথা—ক্ষিতি (Earth), অব (Water), তেজ (Fire), মরুৎ (Air)। ক্ষিতি এবং অব ভারি। এর নিচে নামার প্রবণতা রয়েছে। আর তেজ ও মরুৎ হালকা। এর প্রবণতা ওপরে ওঠা। তবে উভয় ক্ষেত্রে কার্য করলে অন্তর্নিহিত বল। তাই পদার্থ ও বলের ক্রিয়ায় বিষয়টি বিদ্যমান। বিজ্ঞান আজও পদার্থে বলের ক্রিয়া নিয়েই কাজ করে। তবে উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণ নিখুঁতভাবে তা জানার সুযোগ করেছে।

এরিস্টোটল বিশ্বাস করতেন পদার্থ টুকরোকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা সম্ভব। অবিকৃত ভাবেই তা ভাগ করা যাবে এবং কখনই ভাগের সীমানায় পৌছানো যাবে না। অন্য কথায় ভাগের শেষ নেই। পরিশেষে তা আগুন, পানি, মাটি, বাতাসে মিলিয়ে যাবে। এরিস্টোটলের বিপরীতে অনেকের ধারণা ছিল পদার্থের এ ভাগের প্রক্রিয়ার একটা সীমানা আছে যারপর আর ভাগ করা যাবে না। এরিস্টোটলের প্রায় সমসাময়িক কালে ডেমোক্রেটিয়াস বলতেন, বস্তু জন্মগত ভাবেই দানাদার (Grainy) এবং সকল বস্তুই এটোমে (পরমাণু) দিয়ে গঠিত। গ্রীক ভাষায় এ্যাটোম অর্থ অবিভাজ্য (Uncutable)। ভারতীয় ঋষি কর্ণাদ ভাবতেন বস্তু অসংখ্য কণার সমষ্টি। অনেকে মনে করেন 'কণা' (Particle) শব্দটি এসেছে কণাদের নামে।

পদার্থের ভাঙন ক্রিয়ায় পরমাণু আছে কি নেই এ তর্ক চলছিল প্রায় দুই হাজার বছর ধরে। তবে ১৮০৩ সালে বৃটিশ রসায়নবিদ ও পদার্থবিদ জন ডাল্টন একটি মৌলিক সূত্রের সন্ধান দেন। সূত্রটি এমন, রাসায়নিক যৌগগুলো সব সময়ই একটি বিশেষ অনুপাতের মিশ্রণের ফলে হয়। এ তথ্য জানান দেয় যে পরমাণুগুলো বিশেষ এককে গোষ্ঠীবদ্ধ। যেমন পানি একটি যৌগ, যার সাধারণ সূত্র H_2O। অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গোষ্ঠীগতভাবে পৃথক মৌল বা পরমাণু ধারণ করে আছে। গোষ্ঠীবদ্ধতার ক্ষেত্রে তিনি এগুলোর নাম দিয়েছিলেন অণু। মূলত ডাল্টনের মতবাদ ছিল কোনো পদার্থকে ভাগ করতে করতে যদি এমন সূক্ষ্ম কণায় পৌছানো যায়, তাকে ভাগ করলে ঐ পদার্থের অস্তিত্ব নষ্ট হয়, স্বাধীন অস্তিত্ব আর থাকে না; এ অবস্থায় পদার্থের এ ক্ষুদ্র কণাকে অণু বলে। ডাল্টনের এ ধারণা থেকে পরমাণু গঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

বিগত শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত বিতর্কের অবসান হয়নি। এর মধ্যে একটি ভৌত স্বাক্ষর উপস্থিত করেছিলেন আইনস্টাইন। বিশিষ্ট আপেক্ষবাদ (Special theory of Relativity) প্রকাশের (১৯০৫) আগে তিনি দেখিয়েছিলেন ব্রাউনীয় গতিকে একটি তরল পদার্থের অণুগুলোর সঙ্গে ধুলিকণার সংঘর্ষ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি তরল পদার্থে ভালোমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধলিকণার এলোমেলো এবং অনিয়মিত গতিকে বলা হয় ব্রাউনীয় গতি।

পদার্থের গঠনে পরমাণু তত্ত্ব এ সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করে। অন্যসব মতামত বাতিল হয়ে যায়। আপাতত জানা গেল সকল পদার্থ গঠনের মূলে রয়েছে পরমাণু যা আর ভাগ করা যায় না। তবে সকল পদার্থই একই ধরণের পরমাণু দ্বারা গঠিত নয়। কোনো কোনো পদার্থ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের একাধিক পরমাণু দ্বারা গঠিত, যা যৌগিক পদার্থ বলে পরিচিত। রসায়ন শাস্ত্রের (Chemistry) বিকাশে যৌগ গঠনের সূত্রসমূহের বিস্তার এভাবে লাভ করেছে। পদার্থের স্বীয় বৈশিষ্ট্যের গঠনের মৌলিকতায় বর্তমান পর্যন্ত ১০৮টি (কারো মতে ১১৪টি) পদার্থকে মৌলিক পদার্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের পরমাণু সংখ্যাভিত্তিক প্রোটন দ্বারা গঠিত। যেমন হাইড্রোজেন ১টি, হিলিয়াম ২টি, কার্বণ ৬টি, অক্সিজেন ৮টি প্রোটনে গঠিত। মৌল পদার্থের গঠনে পরমাণু জানা গেলেও পরমাণু বিভাজ্য কিনা সে প্রশ্ন থেকেই গেল। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো জেজে থমসন পরমাণুতে পদার্থ কণার অস্তিত্ব প্রদর্শন করেন। এই কণার ভর পরমাণুর ভরের এক সহস্রাংশের চেয়েও কম। আমরা এখন যাকে ইলেকট্রন বলে জানি এটি সেই কণা। ইলেকট্রনগুলোর আধান (Charge) অপরা (Negative)। ১৯১১ সালে বৃটিশ পদার্থবিদ আর্নেস্ট রাদারফোর্ড পরমাণুগুলোর একটা কেন্দ্রিক আছে, বিষয়টি দেখাতে সমর্থ হন। পরমাণুগুলোও অভ্যন্তরীণ গঠনভুক্ত। পরমাণুর গঠনে রয়েছে পরাআধানসম্পন্ন একটি কেন্দ্রক (nucleus)। তার চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে কতগুলো ইলেকট্রন। প্রথমে ভাবা হয়েছিল কেন্দ্রক কতগুলো অপরা আধানের ইলেকট্রন এবং পরাআধানের কণিকা দ্বারা গঠিত। রাদারফোর্ড পরা আধানের (positive charge) কণিকার নাম দেন প্রোটন (প্রোটন শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ প্রাটম থেকে যার অর্থ প্রথম)। তখন ধারণা করা হয়েছিল পদার্থ গঠনের মূল উপাদান প্রোটন। প্রোটনই পদার্থ গঠনের নিয়ামক শক্তি। কিন্তু ১৯৩২ সালে কেম্ব্রিজে রাদারফোর্ড এর সহকর্মী জেমস স্যাডউইক কেন্দ্রকে আরো একটি কণার সন্ধান দেন যার নাম নিউট্রন। এ আবিষ্কারের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন কণা আবিষ্কারের পর ধারণা করা হয়েছিল এগুলোই পদার্থের মৌল কণা। কিন্তু কোনো কোনো পরীক্ষায় প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের সংঘর্ষ ঘটানো হয়। আবার দ্রুতগামী ইলেকট্রনের সাথে ইলেকট্রনের সংঘর্ষ ঘটানো হয়। ১৯৫০ এর

www.pathagar.com

দশকের প্রথম ভাগে নির্দেশ পাওয়া যায় আসলে ইলেকট্রন, নিউট্রন ও ক্ষুদ্র কণার সৃষ্টি। ক্যালটেক পদার্থবিদ স্যার গেলম্যান কণাগুলোর নাম দেন কোয়ার্ক (Quark) জেমস জয়ের একটি খেয়ালী কবিতা There Quark for Master Mark কবিতার নাম কার্ক রাখা হয়। কার্ক আবিষ্কারক স্যার গেলম্যান ১৯৬৯ এ নোবেল পুরস্কার পান।

কার্কগুলোর আকার দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে অনেক ছোট। ফলে তা দেখার সুযোগ নেই। এগুলিকে ছয়টি সারণীতে গাঁথা হয়েছে যথা—অজানা (Strange), নিচু (down), মোহিত (Charmed), সবার নিচে (bottom), সবার উপরে (top) প্রতিটির রয়েছে তিনটি রঙ যথা লাল, সবুজ, নীল। এই শব্দগুলো শুধুমাত্র নাম। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের নতুন কণিকা এবং পরিঘটনার নামকরণে অনেক বেশি কল্পনাশক্তির অধিকারী। তারা এ সত্য আবিষ্কার করেছেন যে প্রতিটি প্রোটন এবং নিউট্রন তিনটি কার্ক দ্বারা গঠিত। এগুলোর প্রতিটির আছে এক একটি রঙ। প্রতিটি প্রোটনে রয়েছে দুটি উঁচু কার্ক এবং একটি নিচু কার্ক। নিউট্রনে রয়েছে দুটি নিচু কার্ক এবং একটি উঁচু কার্ক। অন্য কার্ক যেমন—অজানা, মোহিত, সবার ওপরে কার্ক পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সেগুলোর ভর অনেক বেশি হওয়ায় তাদের দ্রুত অবক্ষয় ঘটে এবং প্রোটন ও নিউট্রনে পরিণত হয়। কার্কই যাবতীয় পদার্থের গাঠনিক সুসামঞ্জস্যতা রক্ষা করে। স্বতস্ফূর্তভাবে আবার দৃষ্টির অগোচরে ভেঙে যায়। অতিপারমাণবিক কণিকার স্বতস্ফূর্ত ও সুষমভাবে ভেঙে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে একটি মডেল ২০০৮ সালে আবিষ্কার করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী ইউজিরো নাম্বু। আর কণিকার সুসমভাবে ভেঙে যাওয়ার কারণ হিসেবে তিন ধরণের কার্কের অস্তিত্বের ধারণা দেন জাপানি বিজ্ঞানী তাকোতা কোরাইশী ও তোশিহীদে মাসকাওয়া। এ আবিষ্কারে ২০০৮ সালে ভাগাভাগি অংশে তাদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রথমে এ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হল যে পদার্থ গঠনের মূলে আছে পরমাণু। এরপর জানা গেল পরমাণুই আদি সূত্র নয়। পরমাণুর গঠনে রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। অতিউচ্চ শক্তিতে সেগুলো ভেঙে পাওয়া গেল কার্ক অর্থাৎ সব কণাই অতিউচ্চ শক্তির বৃদ্ধিতে তা ভাঙা যায়। তাহলে প্রশ্ন থেকেই যায় সত্যিকারের মৌলকণা কী? যা দিয়ে পদার্থ তথা জগৎ সৃষ্টি হল? এ বিষয়ে হকিং এর কথা—

> And so, we know that particles that were thought to be 'Elementary' twenty years ago are intact made up of smaller particles. May these we go to still higher energies, in turn be found to be made still smaller particles? This certainly possible, but we do have, of are very near to a knowledge of the ultimate building blocks of nature. —(Brief History Page-70)

www.pathagar.com

[কুড়ি বছর আগে যেগুলোকে মৌলকণা ভাবা হত সেগুলোও ক্ষুদ্রতর কণা দ্বারা গঠিত। আমরা যদি উচ্চতর শক্তিতে পৌঁছাই তাহলে কী দেখা যাবে? এ কণাগুলো আরো ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা গঠিত? এটা নিশ্চিত সম্ভব। কিন্তু আমাদের সত্য সত্যই এমন কিছু তাত্ত্বিক যুক্তি রয়েছে, যার দরুন আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে প্রকৃতির গঠনের শেষ মৌলকণা আমরা জেনেছি, কিম্বা জানার অত্যন্ত কাছকাছি এসে পড়েছি]

এ পর্যায়ে জানা কণিকাগুলোর আচরণ, বিচরণ, শক্তি প্রবাহ এবং জগৎ গঠনে সচেষ্ট বিজ্ঞান যে মডেল প্রস্তুত করেছে সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করব। পদার্থ গঠনে কণিকা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করলেও আলোকের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। আলোক প্রবাহ তরঙ্গ হিসেবেই ভেবে আসা হচ্ছিল। ম্যাক্সপ্লাঙ্কের আলোকের কোয়ান্টাম প্রবাহ অনুসারে আলোককে কণা (ফোটন) হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। আলোক এবং কণা দ্বিত্ববাদে ব্যবহার্য।

আলোক কণা বা পদার্থ কণা যাই বলা হোক সকল কণিকার বিশেষ ধর্ম হল চক্রণ (Spin)। কণিকার চক্রণ বলতে যা বোঝায় বিভিন্ন অভিমুখ থেকে কী রকম দেখায়। একটি কণিকার চক্রণ যদি '০' হয় তাহলে সেটা সবদিক থেকে বিন্দুর মতো দেখাবে। চক্রণ ১ হলে সেটা দেখাবে তীরের মত। যে সব কণিকার চক্রণ ২ সেটা দ্বিমুখী তীরের মতো দেখাবে। আবার এমন কিছু কণা আছে যার চক্রণ ½ বা অর্ধেক। এই মৌলকণাগুলো একটি আবর্তনে এক রকম দেখায় না, তাদের দুটি আবর্তনে এক রকম দেখায়। চক্রণধর্মে কণিকাকে 0, 1, 2 ও ½ বিভক্ত। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ অর্ধচক্রণ ½ বিশিষ্ট কণা দ্বার গঠিত। উল্লেখ্য গাঠনিক ক্রিয়ায় কাজ করে বলবাহী কণিকা। এগুলো হল 0, 1, 2 চক্রণ বিশিষ্ট কণিকা। এগুলো পদার্থ গঠনে অর্ধচক্রণ বিশিষ্ট কণিকাকে অন্তর্বর্তী বল প্রদান করে। তবে পদার্থ গঠনের ক্ষেত্রে কণাগুলো পাউলীর অপবর্জন নীতি (Exclusion principle) মেনে চলে। অপবর্জন নীতির সাধারণ অর্থ হল দুটি সমরূপ কণা একই অবস্থায় থাকতে পারে। চক্রন বিশিষ্ট কণিকাকে আবার দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়েছে যথা ফারমিয়নস (Farmions) এবং বোসন (Boson)। ফারমিয়নস এসেছে আঁদ্রে ফারমিয়নের নাম অনুসারে এবং বোসন এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম অনুসারে (এ বিষয়ে এ গন্থে হিগস-বোসন—ঈশ্বর কণা বিতর্ক অধ্যায়ে বিস্তারিত জানা যাবে)। ফারমিয়নস গোষ্ঠীর কণিকাকে বলা হয় পদার্থিক কণিকা (Matter particle)। এ গোষ্ঠীর কণিকা ভর বহন করে। অর্ধ চক্রণ বিশিষ্ট কণিকা ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, W^+, W^-, Z^0 কণিকা এ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে বোসন গোষ্ঠীর কণিকাকে বলা হয় বোসন। এরা কল্পিত কণিকা (Virtual Particles)। এ গোষ্ঠীর কণিকা ভর বহন করে না। এরা ফারমিয়ন কণিকা গোষ্ঠীর

www.pathagar.com

বলের যোগান দেয়। 0, 1 ও 2 চক্রণ বিশিষ্ট কণিকা বা ফোটন, গ্রাভিটন, গ্লুয়োন সদ্য আবিষ্কৃত হিগস-বোসন এ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কণিকা। অবশ্য চক্রণ 1 ও চক্রণ 2 বিশিষ্ট কণিকার প্রয়োগফল দৃষ্ট হলেও '০' চক্রণের কণিকার সন্ধান চলছে।

0, 1 এবং 2 চক্রণের বলবাহী কণার ধর্ম ½ চক্রণের পদার্থ সৃষ্ট কণায় বল প্রয়োগ করা। কারণ বলের ক্রীয়া ব্যাতীত কোনো কিছুই ঘটা সম্ভব নয়। বলের সাধারণ ধর্ম টেনে রাখা। কিন্তু বলবাহী কণার প্রভাব পদার্থ গঠনে অর্ধচক্রণের কণার ওপর প্রভাব ফেলবে এবং পদার্থ কণাকে সংকুচিত করবে। সে ক্ষেত্রে পৃথিবী কেন চুপসে যাচ্ছে না তার কারণ ব্যাখ্যা দিচ্ছে অপবর্জন নীতি। ১৯২৫ সালে অস্ট্রীয় পদার্থবিদ উলফগ্যাং পাউলি (Wolfgang pouly) অপবর্জন নীতি আবিষ্কার করেন। আমরা অনিশ্চয়তাবাদে জেনেছি অনুমোদিত সীমার মধ্যে দুটি কণার একই অবস্থান এবং গতি থাকতে পারে না। পাউলি দেখান পদার্থ কণাগুলো খুবই নিকটবর্তী হলে তাদের গতিবেগে পার্থক্য থাকবেই। এর অর্থ কণাগুলো একই অবস্থায় থাকবে না। পৃথিবী যদি অপবর্জন নীতি ছাড়া সৃষ্টি হত, তাহলে কার্যগুলো সুসংগঠিত পরমাণু সৃষ্টি করতে পারত না। তারা চুপসে মোটামুটি ঘন ও তরল স্যুপ (তরকারীর সুরুয়ার মত) তৈরি করত।

ইলেকট্রন পদার্থ কণিকা। এর চক্রণ ½ অর্ধেক। বিষয়টি ১৯২৮ সালের পূর্বে ভালোভাবে বোঝা যায়নি। এ বছর পল ডিরাক (কেম্ব্রিজের গণিতশাস্ত্রের লুকেশিয়ান প্রফেসর। যে পদে বর্তমান হকিং অধিষ্ঠিত আছেন) একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। ইলেকট্রনের কেন অর্ধচক্রণ রয়েছে বা এক আবর্তনে কেন একই রকম দেখায় না, কিন্তু দুটি আবর্তনে একই রকম দেখায়? ডিরাক গাণিতিকভাবে এর ব্যাখ্যা দেন। তিনি এর কারণ ব্যাখ্যায় বলেন, ইলেক্ট্রনের নিশ্চয়ই একটা জুড়ি থাকবে অথবা থাকবে একটি বিপরীত ইলেকট্রন (Anti Electron)। ইলেকট্রনের জুড়ি হিসেবে ১৯৩২ সালে পজিট্রন (বিপরীত ইলেকট্রন) আবিষ্কৃত হয়। এ আবিষ্কারে ১৯৩৩ সালে ডিরাক নোবেল পুরস্কার পান। মূলত প্রতিটি কণিকার আছে বিপরীত কণিকা (Particle and Anti Particle)। বিপরীত কণিকার সাথে কণিকাটি ঘর্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হতে পারে। বিষয়টি কেবল পদার্থবাহী অর্ধেক চক্রণ বিশিষ্ট কণিকার ক্ষেত্রে (যেমন ইলেকট্রন) প্রযোজ্য। কিন্তু ভরহীন কণিকার ক্ষেত্রে নয়। পদার্থবাহী কণিকা দ্বারা আমাদের জগত সৃষ্টি। হকিং এর অভিমত বিপরীত কণিকার দ্বারা সৃষ্ট বিপরীত পৃথিবী ও মানুষ থাকতে পারে। তিনি হেয়ালীতে বলেছেন, তেমন মানুষের সাথে করমর্দন করবেন না। করলে বিরাট এক আলোর ঝলকে মিলিয়ে যাবেন।

পদার্থিক বলবাহী কণার (½ চক্রণ) বল বা শক্তি বহন করে 0, 1, 2 চক্রণধর্মী কণা। ইলেকট্রন বা কার্কের মতো একটি পদার্থ কণিকা একটি বলবাহী কণিকা

www.pathagar.com

নিক্ষেপ করে। এই নিক্ষেপে (emission) যে প্রত্যাগতি (recoil) হয়, তাতে পদার্থ কণিকাটির গতিবেগের পরিবর্তন হয়। বলবাহী কণিকাটির সঙ্গে তখন অন্য একটি পদার্থ কণিকার সংঘর্ষ হয়। এর ফলে বলবাহী কণিকাটি বিশেষিত (absorbed) হয়। এই সংঘর্ষের ফলে দ্বিতীয় কণিকাটির গতিবেগের পরিবর্তন হয়। মনে হয় যেন দুটি পদার্থ কণিকার ভিতরে একটি অন্তর্বর্তী বল ছিল।

অর্ধচক্রণ বিশিষ্ট পদার্থ কণার বল বহন করে 0, 1, 2 চক্রণবিশিষ্ট কণা। এই কণাগুলোর আবার বিশেষ ধর্ম হল এরা অপবর্জন নীতি মানে না। এর অর্থ কতগুলো কণিকার বিনিময় হবে তার সংখ্যার সীমা নেই। ফলে তা থেকে একটি শক্তিশালী বল উৎপন্ন হতে পারে। কণিকাগুলো অন্তর্বর্তী যে বলবাহী কণিকাগুলোর বিনিময় হয় সেগুলো ভরহীন কল্পিত (Vertual) কণিকা। কারণ কণিকা অভিজ্ঞাপক যন্ত্রে বাস্তব কণার মতো প্রত্যক্ষভাবে তাদের সনাক্ত করা যায় না। তবে তাদের অস্তিত্ব জানা যায়। তারা কণাগুলোর অন্তর্বর্তী বল সৃষ্টি করে।

এ আলোচনার সারসংক্ষেপ হল চক্রনির্ভরতায় কণা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত যথা পদার্থ কণিকাও বলবাহী কণিকা। পদার্থবাহী কণিকার চক্রণ অর্ধেক ½। বলবাহী কণিকার চক্রণ পূর্ণ সংখ্যা (0, 1, 2)। পদার্থবাদী কণিকা ভরযুক্ত বাস্তব কণিকা। বলবাহী কণিকা ভরমুক্ত কল্পিত কণিকা। যদিও তারা কল্পিত কিন্তু বাস্তব কণায় বাস্ত ব জগৎ গঠনে যে বলের প্রয়োজন, সে বল প্রদান করে কল্পিত কণা। বাস্তব কণার মতোই কাজ করে। বলবাহী কণিকার শক্তি এবং যে সমস্ত কণিকার সঙ্গে তাদের প্রতিক্রিয়া হয় সে অনুসারে বলবাহী কণিকাগুলোকে চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হল (১) মহাকর্ষীয় বল (gravitation force) (২) বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল (Eloctromagnetic force) (৩) দুর্বল বল (weak force) (৪) সবল বল (Strong force)। অবস্থাভেদে বলগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হলেও পদার্থবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য তাকে এক বলে রূপান্তর করা। পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ বলে আপেলটিকে বা ওপরের জিনিস নিচে টেনে নামায়। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলে বাতি জ্বলে। দুর্বল বলের প্রভাবে তেজষ্ক্রিয়তায় পদার্থ ক্ষয়ে যায়, সকল বলের প্রভাবে আণবিক শক্তি সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সূত্র। বিজ্ঞানের লক্ষ্য সকল বলকে একীভূত বলে তথা একটি সূত্রে বা তত্ত্বে প্রকাশ করা। যদিও বিষয়টি বিজ্ঞানের, আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে তা একটি বলের লীলার দিকে।

প্রথম শ্রেণির বল হল মহাকর্ষীয় বল। প্রতিটি বস্তুই তার মহাকর্ষীয় বল বিস্তার করে। তবে অতিনিকটে তা বোঝা যায় না। সূর্য এবং পৃথিবীর মতো ভারী বস্তু তার মহাকর্ষীয় বলের ক্ষেত্র (gravitation field) তৈরি করে। এ বল এত ক্ষীণ যে এর দুটি ধর্ম না থাকলে তা বোঝাই যেত না। ধর্ম দুটি হল বহু দূরত্বে তা বোঝা

www.pathagar.com

যায় এবং এই বল সব সময়ই আকর্ষণ করে। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে দুটি পদার্থ কণার অন্তর্বর্তী বল বহন করে গ্রাভিটন নামক দুই চক্রণবিশিষ্ট একটি কণিকা। এই কণিকার নিজস্ব কোনো ভর নেই। এ কারণে দূরপাল্লায় এ বল বাহিত হয়। এর কণিকাগুলো যদিও কল্পিত তবুও নিশ্চিতভাবে একটি মাপনযোগ্য ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তারা পৃথিবীকে সূর্য প্রদক্ষিণ করায়। মহাকর্ষীয় তরঙ্গগুলো খুবই দুর্বল। মহাকর্ষ কণিকা গ্রাভিটন কখনোই পর্যবেক্ষণ করা যায়নি। এই কল্পিত কণিকার কোনো আধান বা চার্জ নেই। মহাকর্ষীয় বল ব্যতীত অন্য একটি বল পরমাণু অন্তর ক্ষুদ্রকণায় বলের ব্যাখ্যা দেয় যা দ্বিতীয় শ্রেণীর বল। এর মধ্যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল (Electromagnetic) দুটি ইলেকট্রনের অন্তর্বর্তী বল। এই বলের শক্তি মহাকর্ষীয় শক্তির চেয়ে মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন (একের পৃষ্ঠে ত্রিশটি শূন্য) গুণ শক্তিশালী। বৈদ্যুতিক আধান দুরকমের যথা পরা (Positive) ও অপরা (Negative)। দুটি পরাআধানের অন্তর্বর্তী বল বিকর্ষণকারী। আবার দুটি অপরা আধানের অন্তর্বর্তী বলও বিকর্ষণকারী। কিন্তু একটি পরা ও অপরা আধানের অন্তর্বর্তী বল আকর্ষণকারী। সূর্য কিম্বা পৃথিবীর মতো বৃহৎ বস্তুপিণ্ডে প্রায় সমসংখ্যক পরা এবং অপরাআধান রয়েছে। ফলে উভয়ে বাতিল করলে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় অবশিষ্ট সামান্য। কিন্তু অণু বা পরমাণুর মতো ক্ষুদ্র পরিসরে এ বলের প্রাধান্য থাকে বেশি। ইলেক্ট্রন অপরাআধান বিশিষ্ট। কিন্তু পরাআধান বিশিষ্ট কেন্দ্রকের আকর্ষণ বল ইলেকট্রনকে কেন্দ্রকের (nuclear) চারিদিকে ঘোরায়। পরমাণুর গঠনক্রিয়ায় দেখা যায় ইলেকট্রন কেন্দ্রকের চারিদিকে ঘোরে, যেমন সূর্যের মহাকর্ষ বল পৃথিবীকে তার চারপাশে ঘোরায়। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আকর্ষণকে মনে করা হয় ফোটন (আলোক কণিকা) নামক ভরহীন কল্পিত (Virtual) এক চক্রণধর্মী বহু সংখ্যক বিনিময়ের ফল। তৃতীয় শ্রেণির বল হল দুর্বল পারমাণবিক বল (Weak nuclear force)। এ বল পরমাণুর কেন্দ্রকীয় বল যা অতিধীরে কাজ করে। তেজস্ক্রিয়তার (radiation) কারণ এই বল। এই বলের কারণে পদার্থের ধীর গতিতে তেজস্ক্রিয়তা ঘটায়। মূলত অর্ধচক্রণবিশিষ্ট সমস্ত পদার্থের ওপর এই বল কাজ করে, তবে ফোটন কিম্বা গ্রাভিটনের মতো 0, 1, 2 চক্রণধর্মী কণিকার ওপর ক্রিয়া করে না। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দুর্বল কেন্দ্রকীয় বলকে ভালো ভাবে বোঝা যায়নি। এ সময় লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের আব্দুস সালাম (পাকিস্তান) এবং হাভার্ডের উইনবার্গ এ বলের সন্ধান দেন। তাঁরা কয়েকটি তত্ত্বে প্রমাণ করেন ফোটন ছাড়া আরো তিনটি একচক্রণধর্মী কণিকার অস্তিত্ব আছে যা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলে কাজ করে। তিনটির একত্রে এর নাম ভেক্টর বোসনস (উল্লেখ্য বোসন কণা আবিষ্কার করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বসুর নামানুসারে কণার নাম বোসন)। ভেক্টর বোসন দুর্বল বল বহন করে। এগুলোর

www.pathagar.com

নাম W^+, W^- এবং Z^0। এর প্রতিটির ভর ১০০ গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট (সংক্ষেপে gev)। উচ্চশক্তিতে এ সমস্ত কণিকা একই রূপে থাকলেও নিম্নশক্তিতে তারা ভিন্ন। এই কণিকা স্বতস্ফূর্ত প্রতিসাম্য ভেঙে দেয়। মূলত সালাম ও উইনবার্গ এ বলকে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলে একীভূত করেন। আর এর ১০০ বছর পূর্বে ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ ও চুম্বকীয় বলকে এক বলে একীভূত (Unified) করেছিলেন। সালাম ও উইনবার্গের প্রচেষ্টায় দুর্বল বলকে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলে একীভূত করায় এর নাম হয় ইলেকট্রো উইক ফোর্স (Electro Weak force)। এ আবিষ্কারে সালাম ও উইনবার্গ ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কার পান। চতুর্থ শ্রেণির বল হল শক্তিশালী কেন্দ্রকীয় বল (strong nuclear force)। সহজ কথায় এটি নিউক্লিয়াসের শক্তি। এছাড়া এই বল একত্রে ধরে রাখে পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রোটন ও নিউট্রনকে। গ্লুয়োন (Gluon) নামক এক চক্রণ বিশিষ্ট কণিকা এই বল প্রয়োগ করে বলে বিশ্বাস করা হয়। এই বল পরস্পর ক্রিয়া করে নিজের সঙ্গে এবং কার্কের সঙ্গে। কণিকা ত্বরণ যন্ত্রের সাহায্যে এই বল উচ্চশক্তি সম্পন্ন আণবিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে দৃশ্যমান জগৎ গঠনের মূলে অদৃশ্যমান পরমাণু। সে পরমাণু আবার আরো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণা দ্বারা গঠিত। সে সব কণার বলে আবার পরমাণুর গঠন ও শক্তির বিকাশ। সে শক্তি বা ওজন ভরে আমাদের পদার্থিক জগৎ। তাহলে জগতের মূলে কাজ করে বল। বিজ্ঞান তাকে চারভাগে ব্যাখ্যা করে। তবে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য চার বলকে এক বলে রূপান্তর করা। এ বিষয়ে বিজ্ঞান আশাবাদী। কারণ ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ ও চুম্বকীয় বলকে একীভূত করেছেন। এরপর সালাম ও উইনবার্গ দুর্বল বলকে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় অধিভুক্ত করেন। এখন বল তিনটি যথা মহাকর্ষ বল, ইলেক্ট্রেউইক বল, এবং সবল বল।

বলের এরূপ ঐক্যবদ্ধতার প্রয়াসে বিজ্ঞানীরা সকল বলকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি বল তথা একটি কণার সন্ধানে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে এই কণাকে হিগস বোসন বা ঈশ্বরকণা হিসেবে (গ্রন্থের শেষে ঈশ্বরকণা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে) আখ্যায়িত করেছেন। যদি ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল এবং দুর্বল বলের ঐক্য সাধনের সফলতায় শক্তিশালী সবল বলকে একীভূত করার জন্যে 'মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব' (Grand Unified Theory) সংক্ষেপে GUT) প্রচেষ্টা হয়েছে। হকিং মনে করেন তা কেবল ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এছাড়া তা মহান কিছু নয় কারণ 'মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বে' মহান মহাকর্ষ বল অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এছাড়া মহান ঐক্যবদ্ধ শক্তি (Grand Unified Energy) প্রস্তাব করা হয়েছে। এই তত্ত্বে তিনটি শক্তিরই একীভূত রূপদান করা যাবে। হকিং সে বিষয়ে বলেন তেমন শক্তি পরীক্ষায় কণিকাগুলোর ত্বরণ ঘটানোর মতো শক্তিশালী যন্ত্রের আয়তন হতে হবে সৌরজগতের মতো বিরাট। সুতরাং তা পরীক্ষা করা অসম্ভব।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় প্রোটনের অবক্ষয়ের (Decay) বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে একীভূত বলের প্রত্যাশা থাকতে পারে। সাধারণ পদার্থের ভরের অনেকটাই প্রোটন দিয়ে তৈরি। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রোটনগুলোর স্বতস্ফূর্ত অবক্ষয়ে এ্যন্টি ইলেকট্রনের মতো হালকা কণিকায় পরিণত হতে পারে। এ রকম একটি বিষয় ভাবার কারণ কার্ক এবং এ্যান্টিইলেকট্রনের সংখ্যা মূলগত কোনো পার্থক্য থাকে না। বিষয়টি এমন হলে প্রোটন শক্তি হারাবে এবং তা ইলেকট্রউইক বলে একীভূত হয়ে গ্রান্ড ইউনিফায়েড তথা গ্রান্ড ইউনিফিকেশন এনার্জিতে (মহান ঐক্য সৃষ্টিকারী শক্তি) পরিণত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি প্রোটন ক্ষয় দেখতে মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন (একের পৃষ্ঠে ত্রিশটি শূন্য) বছর অপেক্ষা করতে হবে।

যে পদার্থিক জগতকে আমরা দেখি এ পদার্থের বেশির ভাগের গঠন প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে। সেগুলো আবার তৈরি কার্ক দিয়ে। তাহলে সৃষ্টির আদিম স্তরের কণা ও প্রতিকণা এবং কার্ক বিপরীত আচরণ কেমন? এখন যা আছে তা বিপরীত কার্কের বদলে কার্ক। শুরুতেই যদি কার্কের বদলে বিপরীত কার্ক বেশি থাকত তাহলে বিশ্বটাও হত বিপরীত। সে অবস্থায় আমাদের দৈহিক গঠন থেকে শুরু করে সব কিছুই উল্টো বিধিতে চলত। এখন যেমন খাদ্য গ্রহণ করি তাই বাঁচি, তেমন পৃথিবীতে হত এর বিপরীত। তবে এখন পর্যন্ত এমন বিশ্বের সন্ধান পাওয়া যায়নি। আমাদের বিশ্বটাই কার্ক তথা প্রোটন গঠনের ক্রিয়ার ফলাফল। তবে আদিম অবস্থায় বিশ্ব যখন খুবই উত্তপ্ত ছিল তখন বিপরীত কার্ক গঠনের সুযোগ ছিল। তা সত্ত্বেও বিপরীত কার্ক শূন্য। যা আছে তা কার্ক। এর কারণ কী? এর উত্তর দিয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের বিধিগুলো।

পদার্থবিজ্ঞানের কণিকাতত্ত্বে কণিকাগুলো তিনটি বিধি বা প্রতিসাম্য মেনে বলে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এ বিশ্বাস ছিল। ধারণা করা হত সকল কণিকার আচরণ তিনটি প্রতিসাম্যে অভিন্ন। বিধিগুলো হল— CP এবং TIC প্রতিসাম্য হল বিধিগুলো কণিকা ও বিপরীত কার্কের ক্ষেত্রে অভিন্ন। প্রতিসাম্য P এর অর্থ বিধিগুলো যে কোনো পরিস্থিতি এবং তার দর্পণ বিম্বের ক্ষেত্রে অভিন্ন হবে (দক্ষিণ থেকে ঘূর্ণায়মান একটি কণিকার দর্পণ প্রতিবিম্ব হবে বামদিকে ঘূর্ণায়মান প্রতিবিম্ব)। প্রতিসাম্য T এর অর্থ সমস্ত কণিকা এবং বিপরীত কণিকার গতি যদি বিপরীতমুখী করা হয় তাহলে পদার্থটি অতীত কালে যেমন ছিল সে অবস্থায় ফিরে যাবে। এর অর্থ বিধিগুলো কালের সম্মুখ অভিমুখে এবং পশ্চাত অভিমুখে একই হবে।

কণিকা বিশ্লেষণে মহাবিশ্বের গঠন কাঠামোয় এ বিধিগুলো সরলতর ভাবা হয়েছে। কারণ বিধিগুলো অন্যরকম হলে বিশ্ব এভাবে বিকশিত হত না। কিন্তু ১৯৫৬ সালে আমেরিকান পদার্থবিদ সুংদাওলী (Tiung-Dao-lee) এবং চেন নিং ইয়াং (Chen-Ning Yeng) প্রস্তাবনা করেন যে আসলে দুর্বল বল প্রতিসাম্য P মানে না।

www.pathagar.com

অর্থাৎ দুর্বল বল দর্পণ প্রতিবিম্বে অভিন্ন নয় তা ভিন্ন। সে বছরই চেন-শিউং-D (Chien-Sheung-Uou) একজন মহিল সহকর্মী তা প্রমাণ করেন। পরের বছর লি এবং ইংয়াং এ চিন্তাধারার জন্য নোবেল পুরস্কার পান। দুর্বল বল প্রতিসাম্য চ না মানার অর্থ বিশ্ব যে ভাবে বিকশিত হয়েছে তা অন্যভাবে বিকশিত হওয়ার কথা। আবার এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে দুর্বল বল প্রতিসাম্য C মেনে চলে না। যার অর্থ কণিকাগুলো বিপরীত কণিকার ক্ষেত্রে অভিন্ন নয়, তা ভিন্ন। এর অর্থ বিপরীত কণিকা দিয়ে গঠিত বিশ্বের আচরণ আমাদের বিশ্ব থেকে পৃথক হবে। তবুও মনে করা হয়েছিল দুর্বল বল CP এর যুক্ত প্রতিসাম্য মেনে চলে। কিন্তু ১৯৬৪ সালে জে-ডব্লিউ ক্রোনেন (J. W cronin) এবং ভ্যাল ফিস (Val Fitch) আবিষ্কার করেন কয়েটি কণিকা তাদের অবক্ষয়ের সময় CP প্রতিসাম্য মেনে চলে না। এগুলোর নাম কে-মেসন (K-Meson)। এ আবিষ্কারে আমেরিকান পদার্থবিদ ক্রোনিন এবং ফিস নোবেল পুরস্কার পান।

একটি গাণিতিক সত্য যে কণাবাদী বলবিজ্ঞান এবং আইনস্টাইনের অপেক্ষবাদ তত্ত্ব আবশ্যিকভাবে CPI বিধি মেনে চলেতে জানে। অর্থাৎ কণিকাগুলোর মূলে যদি বিপরীত কণিকা প্রতিস্থাপন করা যায় এবং তার দর্পণ প্রতিবিম্ব নেওয়া হয় আর কালের অভিমুখ বিপরীতগামী করা হয় তাহলেও মহাবিশ্বের আচরণ একই রকম থাকবে। ক্রোনিন ও ফিসের গবেষণায় দেখা যায় কণিকার স্থানে বিপরীত কণিকা স্থাপন এবং যদি দর্পণ প্রতিবিম্বের রূপ গ্রহণ করে তাহলেই আচরণ একই রকম হবে। কিন্তু সময়ের মুখ বিপরীত করলে আচরণ একই রূপ হবে না। এর অর্থ তারা প্রতিসাম্য T মানে না। এ বিষয়ে হকিং এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

হকিং বলেন সময়ের মুখ সম্মুখে অগ্রগামী। আমাদের সাধারণ বোধ এমন যে সময়কে পশ্চাতে ফেলে আমরা সম্মুখে অগ্রগামী হচ্ছি। সময়ের মুখ বিপরীত করলে অতীতে ফিরে যেতে হয়। মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল বিধায় সময় অগ্রগামী হয়। কিন্তু সময়ের মুখ বিপরীত হলে মহাবিশ্বের সংকোচন দশা শুরু হবে। সেক্ষেত্রে মহাবিশ্বের শুরুর (Beginning) বিন্দুতে পৌছাতে হয়। হকিং বলেন আদিম বিশ্ব অবশ্যই প্রতিসাম্যম T মানে না কারণ আরম্ভই সেখানে শেষ বিন্দু। কণিকার পশ্চাৎ অনুসরণের স্থান নেই।

এ আলোচনায় আমরা যা বুঝি তা হলো বলগুলোকে একক বলে একীভূত করার সুযোগ আছে। বিজ্ঞানের অনুসন্ধান সেদিকে। এ গ্রন্থের শেষে পদার্থবিজ্ঞানকে ঐক্যবদ্ধ করা Unification of Physics অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তবে পরের অধ্যায়সমূহ 'কৃষ্ণগহ্বর' ও 'কৃষ্ণগহ্বর অত কালো নয়' দুটি অধ্যায়ে আপেক্ষিক ও কণাবাদী তত্ত্বের সম্মিলন আশা হকিং ব্যক্ত করেছেন।

www.pathagar.com

কৃষ্ণগহ্বর
Black Hole

সূর্য ও তার পরিবার গ্রহ, উপগ্রহের পরিচিত, আবর্তন, গতিপথ নিয়ে সৌরজগতের প্রতি এখন আর আমাদের কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। সৌরজগত এখন আমাদের পাঠ, পাঠ্য, বিশ্বাসের অঙ্গ, যদিও এ বিশ্বাস স্থাপন করতে আমাদের কেটে গেছে অনেক কাল। কেবল সৌরজগৎ (Solar system) নয়, দূর মহাকাশের ছায়াপথসহ অন্যান্য গ্যালাক্সি, তারকা, ধুমকেতু, কোয়াসার, উল্কাপিণ্ড, নোভা, সুপার-নোভাসহ মহাকাশমণ্ডলীয় বস্তুসমূহের (Celestial Body) জ্ঞান দিবালোকের মতো সত্য বলে মানি। সাম্প্রতিক কালে কৃষ্ণগহ্বর (Black-Hole) এর পরিচিতি ও এর অস্তিত্বের বিশ্বাসও দৃঢ়তর হয়েছে। কৃষ্ণগহ্বরও এখন আমাদের পাঠ পাঠ্য (উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজি প্রথম পত্রে Mysteries of the Universe Unit এ একটি ছোট নিবন্ধ Black-Hole পড়ানো হয়) এবং জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয় বিষয়। আমরা প্রতিনিয়ত পত্রিকার পাতায় এ বিষয়ে নিবন্ধ পাঠ করি, এমনকি কোনো বিষয় গুপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়শই বলে থাকি ওটা ব্ল্যাকহোলে চলে গেছে। আমরা একথা বলে বোঝাতে চাই তা চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। আর কখনো ফিরে আসবে না। মহাবিশ্বের স্থানের এমন একটি অঞ্চল যা দৃশ্যমান নয়। কিন্তু অদৃশ্যমান স্থানটির মহাকর্ষ বল এত শক্তিশালী যে এর কিনারায় পৌঁছালে কৃষ্ণগহ্বরের টানে নিপতিত হবে যেখান থেকে কখনো ফিরে আসা যাবে না। অন্তহীন কালে হারিয়ে যাবে। দ্রুতশীল আলোও এর কিনারা থেকে পালাতে পারে না। আলোক শূন্য হওয়ায় স্থানটি কেবলই কালো অন্ধকার গহ্বর। তবে এ আবিষ্কারটি সম্পূর্ণ করেছেন— স্টিফেন হকিং তার ধারণা, গাণিতিক হিসেব এবং পূর্বাপর পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব সমন্বয়ে। আবিষ্কারটি সম্পন্ন হয় ১৯৭২ সালে।

মূলত হকিং এর কৃষ্ণগহ্বরের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে মহাকর্ষ ভরের টানে বিরাট শূন্যতার কোনো অঞ্চল স্থান-কালের অসীম কুঞ্চন (Curvature) সৃষ্টি করে কি না? যদি ব্যাপারটি এমন হয় তাহলে কণাবাদী তত্ত্বও প্রয়োগ করা যাবে। ফলে এ গবেষণা আপেক্ষিক ও কণাবাদী তত্ত্বের মিলন প্রচেষ্টা বলা যায়।

কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল শব্দটির উৎপত্তি সাম্প্রতিক কালে ১৯৬৯ সালে। জন হুইলার নামে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। এর

www.pathagar.com

অনেক পূর্ব থেকে জানা ছিল আলোক কণা (ফোটন কণা) এবং তরঙ্গ দ্বিত্ববাদে স্বীকৃত। তবে মাহকর্ষ প্রভাবে আলোক কণায় কী অভিব্যক্তি ঘটবে এ বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না। প্রাথমিক অবস্থায় ধারণা করা হত আলোক কণিকাগুলোর দ্রুতি অসীম। অতএব মহাকর্ষ আলোকের দ্রুতি মন্থর করতে পারবে না। কিন্তু আলোকের গতি সীমিত (রোমার আবিষ্কার করেন) এ আবিষ্কারের পর ধারণা করা হত আলোকের গতির ওপর মহাকর্ষের প্রভাব থাকতে পারে। এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কেম্ব্রিজের অধ্যাপক জন মিশেল ১৮৮৩ সালে ফিলোসোফিক্যাল ট্রানজাকশান অফ দি রয়াল সোসাইটি লন্ডন পত্রিকায় একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এতে তিনি ব্যক্ত করেন একটি তারকার যদি যথেষ্ট ভর এবং ঘনত্ব থাকে তাহলে তার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র Gravitation field (তারকাটির যে স্থানের অঞ্চল পর্যন্ত মহাকর্ষীয় বল বিস্তার করে) এতটাই শক্তিশালী হবে যে আলোক সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না। বা নির্গত আলোক বেশি দূর যাওয়ার আগেই মহাকর্ষ আকর্ষণ তাকে পিছনে টেনে আনবে। এরূপ বহুসংখ্যক তারকা থাকতে পারে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন। সেগুলো থেকে আলো কোনোদিনই আমাদের নিকট পৌঁছাবে না এবং আমরা তাদের দেখতেও পাব না। তবে সেগুলোর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বোধগম্য হবে। এগুলোকেই আমরা এখন কৃষ্ণগহ্বর বলি। লক্ষ লক্ষ লক্ষ কোটি তারকার আলোয় মহাশূন্য আলোয় উদ্ভাসিত। কিন্তু মহাশূন্যের স্থানের এমন অন্ধকার অঞ্চলই কৃষ্ণগহ্বর।

জন মিশেলের পূর্বে লেমাইতার এবং পরে মার্কুইস লাপ্লাস এ বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু আলোকের ওপর মহাকর্ষের প্রভাব ১৯১৫ সালে আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদ তত্ত্ব ঘোষণার পূর্বে জানা যায়নি। কারণ সে তত্ত্ব জানায় আলোক সূর্য কিম্বা গুরুভার তারকার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কালে তা সূর্যের দিক বেঁকে যায় বলেই স্থান-কাল বাঁকা।

আসলে কৃষ্ণগহ্বরের সৃষ্টি এবং এর বিবরণ হকিং এর পূর্বে স্পষ্ট ভাবে জানা যায়নি। হকিং সমীকরণ ভিত্তিক যৌক্তিক তথ্য প্রমাণের দ্বারা তা স্পষ্ট করেছেন। প্রথমেই তিনি একটি তারকার জীবন মৃত্যুর (তারকার জীবনচক্র) বিবরণে অতিসরলতায় কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টির বিষয় তুলে ধরেছেন।

একটি তারকার সৃষ্টি হয় বৃহৎ পরিমাণ হাইড্রোজেনের (সাধারণ বায়ু) চাঁই থেকে। বৃহৎ অঞ্চল ভিত্তিক হাইড্রোজেন গ্যাসীয় অবস্থায় মহাকর্ষ টানে যখন নিজের ওপর চুপসে (collapse) যেতে থাকে তখনই তারকাটির জীবন গঠন শুরু হয়। তবে তারকাটি সুস্থির না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ ক্রিয়া চলমান থাকে। তারকাটি যখন চুপসে বা সংকুচিত হতে থাকে তখন হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোও নিকটতর হতে থাকে এবং ঘন হয়। ফলে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোর সংঘর্ষ দ্রুততর হতে থাকে। এর

www.pathagar.com

ফলে বাষ্পাকারে তা উত্তপ্ত হতে থাকে। শেস পর্যন্ত গ্যাসীয় হাইড্রোজেন এত উত্তপ্ত হয় যে হাইড্রোজেন পরমাণগুলো সংঘর্ষের পর দূরে ছিটকে না গিয়ে সংযুক্ত হয়ে হিলিয়ামে পরিণত হয়। তবে এই সংঘর্ষ প্রক্রিয়াটি প্রতিনিয়ত এবং তা একটি হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের মত। এর ফলে যে তাপ নির্গত হয় তা থেকেই তারকাটি আলো বিকিরণ করে। তাপে উত্তপ্ত হাইড্রোজেন বায়ু উর্দ্ধমুখী চাপ সৃষ্টি করে বেরিয়ে যেতে চায় কিন্তু তারকার অন্তঃস্থিত মহাকর্ষ আকর্ষণ তা ঠেকিয়ে রাখে। এভাবে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ এবং বায়ুর চাপ যখন সমান হয় তখন তারকাটি সুস্থিত হয় এবং দীর্ঘকাল হিলিয়াম বিকিরণে আলো দান করে। বিষয়টি সহজ উদাহরণে একটি ফোলানো বেলুনের মতো। বায়ুর চাপ বেলুনটিকে ফোলাতে চায় কিন্তু রাবারের চাপ একে সংকোচনের দিকে টানে। উভয় শক্তি সমান হলে ফোলানো অবস্থায় বেলুনটি স্থির হয়।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যে তারকার জ্বালানি যত বেশি সে তারকা দ্রুত জ্বালানি শেষ করে অন্তিম দশায় পৌঁছায়। এর কারণ বেশি জ্বালানির তারকাটির ভরও বেশি। ভর বেশি হওয়ায় এর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বলও বেশি। আকর্ষণ বেশি হওয়ায় মহাকর্ষ অধিক শক্তিতে তারকাটিকে সংকুচিত করতে চায়। সংকোচন ঠেকাতে তারকাটিকে আরো বেশি উত্তপ্ত হতে হয়। এর অর্থ তারকাটিকে বেশি বেশি জ্বালানি (হাইড্রোজেন) ব্যবহার করতে হয়। এ ধরণের তারকা অন্তিমে কৃষ্ণগহ্বর, শ্বেতবামন, নিউট্রন তারকায় পরিণত হয়। হকিং এর মন্তব্য আমাদের সূর্যের ৫০০ কোটি বছর বেঁচে থাকার মতো জ্বালানি রয়েছে। কিন্তু সূর্যের চেয়ে দ্বিগুণ, তিনগুণ ভরের তারকা মোটামুটি ১০ কোটি বছরের মধ্যে জ্বালানি শেষ করে ফেলে।

একটি তারকার জ্বালানি শেষ হলে তারকাটি শীতল হতে থাকে এবং ক্রমাগত এর সংকোচন ঘটে। সর্বশেষ তারকাটির অবস্থা কী হয় তা ১৯২৮ সালের পূর্বে জানা যায়নি। এ সময় ভারতীয় বিজ্ঞানী সুব্রমোনিয়াম চন্দ্রশেখর (Subrahmanyan Chandrashekhar) একটি গাণিতিক উপপাদ্য উপস্থাপন করেন। যা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সে সময়ে কেম্ব্রিজের স্যার আর্থার এডিংটন ছিল ব্যাপক অপেক্ষবাদ তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ। ভারতীয় গ্রাজুয়েট চন্দ্রশেখর স্যার এডিংটনের নিকট পড়বার জন্য জাহাজে ইংল্যান্ড রওয়ানা হন। কথিত আছে সে সময় মাত্র তিনজন আপেক্ষিক তত্ত্ব বুঝতেন। আইনস্টাইন নিজে স্যার এডিংটন এবং তার ছাত্র চন্দ্রশেখর। বিষয়টি যাহোক চন্দ্র শেখর জাহাজে যেতে যেতে একটি তারকার জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে মহাকর্ষের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে হলে তারকাটির ভর কত হতে হবে বা কত ভরে তারকাটি টিকে থাকবে তা আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসরণে অঙ্ক কষে বের করেন। চন্দ্র শেখর হিসেব কষে দেখিয়েছিলেন শীতল তারকার ভর

www.pathagar.com

আমাদের সূর্যের ভরের দেড়গুণের চেয়ে বেশি হলে সে নিজের মহাকর্ষ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। এই ভর এখন চন্দ্রশেখর সীমা (Chandrashekhor limit) নামে খ্যাত।

অধিক ভরের তারকা জ্বালানি শেষ হলে তারকাটির অবস্থা কী দাঁড়ায় তা চন্দ্রশেখর লিমিট থেকে জানা যায়। তারকাটির ভর যদি চন্দ্রশেখর লিমিট বা সূর্যের ভরের দেড়গুণের কম হয় তাহলে তারকাটি মহাকর্ষ টানে একবারে চুপসে না গিয়ে স্থিতি লাভ করতে পারে। এগুলোকে বলা শ্বেতবামন তারকা বা White dwarf। এগুলোর ব্যাসার্ধ হয় কয়েক হাজার মাইল। আর ঘনত্ব হয় প্রতি ইঞ্চিতে কয়েক শত টন। নিজ পদার্থের ভিতরকার ইলেকট্রনগুলোর পাউলির অপবর্জন তত্ত্বভিত্তিক (Pouli's Exclusion Principle) বিকর্ষণই একটি শ্বেতবামন তারকাকে রক্ষা করে। আমরা বহু সংখ্যাক এমন শ্বেতবামন তারকা পর্যবেক্ষণ করে থাকি। এর মধ্যে প্রথম যেটি পর্যবেক্ষণ করা হয় সেই শ্বেতবামন তারকাটি আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা (খালি চোখে দেখা) সাইরাসকে প্রদক্ষিণ করে। এটি অন্যান্য তারকা থেকে আয়তনে অনেক ছোট বিধায় একে বামন এবং স্থির সাদাটে আলো বিকিরণ করায় একে শ্বেতবামন বলা হয়। শ্বেতবামন চরিত্রের আর এক ধরণের তারকার নাম নিউট্রন তারকা। সাম্প্রতিক কালে এ ধরণের তারকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। রুশ বিজ্ঞানী লেভ ডেভিডোউল ল্যান্ডো এই তারকা আবিষ্কার করেন বলে একে ল্যান্ডো তারকাও বলা হয়। এই তারকাগুলোকেও রক্ষা করে অপবর্জন তত্ত্ব ভিত্তিক বিকর্ষণ। তবে শ্বেতবামনের ক্ষেত্রে অপবর্জন ভিত্তিক বিকর্ষণ সংগঠিত হয় ইলেকট্রনের দ্বারা। আর নিউট্রন তারকার ক্ষেত্রে হয় নিউট্রন দ্বারা। এজন্য একে নিউটন তারকা বলা হয়। এগুলোর ব্যাসার্ধ হয় মাত্র দশ মাইলের মতো কিন্তু তাদের ঘনত্ব প্রতি ইঞ্চিতে কোটি কোটি টন।

প্রশ্ন দেখা দেয় যে সমস্ত তারকার আয়তন ও ভর চন্দ্রশেখর সীমার চেয়ে বেশি ঐ সমস্ত তারকার অবস্থা কী হয়? চন্দ্র শেখরের ধারণা ছিল সেগুলোর মহাকর্ষ আকর্ষণ বেশি হবে এবং দ্রুতই তারা সংকোচন দশায় পড়বে বিধায় যে সব তারকা চুপসে অসীম ঘনত্বে (Infinite density) পরিণত হবে। উল্লেখ্য তারকা যত সংকুচিত হয় ততই তার ঘনত্ব বাড়ে এবং অসীম ঘনত্বে অসীম মহাকর্ষ শক্তি কাজ করে। চন্দ্রশেখরের শিক্ষক স্যার এডিংটন এ সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন। তারকা চুপসে বিন্দুতে পরিণত হবে এরকম বিশ্বাস এডিংটন কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। এতে তিনি কিছুটা বিমর্ষীত হন। অধিকন্তু আইনস্টাইন নিজেও তার তত্ত্বকে প্ররোচিত ভেবে এক গবেষণাপত্রে দাবি করেন তারকা সংকুচিত হয়ে কখনো শূন্যে পরিণত হবে না। এমন অবস্থায় চন্দ্রশেখর এই গবেষণার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্য ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ১৯৮৩ সালে যখন তাকে

www.pathagar.com

নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় সে পুরস্কারের অংশও ছিল শীতল তারকার ভর ও সীমা সম্পর্কীয় আগেকার গবেষণার জন্য।

চন্দ্রশেখরের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেল অপবর্জন ভিত্তিক একটি তারকার ভর চন্দ্রশেখর সীমার বেশি হলে তারকাটি চুপসে যাবে। কিন্তু অবশেষে তারকাটি কোনো অবস্থায় স্থির হবে এবং আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে মহাকর্ষ বল কী প্রভাব সৃষ্টি করবে তা জানা গেল না। এটা বোঝার সমস্যা ১৯৩৯ সালে স্পষ্ট করেন রবার্ট ওপেনহেইমার। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে তিনি পরমাণু বোমা প্রকল্পে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে পড়ায় তারকার বিষয়ে তার গবেষণায় ফিরে আসেননি। এ বিষয়টি বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষে এবং সত্তর দশকের প্রথমে স্পষ্ট করেন স্টিফেন হকিং। ওপেন হেইমারের গবেষণাকে ভিত্তি করে হকিং অপেক্ষবাদকে প্রয়োগ করেন। আইনস্টাইনের সাধারণ অপেক্ষবাদের ঘোষণা ছিল স্থান-কাল বাঁকা। এর প্রমাণ সূর্য কিম্বা অতিভরের তারকার পাশ দিয়ে আলো প্রবাহিত হওয়ার কালে আলোকের অগ্রভাগ তারকার ভেতরের দিকে বেঁকে যায় এবং আলোক-শঙ্কু একটি কোণের সৃষ্টি করে (সূর্য গ্রহণের সময় তা দেখা যায়)। তারকাটি যতই চুপসে যেতে থাকে ততই শীতলতা ও ঘনত্ব বাড়তে থাকে। ঘনত্বের বৃদ্ধির সাথে মহাকর্ষীয় বলও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে তারকার পৃষ্ঠদেশের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের আকর্ষণ বলও বাড়তে থাকে। এর ফলাফল হল প্রবাহমান আলোক আরো বেশি বেঁকে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারকাটি সংকুচিত হয়ে আয়তনে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি বা প্রান্তিক ব্যাসার্ধ লাভ করে আলোক আর সেখান থেকে পালাতে বা বের হতে পারে না। ব্যাপক অপেক্ষবাদ অনুসারে আলোকের চেয়ে কোনো কিছুই দ্রুতগামী নয়। ফলে আলোক যেখানে আটকা পড়ে পালাতে বা নির্গত হতে পারে না, এর অর্থ সেখানকার কোনো ঘটনাই জানা সম্ভব নয়। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সবকিছুকেই পিছনে টেনে রাখল। এই ক্ষেত্র বা অঞ্চলের নাম কৃষ্ণগহ্বর। আর সীমানার নাম ঘটনা দিগন্ত (Enent Horizon)। অনন্যতায় স্থানিক অবস্থায় কালের সমাপ্তি।

হকিং এবং পেনরোজ ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। গবেষণার বিষয় ছিল কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি, নিদর্শন, আকার-আয়তনসহ কৃষ্ণগহ্বরের অনন্যতা সৃষ্টি নিয়ে। ইতিপূর্বে অনন্যতায় মহাবিস্ফোরণে (Big-Bang) মহাবিশ্বের শুরু বিষয়ে আমরা জেনেছি। কিন্তু অনন্যতা (Singularity) বলতে অনুমান (Hypothesis) ছাড়া কোনো নিদর্শন উপস্থাপন করা যায়নি। কিন্তু হকিং ও পেনরোজের গবেষণা ছিল অপেক্ষবাদ অনুসারে কৃষ্ণগহ্বরের ভিতরে অসীম ঘনত্ব এবং স্থান-কাল বক্রতার অনন্যতা থাকতেই হবে। এটা অনেকটা কালের আরম্ভ সময়কার অনন্যতার মতো, যেখান থেকে

www.pathagar.com

মহাবিস্ফোরণে (Big-Bang) কালের শুরু। মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটা সহজ দৃষ্টান্ত সন্দেহ নেই কারণ ব্ল্যাকহোল এমন অনন্যতা সৃষ্টি করে যার আয়তন শূন্য কিন্তু ভর বা শক্তি অসীম। বিজ্ঞানে অসীমতা বা Infinity কখনো কখনো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে কারণ এই অসীমতা দিয়ে অসীম বিশ্বের সীমানা খুঁজতে হয়। অসীমতা বিষয়ে যাই হোক কৃষ্ণগহ্বর বিশ্ব সৃষ্টির ক্রিয়ায় ভালো উদাহরণ। তবে যে প্রশ্নটি দেখা দেয় তা হলো কৃষ্ণগহ্বরের অনন্যতা বিগ-ব্যাং এর পরের ঘটনা। বিগ-ব্যাং এর পূর্বে অনন্যতা (Singularity) গঠনের উৎস কী? তাহলে কি বিগ-ব্যাং-এর পূর্বে আরেকটি মহাবিশ্বের সংকোচন ঘটেছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর এ গ্রন্থের শেষে পাঠ করা যাবে। এবার কেবল বোঝা যাক কৃষ্ণগহ্বর কীভাবে শনাক্ত করা যায়? এ বিষয়ে হকিং—

> How could we hope to detect a black hole as by its very definition it dose not emit any light. It might seem a bit like looking for a black cat in a coal cooler. Fortunately there is a way. As john Mishel pointed out in his pioneering paper in 1783, a black hole still exerts a gravitational force on nearly object. Astronomers have observed many systems in which two stars orbit Droved reach other, attracted towards each other by gravity. They also observed system in which there is only one visible star that is orbiting around some unseen companion".

সংজ্ঞা অনুসারে কৃষ্ণগহ্বর থেকে কোনো আলোক নির্গত হয় না। ফলে আমরা কৃষ্ণগহ্বর খুঁজে পাবার আশা করব কী করে? এ যেন কয়লা গুদামে কালো বেড়াল খুঁজে বের করার মতো। সৌভাগ্যক্রমে পথও একটি আছে। ১৭৮৩ সালে জন মিশেলের গবেষণাপত্র এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেছে। তারা কৃষ্ণগহ্বর হলেও নিকটবর্তী বস্তুগুলোর ওপর মহাকর্ষীয় বল প্রয়োগ করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এমন বহু তন্ত্র (আমাদের সৌরজগত একটি তন্ত্র বা (Planetary System লেখক) পর্যবেক্ষণ করেছেন যেখানে একটি তারকা অন্য একটি তারকাকে প্রদক্ষিণ করে। এর কারণ পারস্পরিক মহাকর্ষীয় আকর্ষণ। আবার এমন তন্ত্রও দেখা যায় যেখানে একটি তারকা প্রদক্ষিণ করছে অদৃশ্য সঙ্গীকে নিয়ে।

অদৃশ্য সঙ্গীটি কৃষ্ণগহ্বর নাও হতে পারে কিন্তু আমাদের ছায়াপথের সিগনাস এক্স-১ এর মতো একাধিক তন্ত্রে এবং আমাদের প্রতিবেশী 'মেগালনিক কাউড' নামক ছায়াপথে কয়েকটি কৃষ্ণগহ্বরের সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন মনে করছেন কৃষ্ণগহ্বরের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। মহাবিশ্বের দীর্ঘ ইতিহাসে বহু তারকা তাদের পারমাণবিক জ্বালানি পুড়িয়ে শেষ করেছে এবং চুপসে যেতে বাধ্য

www.pathagar.com

হয়েছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন বিশ্বের কোটি কোটি গ্যালাক্সির মধ্যে তাদের সংখ্যা আমাদের দৃশ্যমান তারকার সংখ্যা (প্রায় দশহাজার কোটি থেকেও বেশি)।

কৃষ্ণগহ্বর আবিষ্কারের বিশেষত্ব হল তা মহাবিশ্বের সৃষ্টির বির্বতন ক্রিয়া জানা যায়। উত্তপ্ত তারকা জ্বালানি শেষ করে নিবে যায়। এরা শ্বেতবামন, নিউট্রন তারকা, পালসার, কোয়াসার, কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়। আমাদের ছায়াপথ রাজ্যে অগণন আদিম কৃষ্ণগহ্বর থাকবে যারা তারকা হিসেবে একসময় দিপ্তীমান ছিল। আমাদের বিশ্ব স্থির ও অনাদি নয়। উল্লেখিত উদাহরণ প্রমাণ করে বিশ্বের আরম্ভ থাকতেই হবে। তা যেভাবেই হোক। এছাড়া একটা বিগ-ব্যাং যে হতে পারে তারও প্রমাণ হকিং দিয়েছেন।

www.pathagar.com

কৃষ্ণগহ্বর অত কালো নয়
Black Hole Arn't So Black

এ অধ্যায়ে হকিং আপেক্ষিক ও কণাবাদী তত্ত্বের পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয়ে মহাবিশ্বের উৎপত্তির গভীরতর অনুধ্যান ব্যক্ত করতে সচেষ্ট। এ ছাড়া আপেক্ষিক ও কোয়ান্টাম বা কণাবাদী দুটি অংশকে তত্ত্বের একীভূত করার প্রচেষ্টা। যে দুটি তত্ত্বের আলোকে বিশ্বের উৎপত্তি, গঠন, বিবর্তন এবং শেষ পরিণতির ব্যাখ্যা দিতে হয় তা আপেক্ষিক ও কোয়ান্টাম বা কণাবাদী তত্ত্ব। আপেক্ষিক তত্ত্ব মহাকর্ষনির্ভর তত্ত্ব। মহাকর্ষ প্রভাবে বৃহদাকার তারকার গঠন বিবর্তন এবং শেষ পরিণতি ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্ববর। যেহেতু কৃষ্ণগহ্বরে ঘটনা তথা কালের সমাপ্তি সে অবস্থায় আপেক্ষিক তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী এখানেই শেষ। তবে এ তত্ত্বের মূল্যায়ন তা একক অনন্যতা নির্দেশ করে। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরসহ অনন্যতার পরিণতি কী তা তত্ত্বটি জানাতে ব্যর্থ। বিষয়টি তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী হকিংকে ভাবিয়ে তোলে এবং কৃষ্ণগহ্বর বিষয়ে গভীর অনুধ্যানে ব্যস্ত হন। কৃষ্ণগহ্বরে কণাবাদী তত্ত্ব আরোপে তিনি ব্যক্ত করেন আপেক্ষিক তত্ত্ব যে অর্থে কৃষ্ণগহ্বরকে সংজ্ঞায়িত করে, বিষয়টি শতভাগ তেমন নয়। কৃষ্ণগহ্বরে বিকিরণ প্রভাব রয়েছে। অন্য কথায় কৃষ্ণগহ্বর থেকেও ঘটনা প্রবাহ জানা সম্ভব। এ অর্থেই কৃষ্ণগহ্বর অত কালো নয়। মূলত এ অধ্যায়ে দুটি বিশেষ তত্ত্ব (আপেক্ষিক ও কণাবাদী তত্ত্ব) কে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যা এক অর্থে দুটি তত্ত্বকে মিলিয়ে ফলাফল দেখা। এ বিষয়টি আরো ভালোভাবে কৃষ্ণগহ্বর অত কালো নয় অধ্যায়ের মূল বক্তব্য কৃষ্ণগহ্বর বিকিরণ করে। এ বিষয়টি কেবলমাত্র হকিং এর গবেষণার ফলাফল। যা বিজ্ঞান মহলে স্বীকৃত তত্ত্ব। আমাদের চারপাশে যা আমরা দেখি তার সব কিছুতেই বিকিরণ রয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের বিধি অনুসারে চাপ, তাপ, গতি, ইত্যাদি প্রভাবে জাগতিক সকল বস্তুই বিকিরণ প্রভাবে ক্ষয় ও লয় প্রাপ্ত হয়। কোনোটির ক্ষেত্রে তা দ্রুত, কোনোটির ক্ষেত্রে ধীর, কোনোটির ক্ষেত্রে অতি অতি অতি ধীর। যে হিমালয়কে হাজার হাজার বছর ধরে অস্তিত্ব ঘোষণা করছে, সে হিমালয়ও কয়েক কোটি বছরে বিকিরণ প্রভাবে মিলিয়ে যাবে। বিকিরণ করছে পৃথিবী, গ্রহ, তারকা, কৃষ্ণগহ্বরসহ যাবতীয় বিষয়বস্তু। এটি তাপগতিবিজ্ঞানের ধর্ম। তাপগতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিধি অনুসারে আমরা যা কিছু শৃঙ্খলায় দেখি, তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা এনট্রফি (Entrophy) বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা

www.pathagar.com

একটি চাকচিক্যময় সুন্দর দালান তৈরি করলাম। কয়েক বছর পর তা বিশৃঙ্খলার দিকে যাবে। বাড়িটি বিবর্ণ হবে। একে পুনরায় রং করে চকচকে করতে হয়। এতে শক্তি ক্ষয় হয়। ফলে বিশ্বের মোট শক্তির হ্রাস ঘটছে। আপাতত দৃষ্টিতে বিশ্বের যা কিছু সুশৃঙ্খল দেখি প্রকৃত অর্থে তা বিশৃঙ্খলার দিকে ধাবমান। যদি তা শৃঙ্খলার দিকে থাকত তাহলে আমাদের ঘরবাড়ি, ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মেরামত করার প্রয়োজন হত না। উল্টো সবকিছুই চকচকে হয়ে উঠত, ভাঙা চেয়ার জোড়া লাগত। কোনো শ্রমশক্তির প্রয়োজন হত না।

কৃষ্ণগহ্বরে অনুরূপ এনট্রফি বা বিশৃঙ্খলা থাকবে। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বর থেকে যেহেতু কোনো কিছুই নির্গত হওয়ার ঘটনা শনাক্ত সম্ভব নয় বা কোনো কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে না, সে ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা কী করে বোঝা যাবে? এক্ষেত্রে হকিং তার গাণিতিক হিসেব কষে কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের বা মহাকর্ষীয় বলের ক্ষেত্রের সীমানা হ্রাস বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে তা স্পষ্ট করেছেন। একটি কৃষ্ণগহ্বরের সাথে যদি আর একটি কৃষ্ণগহ্বরের যোগ করা যায় তাহলে ঘটনা দিগন্তের পরিধি বাড়বে—এটা সহজ হিসেব।

কৃষ্ণগহ্বরে বিকিরণ থাকার অর্থ তা থেকে কণিকা নির্গত হওয়া। কোনো কিছুই সেখান থেকে বের হওয়া সম্ভব নয় সেখানে কণিকা নির্গত হয় কীভাবে? এর উত্তরে হকিং এর বক্তব্য—

"উত্তরটি দিচ্ছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব (কণাবাদী তত্ত্ব)। কণিকাগুলো কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর থেকে নির্গত হয় না। সেগুলো আসে কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের ঠিক বাইরে 'শূন্য' স্থান থেকে। এটা বোঝা যায় নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে।

আমরা যাকে শূন্যস্থান বলি সেটা সম্পূর্ণ শূন্য হতে পারে না। কারণ তা যদি হয় তাহলে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের মতো সকল ক্ষেত্রেই নির্ভুলভাবে শূন্য হতে হবে। কিন্তু একটি ক্ষেত্রের স্থান এবং কালের সঙ্গে এর পরিবর্তনের হার একটি কণিকার অবস্থান এবং গতিবেগের মতো। ফলে শূন্য স্থান এবং কণিকার গতিবেগের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। এছাড়া অনিশ্চয়তার নীতির মর্মার্থ অনুসারে ঐ সমস্ত কণিকাগুলোর একটিকে যত নিখুঁতভাবে জানা যায় অপরটি সম্বন্ধে জ্ঞান ততই ভুল হয়। ফলে শূন্যস্থানকে নিখুঁতভাবে শূন্য বলে স্থির করা যায় না। কারণ, তাহলে শূন্যের একটি নিখুঁত মান এবং পরিবর্তনের নিখুঁত হার দুটিই থেকে যাবে। অনিশ্চয়তার বিধি অনুসারে ক্ষেত্রের মানের একটি সর্বনিম্ন অনিশ্চয়তা বা কোয়ান্টাম হ্রাস বৃদ্ধি (কণার অবস্থানের অস্থিরতা) থাকতেই হবে। এই হ্রাস বৃদ্ধিকে (Fluctuation) মহাকর্ষ কণিকা কিংবা আলোক কণিকার জোড় হিসেবে

www.pathagar.com

ভাবা যেতে পারে। এরা কোনো সময় একসঙ্গে দেখা দেয়, আলাদা হয়ে যায়, আবার একত্র হয় এবং পরস্পরকে বিনাশ করে। সূর্যের মহাকর্ষীয় বল যারা বহন করে এরা সেগুলোর মতো কল্পিত কণিকা। বাস্তব কণিকাগুলো যেমন কণিকা অভিজ্ঞাপক যন্ত্র দ্বারা (Particle detector) প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়, এগুলোকে সেরকম পর্যবেক্ষণ করা যায় না। তবে পরমাণুর ভিতরকার ইলেকট্রনের কক্ষের পরিবর্তনে শক্তির যে সামান্য পরিবর্তন হয় তাই দিয়ে কিন্তু এগুলোর পরোক্ষ ক্রিয়া মাপা যায়। এর সঙ্গে তাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মিল রয়েছে। অনিশ্চয়তা নীতির আর একটি উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী হল, পদার্থ কণিকার সমরূপ কল্পিত জোড়া আরো দেখা যাবে। যেমন ইলেকট্রন কিংবা কার্কের জোড়। জোড়ের একটি হবে কণিকা অপরটি হবে বিপরীত কণিকা। তবে আলোক ও মহাকর্ষের ক্ষেত্রে কণিকা এবং বিপরীত কণিকা অভিন্ন।"

কৃষ্ণগহ্বরকে যদি দুটি ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে একটি হবে কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষীয় বলের ক্ষেত্র যা সাধারণভাবে শূন্যস্থান ভাবা হয়। অন্যটি ঘটনা দিগন্ত থেকে এর ভিতরস্থ অনন্যতা। যেহেতু শূন্যস্থান শূন্য নয় ফলে অভ্যন্তরস্থ বিকিরণ প্রভাব যা কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের পৃষ্ঠদেশ প্রভাবিত করে যা থেকে কণিকা নির্গত হতে পারে। কৃষ্ণগহ্বরের বিকিরণ প্রভাবে হকিং এর মন্তব্য—বিকিরণে কৃষ্ণগহ্বরের আয়তন হ্রাস পেলে তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে (সূর্য থেকে কয়েকশত গুণ বেশি ভর সম্পন্ন একটি কৃষ্ণগহ্বরের তাপমাত্রা হবে চরম শূন্য থেকে এক ডিগ্রির এক কোটি ভাগের এক ভাগ বেশি। যা মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ তাপমাত্রা থেকে অনেক অনেক কম। মাইক্রোওয়েভ তাপমাত্রা চরম শূন্য থেকে প্রায় ২.৭ ডিগ্রি বেশি)। ফলে সেটা থেকে বিকিরণ প্রভাবে কণিকা নির্গত হওয়ার হার বৃদ্ধি পাবে। এতে ভর আরো হ্রাস পাবে। কৃষ্ণগহ্বরের ভর যখন অতিঅল্প হয়ে যায় তখন ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় তা স্পষ্ট নয়। তবে অনুমান হল অন্তিমে এক বিরাট বিস্ফোরণের ফলে কৃষ্ণগহ্বরটি সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়। বিস্ফোরণটি হতে পারে বহু মিলিয়ন হাইড্রোজেন বোমার সমান। ঠিক যেন মিনি বিগ-ব্যাং। মহাবিশ্বের সৃষ্টির মূলের দিকে তাকাতে হলে দুটি তত্ত্বনির্ভর সন্ধানই আমাদের ভরসা। একটি মহাবিশ্বের ব্যাপকতায় আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদ, অন্যটি কণা বিশ্লেষণে কণাবাদী বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব। অপেক্ষবাদ বিশ্বের শুরুতে অনতিক্রমন্য একক অনন্যতার নির্দেশ করে, মহাবিস্ফোরণে যা থেকে মহাবিশ্ব তথা কালের শুরু। কিন্তু সে অনন্যতা বা সিংগুলারিটি কোথা থেকে? কীভাবে? এর ব্যাখ্যা, বর্ণনা, পরিণতি, প্রভাব তত্ত্বে নেই। সব কার্যকরণ বিধি সেখানে হারিয়ে যায়। হকিং এর কৃষ্ণগহ্বর গবেষণা এবং কৃষ্ণগহ্বরে বিকিরণ প্রভাব, এবং কণাবাদী তত্ত্বের বিশ্লেষণে সেসব

www.pathagar.com

প্রশ্নের উত্তর অনেকটাই মিলেছে। তবে অনন্যতা কোথা থেকে? কেন? বিষয়ক জটিলতা এড়াতে কণাবাদী তত্ত্বই ভরসা। এক্ষেত্রে হকিং ১৯৭৪ সালের পর থেকে কণাবাদী তাত্ত্বিক রিচার্ড ফাইনম্যানের (Richard Feynman) কণার নিভৃত আচরণ ব্যাখ্যায় কণার সকল ইতিহাসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। এ পদ্ধতিতে তিনি পরবর্তী 'মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও পরিণতি' (The origin and the fate of the universe) এবং 'সময়ের মুখ' (Arrow of Time) দুই অধ্যায় উপস্থাপন করেছেন।

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও পরিণতি

The origin and the fate of the universe

এ অধ্যায়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিশ্বের শুরু কীভাবে হয়েছিল বা বিশ্বের আদৌ শুরু ছিল কিনা? হকিং তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক উপস্থাপন করেছেন। আইনস্টাইনের অপেক্ষবাদ পরমকালের বিলুপ্তি ঘটায়। যা ভাবা হয়ে আসছিল তা হল কাল ঘটনা নিরপেক্ষ অর্থাৎ ঘটনা যাই হোক, কাল ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত নয়। ফলে কালের প্রবাহ নিরন্তর। কাল শাশ্বত, অনাদি। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্বে কাল ঘটনানিরপেক্ষ নয়। কাল ঘটনানির্ভর। দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী ব্যবধানই কালের বা সময়ের মাপন, যা সাধারণ ভাবে আমরা ঘড়ির কাঁটায় মেপে নেই। আপনার হাতের কলমটি টেবিলের ওপর রাখুন। এটি একটি ঘটনা। এবার কলমটি পুনরায় হাতে তুলে নিন। এটি আর একটি ঘটনা। দুটি ঘটনার মধ্যে দেখবেন আপনার হাতের ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা সামনে অগ্রগামী হয়েছে। অর্থাৎ কিছুটা কাল পশ্চাতে। যদি তা এক সেকেন্ড হয়, দুটি ঘটনার মাঝের কালের মাপন হবে এক সেকেন্ড। ফলে কাল পরম বা নিরপেক্ষ নয়। কাল আপেক্ষিক যা আইনস্টাইনের অপেক্ষবাদ ঘোষণা করেছে। কাল সম্মুখে অগ্রগামী হচ্ছে। অর্থাৎ কাল রেখা সম্মুখগামী। (কেন সম্মুখগামী তা পরবর্তী 'কালের মুখ' অধ্যায়ে জানা যাবে)। কালের মুখ সম্মুখগামী হওয়ায় আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে এর পশ্চাতে একটি আরম্ভ ঘটনা থাকতে হবে; যেখান থেকে কালের শুরু। এখন অগ্রমুখী সকল ঘটনাকে যদি একটি রেখায় সমাপাতন ঘটানো যায় তাহলে সে রেখার পশ্চাতে একটি বিন্দু ঘটনা অনিবার্য হয়ে পড়ে, যেখান থেকে কাল বা ঘটনার সূত্রপাত। অন্য কথায় আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে বিশ্ব ঘটনার সূত্রপাতে থাকে সূচনা ঘটনা যেখান থেকে মহাবিশ্ব যাত্রা শুরু করেছে। ফলে এ তত্ত্বে বিশ্বের একটি সীমানা (Boundary) থাকবে আর সেটি বিশ্বের আরম্ভ বিন্দু। অতএব আপেক্ষিক তত্ত্ব ঘোষণা করে বিশ্বের উৎপত্তি (Origin) আছে। আছে একটি আরম্ভের সীমান্ত।

ধর্ম ও দর্শন বিশ্বের শুরু বা আরম্ভ আছে বলে মত ব্যক্ত করে। স্রষ্টার ইচ্ছতেই জগত সৃষ্টি। স্রষ্টা ইচ্ছা করলেন জগৎ সৃষ্টি হোক। জগৎ সৃষ্টি হল। (Let there be world, and the world was created)। এখানে স্রষ্টার ইচ্ছাই উপাধেয়। তাঁর সৃষ্টির প্রারম্ভকালীন অবস্থা, বিবর্তন, বিবরণ ধর্ম ও দর্শনের বিষয় নয়। কিন্তু বিজ্ঞান

www.pathagar.com

বিবরণ, পরীক্ষণসহ সে বিষয়ের তথ্য উপাত্ত পেতে চায়। এখানেই ধর্ম ও দর্শনের সাথে বিজ্ঞানের পার্থক্য। বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য অনুসারে বিগ-ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ ১৩.৭ মিলিয়ন বা তেরশত সত্তর কোটি বছর পূর্বে বিশ্ব যাত্রা শুরু করে। অবশ্য ধর্ম ও দর্শনে এরূপ কাল, ক্ষণ নির্ণীত নেই।

অবশ্য বিজ্ঞানের এ তত্ত্ব নিরঙ্কুশ কি না তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। যা হকিং নানা প্রশ্নে এ অধ্যায়ে ব্যক্ত করেছেন। বিশেষ করে আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে বিশ্বের শুরু আছে কিন্তু কণাবাদী বিজ্ঞানী হকিং কণার ইতিহাস, আচরণ, বিচরণ, স্থিতি, লয়ের গাণিতিক ব্যাখ্যায় বিশ্বের আরম্ভ ছিল কিনা, এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেননি। কণাবাদী তত্ত্বে আপেক্ষিক তত্ত্বের ন্যায় কালের তথা বিশ্বের শুরু অনিবার্য হয়ে ওঠে না। বরং বিশ্ব ছিল, আছে এবং থাকবে; এমন প্রপঞ্চতাই (Hypothesis) প্রকাশ পায়। অধ্যায়টির শুরুতে হকি এর কথা—

"Einstein's general theory of relativity, on its own predicted that space-time begaun at the big-bang singularity and would come to an end either on big crunch singularity (if the whole universe re-collapsed) or at singularity inside the black hole (if a local region, such as a star, were to collapse). Any matter that fell into the hole would be destroyed at the singularity, and only the gravitational effect of its mass would continue to be felt outside. On the other hand, then quantum effects were taken into account, it seemed that the mass or energy of the matter would eventually be returned to the rest of the universe, and that the black hole, along with any singularity in side it, would evaporate away and finally disappear. Could quantum mechanics have an equally dramatic effect on the big-bang and big crunch singularities? What really happens during the very early and late stages of the universe, when gravitational field are so strong that quantum effects cannot be ignored? Does the universe in fact have a beginning or an end? And so what are they like.
—(Brief History page-128)?

[আইনস্টাইনের ব্যাপক বা সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব আবশ্যিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, স্থান-কাল বিগ-ব্যাং মহাবিস্ফোরণ অনন্যতার শুরু হয়েছিল এবং তা শেষ হবে হয়ত মহা সংকোচনের অনন্যতায় (যদি সমগ্র মহাবিশ্ব চুপসে যায়) বা কৃষ্ণগহ্বরের অনন্যতায় (যদি বিশেষ স্থানের অঞ্চল বা তারকা চুপসে যায়)। যদি কোনো পদার্থ কৃষ্ণগহ্বরে নিপতিত হয় তাহলে তা ধ্বংস হয়ে কৃষ্ণগহ্বর অনন্যতায় মিশে যাবে, কেবল মহাকর্ষ বল প্রভাব বিস্তার করবে। আবার যখন কোয়ান্টাম প্রভাবকে বিবেচনায় নেয়া হল, তখন মনে হল ঐ পদার্থের ভর বা শক্তি শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের অবশিষ্টাংশে ফিরে যাবে, এবং কৃষ্ণগহ্বরটিও উবে

www.pathagar.com

যাবে, এর ভিতরে যদি কোনো অনন্যতা থাকে, সেটাসহ উবে যাবে। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে। কণাবাদী তত্ত্বের কি মহাবিস্ফোরণের অনন্যতা এবং মহাসংকোচনের অন্যন্যতায় নাটকীয় প্রভাব থাকতে পারে? আসলে বিশ্বের শুরুতে এবং শেষে যা ঘটে, সেখানে মহাকর্ষ ক্ষেত্র অকল্পনীয় শক্তিশালী, সে অবস্থাতে কণাবাদী প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। তাহলে কি বিশ্বের আদৌ শুরু আছে? অথবা নেই? তাহলে তা কী হতে পারে?]

আসলে তা কী হতে পারে? এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা হকিং এ অধ্যায়ে ব্যক্ত করেছেন। এ দ্বান্দ্বিকতার কারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে অনন্যতা বা মহাকর্ষ বলে একক অসীম ঘনত্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে। যার বিস্ফোরণে মহাবিশ্বের শুরু। বিকাশমান মহাবিশ্বের আবার মহাকর্ষ বলে একক ঘনত্বে সমাপ্তি। যার উদাহরণ কৃষ্ণগহ্বর। কারণ স্থানিক অবস্থায় কৃষ্ণগহ্বর একক ঘনত্বে পরিণত হয় আবার বিকিরণে তা মিলিয়ে যায়। ফলে আপেক্ষিক তত্ত্বত বটেই, মহাবিশ্বের আচরণ বুঝতে হলে কণাবাদী তত্ত্বের প্রয়োগফল জানা আবশ্যক।

আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদ তত্ত্ব মূলত মহাবিশ্বের ব্যাপকতর ব্যাখ্যা। অন্যদিকে হকিং এর কণাবাদী তত্ত্ব ব্যাপকতায় কণার প্রভাব। মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং পরিণতি বিষয়ে বিজ্ঞান ভাবনায় আমাদের আপেক্ষিক ও কণাবাদী তত্ত্ব গ্রহণ করতেই হয়। কারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব বিশ্বের শুরু নির্দেশ করলেও এর বিবর্তন ইতিহাস বিবরণে কণা প্রতিকণা তথা পরমাণু, পদার্থ, নক্ষত্র, গ্রহ, এবং সর্বশেষ জীব জগতের বিকাশ জানতে হয়। এ বিষয়ে নানা মতবাদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আবশ্যক। এ পর্যায়ে কয়েকটি মডেলের মধ্যে "উত্তপ্ত মহাবিস্ফোরণ প্রতিরূপ" (hot big-bang model) হকিং ব্যাখ্যা করেছেন। এ মডেলটি বর্তমানে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও বিবর্তন ইতিহাসের অনেকাংশে যুক্তিগ্রাহ্য মডেল। বিগ-ব্যাং-এর অনিবার্যতায় তার পরবর্তী অবস্থার বিবরণ তথা মহাবিশ্বের ইতিহাস হট বিগ-ব্যাং মডেলে আলোচিত হল।

মহাবিশ্বের স্বরূপ দেখে আমরা বিমোহিত হই। তারকাচ্ছন্ন আকাশ আর অসীম শূন্যতা দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ি। এরই বন্দনা করেছেন দার্শনিক, কবি, ঋষি, ভাবুকেরা। সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বিহ্বল উক্তি—"আর কত দূরে নিয়ে যাবে এ সুন্দরী/। বল কোন পাড়ে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।" বলাকায় তিনি লিখলেন—'হেথা নয়, হেথা নয়। অন্য কোথাও অন্য কোন খানে।' এখানে কবির বিহ্বল মনে অসীমতার প্রতিভাস। ভাবুক ঋষি লালনের ভাবনায়—'আল্লাহ কে বোঝে তোমার অপার লীলে/ তুমি আপনি আল্লাহ ডাকো আল্লাহ বলে/ নৈরাকারে তুমি নূরী/ করলেন ডিম্ব অবতারী...। নিরব ও নিকুম্ভ ধ্বনী/ তাত সবে সত্য মানি।' রবীন্দ্রনাথ যেখানে অসীমতায় মজেছেন,

www.pathagar.com

লালন সেখানে বিশ্বের সীমানার চেতনা গ্রহণ করেছেন। নৈরাকারে তুমি নূরী/ করলেন ডিম্ব অবতারী বা নিরব নিকুম্ভ ধ্বনী/ তাত সবে সত্য মানি, এখানে মহাশূন্যে ডিম্ব, আধুনিক বিজ্ঞানের অনন্যতা এবং নিকুম্ভ ধ্বনি বিগ-ব্যাং এর প্রতীক। লালন মহাবিশ্বের আরম্ভ এবং সীমানার কথা ভেবেছেন।

মূলত বিজ্ঞান ভাব ও আপ্ত কথার বিষয় নয়। যে আওতায় বিষয় বর্ণনা ও পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণ সিদ্ধ হয় বিজ্ঞানের বিষয় ততটুকু। ফলে এ অধ্যায়ে হকিং মহাবিশ্বের সূচনালগ্নের বর্ণনায় বিধি মোতাবেক তার ব্যাখ্যা দেন। মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল কি না? এ অধ্যায়ে ফ্রীডম্যানের মডেলটির যে ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি তাতে মহাবিশ্বের আকার-আয়তন ও গঠনের একটি ইতিহাস রয়েছে। যে ইতিহাসে বিশ্ব উত্তপ্ত অবস্থা থেকে সম্প্রসারণের সাথে শীতল হচ্ছে। শীতলতার সাথে ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় মহাকর্ষ বলের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বিশ্বের আকার-আয়তন, অবয়ব সৃষ্টি করছে। মনে করা হয়ে থাকে বিস্ফোরণের (Big-Bang) সময় মহাবিশ্বের আয়তন ছিল শূন্য কিন্তু তাপ ছিল অসীম। বিস্ফোরনের এক সেকেন্ড পর বিশ্ব সম্প্রসারণের ফলে তাপমাত্রা নেমে এসেছিল কয়েক হাজার কোটি ডিগ্রিতে (সাধারণ অভিজ্ঞতায় তাপীয় বাষ্প যত ছড়াতে থাকে, তাপ তত হ্রাস পায়)। মহা বিস্ফোরণের এক সেকেন্ডের পর তাপমাত্রা নেমে এসেছে প্রায় এক হাজার কোটি ডিগ্রিতে। এই তাপ সূর্যের কেন্দ্রের তাপের চেয়ে প্রায় এক হাজার গুণ বেশি। তবে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের সময় তাপ এই মাত্রায় পৌঁছে। এই তাপমাত্রায় ভারি কোনো বস্তুই থাকা সম্ভব নয়। কেবল থাকতে পারবে ফোটন, ইলেক্ট্রন, নিউট্রোনের মতো হালকা কণিকা এবং তাদের বিপরীত কণিকা। সে সাথে কিছু প্রোটন ও নিউট্রন। বিশ্ব যতই বিস্তৃত হচ্ছিল, বিস্তৃতির সাথে তাপমাত্রাও কমে আসছিল। এ অবস্থায় ইলেক্ট্রন ও বিপরীত ইলেক্ট্রন সংঘর্ষে ইলেক্ট্রন উৎপাদন হার তাদের ধ্বংসের হারের নীচে নেমে আসছিল। ফলে ইলেক্ট্রন এবং বিপরীত ইলেক্ট্রন আরো বেশি ফোটন উৎপাদন করছিল। তবে সামান্য কিছু ইলোক্ট্রন অবশিষ্ট থেকে যাচ্ছিল। তবে নিউট্রিনো এবং বিপরীত নিউট্রিনো পরস্পর বিনাশিত হচ্ছিল না। কারণ তাদের পরস্পর ক্রিয়ার ফলাফল ছিল খুবই দুর্বল। এগুলো এখনো বর্তমান থাকা উচিত। এগুলোকে যদি পর্যবেক্ষণ করা যেত তাহলে মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থার 'উত্তপ্ত মহাবিশ্বে'র ভালো বিবরণ পাওয়া যেত। কিন্তু এতদিনে তাদের শক্তি এত হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে যে প্রত্যক্ষভাবে তাদের শনাক্ত করা অসম্ভব। ১৯৮৬ সালের রুশ বিজ্ঞানীর একটি পরীক্ষা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এগুলোর সামান্য নিজস্ব ভর আছে। পরীক্ষার ফল এখনো সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। তবে তারা আলোকহীন পদার্থ বা ডার্ক ম্যাটার (Dark Matter) বলে চিহ্নিত হতে পারে। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ বন্ধ করা বা চুপসে দেয়ার মতো মহাকর্ষীয় আকর্ষণ তাদের থাকতে পারে।

www.pathagar.com

বিস্ফোরণের ১০০ সেকেন্ড পর তাপমাত্রা নেমে এসেছে প্রায় ১০০ শত কোটি ডিগ্রিতে। সবচেয়ে উত্তপ্ত তারকাগুলোর মধ্যে এই তাপমাত্রা পাওয়া যায়। এই উত্তাপে প্রোটন ও নিউট্রোনের কেন্দ্রীয় নিউক্লিয় বলের আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তি থাকে না। এখন অতিতাপীয় অবস্থার অবশিষ্ট যে প্রোটন ও নিউট্রন ছিল এরা মিশ্রিত হয়ে অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলিক পদার্থ ডুয়েটিরিয়াম বা হাইড্রোজেন গঠন শুরু করবে। ডুয়েটিরিয়ামের থাকে একটি প্রোটন, একটি ইলেক্ট্রন ও একটি নিউট্রন। এ সময় ডুয়েটিরিয়ামের কেন্দ্রক আরো প্রোটন ও নিউট্রনের সঙ্গে মিলিত হয়ে হিলিয়ামের কেন্দ্রক তৈরি করবে। হিলিয়ামে থাকে দুটি প্রোটন, দুটি ইলেক্ট্রন, দুটি নিউট্রন। আরো দুটি মৌলিক পদার্থ লিথিয়াম ও বেরিলিয়াম তৈরি হয়ে থাকবে। হিসাব করে বলা যায় মহবিস্ফোরণের উক্তপ্ত অবস্থায় প্রোটন এবং নিউট্রনের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য ভারী মৌলিক পদার্থে পরিবর্তিত হবে। আর বাকি নিউট্রন অবক্ষয়ের ফলে প্রোটন তৈরি হবে। এসব প্রোটন সাধারণ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রক। বিশ্বের ৯৮ ভাগ হইড্রোজেন থাকার কারণ এটাই।

জর্জ গ্যামো ও তার ছাত্র রক্যালফ আলফার একটি গবেষণাপত্রে ১৯৪৮ সালে উত্তপ্ত মহাবিশ্বের একটি প্রতিরূপের চিত্র প্রকাশ করেন। তারা মহাবিশ্বের আদিপর্বের অতিউত্তপ্ত অবস্থার ফোটন বিকিরণের অবশেষ এখনো থাকা উচিত বলে মনে করেন। তবে তা তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে চরম শূন্যের (-২৭৩° ডিগ্রি) কয়েক ডিগ্রি বেশি হতে পারে। তা বিকিরণ হিসেবে থাকতে হবে। বস্তুত পেনজিয়াস ও উইলসনস ১৯৬৫ সালে এই বিকিরণই গুঞ্জনরূপে আবিষ্কার করেন (মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল অধ্যায়ে আলোচিত)।

বর্তমানে এই বিকিরণ মাহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ (The cosmic microweve Background Radiation) বলে স্বীকৃত। যা আদিম উত্তপ্ত মহাবিশ্বের নিদর্শন বহন করছে। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের সাথে আদিম অবস্থার ফোটন বিকিরণ চরম শীতল অবস্থায় কৃষ্ণবস্তু রূপে বিদ্যমান আছে। এসব কৃষ্ণবস্তুর (Dark Matter) কেবল গুঞ্জন হিসেবে ধরা দেয়। বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের সময় রেডিওতে যে রকম গুঞ্জন শুনতে পাওয়া যায় এটা অনেকটা তেমন। ১৯৬৫ সালে পেনজিয়াস ও উইলসন ল্যাবরেটরীতে আদিম মহাবিশ্বের কৃষ্ণকায়া বিকিরণ বা মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। আমাদের ব্যবহৃত টেলিভিশনের চ্যানেল বন্ধ হলে ছবিবিহীন টিভির পর্দায় যে ফুট ফুট দৃশ্য দেখা যায় তা আদিম মহাবিশ্বের মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ বলে বিজ্ঞানীরা সনাক্ত করেছেন। এ আবিষ্কার বিজ্ঞানীরা বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বলে মনে করেন। মহাবিশ্বের বিকাশের এ পর্বকে বিজ্ঞানীরা

www.pathagar.com

বিকিরণ প্রধান যুগ বা Radiation Dominated Era বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহাবিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হিলিয়াম ও অন্যান্য হালকা উপাদান বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। এরপর প্রায় দশ লক্ষ বছর ধরে বিশ্ব কেবল সম্প্রসারণই হচ্ছিল। পরিশেষে তাপমাত্রা যখন কয়েক হাজার কোটি ডিগ্রিতে নেমে আসে তখন শুরু হয় মহাবিশ্বের দ্বিতীয় পর্ব। সাধারণত এ পর্ব থেকে পদার্থ গঠনের পরমাণু সৃষ্ট হতে থাকে। এ পর্বকে বলা হয় বস্তুপ্রধান যুগ বা Matter Dominated Era.

তাপমাত্রা যখন কয়েক হাজার কোটিতে নেমে আসে তখন ইলেক্ট্রন ও কেন্দ্রকগুলোর পারস্পারিক (ইলেক্ট্রন ও প্রোটন) বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আকর্ষণ অতিক্রম করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি থাকল না। এ সময় ইলেকট্রন ও প্রোটন মিলে পরমাণু গঠনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিশ্ব কেবল সম্প্রসারণ এবং শীতলতর হতে থাকবে এটাই ছিল সম্ভাবনা। কিন্তু কিছু অঞ্চলের ঘনত্ব বেশি থাকতে পারে বা ছিল। যে সমস্ত অঞ্চলের ঘনত্ব গড় ঘনত্বের চেয়ে বেশি ছিল ঐ সমস্ত অঞ্চলের অতিরিক্ত মহাকর্ষ টানে সম্প্রসারণ ধীরতর হওয়ায় সম্ভাবনা দেখা দেয়। অবশেষে সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে মহাকর্ষ টানে চুপসে যেতে থাকে। যতই চুপসে যাচ্ছিল পরমাণুর ঘনত্ব ততই বাড়ছিল, সে সাথে বাড়ছিল মহাকর্ষ বলের টান। মহাকর্ষ টানে অঞ্চল ভিত্তিক ঘূর্ণন ক্রিয়া শুরু হতে পারে। চুপসে যাওয়ার ফলে অঞ্চলগুলো যত ক্ষুদ্র হবে, ঘুর্ণনও তত দ্রুত হবে। শেষে অঞ্চলটি যখন যথেষ্ট ক্ষুদ্রতর হবে তখন মহাকর্ষীয় আকর্ষণের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করার মতো ঘুর্ণনের দ্রুতিও বাড়বে। এভাবেই ঘুর্ণয়মান গ্যালাক্সির সৃষ্টি হয়।

অন্যান্য যে সমস্ত অঞ্চল ঘুর্ণন শুরু করতে পারেনি সেগুলো ডিম্বাকৃতি বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়। এগুলোর নাম উপবৃত্তকার গ্যালাক্সি।

সাধারণ অর্থে গ্যালাক্সি বলতে তারকার সমাবেশ (Constellation of Stars) বোঝালেও প্রারম্ভিক বিশ্বে গ্যালাক্সি হল বিরাট অঞ্চলের চুপসে যাওয়ার ঘন গ্যাসীয় চাঁই। একে সাধারণত নেবুলা বা নীহারিকা বলা হয়। এই গ্যাসীয় চাঁই থেকেই তারকার জন্ম। মহাবিশ্বের দ্বিতীয় পর্বে কালের গতির সঙ্গে নীহারিকাগুলোর হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম ক্ষুদ্রতর মেঘখণ্ডে ভেঙে যায়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড নীহারিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের মহাকর্ষ চাপে চুপসে যেতে থাকে। চুপসে যাওয়া বা সংকোচনের ফলে ভিতরের পরমাণুগুলোর পরস্পর সংঘর্ষে গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে। শেষে যথেষ্ট উত্তপ্ত হলে কেন্দ্রীয় সংযোজন অভিক্রিয়া (Neuclear fusion reaction) শুরু হবে। ফলে হাইড্রোজেনগুলো আরো বেশি মাত্রায় হিলিয়ামে পরিণত হবে। অতিরিক্ত হিলিয়াম অতিরিক্ত উত্তাপ সৃষ্টি করবে। উত্তাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় বহির্মুখী চাপও বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সংকোচন বন্ধ হয়ে অঞ্চলটি তারকা হিসেবে সুস্থির হবে এবং আমাদের সূর্যের মতো বহুকাল দিপ্তীমান

www.pathagar.com

থাকবে। তারকাগুলো হাইড্রোজেন পুড়িয়ে হিলিয়াম তৈরি করে এবং এর ফলে যে শক্তি উৎপাদন হয় সেটা আলো ও তাপ বিকিরণ করে।

সাধারণ আয়তনের (সূর্যের আয়তন) চেয়ে অধিক আয়তনের তারকাগুলোর মহাকর্ষ টানের ভারসাম্য রক্ষা করতে অধিক উত্তপ্ত হতে হয়। তারকাটির বাষ্পীয় অবস্থা বর্হিগমন চাপ বাড়াতে পারে। এতে অধিক জ্বালানি হাইড্রোজেন ব্যবহার করতে হয়। ফলে এসব তারকার জ্বালানি দশ কোটি বছরের মধ্যে শেষ হয়ে গেলে এরা কৃষ্ণগহ্বরে বা নিউট্রন তারকায় পরিণত হয়। তবে এসব তারকা সংকুচিত হওয়ার কালে ঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে হিলিয়াম, অক্সিজেন এবং কার্বনের মতো আরো ভারী মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটে। এসব অতিভরের বিরাট অঞ্চল নিয়ে চুপসে যাওয়ার কালে অনেক সময় মহাকর্ষের ভারসাম্য রক্ষায় অন্তস্থ্য বিরাট অঞ্চল নিয়ে বিস্ফোরণে বেরিয়ে আসে। এর ফলে মূল নীহারিকা কিছুটা ভারমুক্ত করে সংকট নিরসন করে। আর বিস্ফোরণে যে অংশ বেরিয়ে আসে এই বিচ্ছিন্ন অংশকে বলে সুপারনোভা (Supernova)। নীহারিকাটির সমস্ত তারকার তুলনায় এটা হয় সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল। এখন সুপারনোভার আবার বিস্ফোরণ ঘটলে বেরিয়ে আসা অংশকে বলে নোভা (Nova)। আমাদের সূর্য এমন যে সুপারনোভা বা নোভা থেকে বেরিয়ে আসা দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের তারকা। অতীতের সুপারনোভা বা নোভার ধ্বংসাবশেষ যুক্ত ঘূর্ণায়মান বায়বীয় পদার্থের চাঁই থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছর পূর্বে আমাদের সূর্য গঠিত হয়েছে। বায়বীয় পদার্থের প্রায় সবটাই লেগেছে সূর্যকে তৈরি করতে। আবার সূর্যের বিক্ষেপণ ক্রিয়ায় সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা বিচ্ছিন্ন ভারী মৌলযুক্ত গ্যাসীয় পিণ্ডগুলোই সূর্যের গ্রহ। সূর্যের মহাকর্ষ বলে আটকা পড়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এর মধ্যে আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ।

[The outer regions of the star may sometimes get blown off in a tremendous explosion called supernova, which should outshine all the other stars in the galaxy- Some of the heavier elements produced near the end of the stars life would be flung back back into the gas of the galaxy,- and would provide some of the raw material for the next generation of the stars . Our own sun contains about 2% of these heavier elements because it is a second or third generation star, formed some five thousand million years ago out of a cloud of rotating gas containing the debris of earlier supernovas. Most of the gas in the cloud went to form the sun or got blown away, but a small amount of the heavier element collected together to from the bodies that now orbit the sun or planet like the earth.

—(Brief History of time- Hawking- Page-126)]

www.pathagar.com

[তারকাটির বাইরের অঞ্চল অনেক সময় ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে যায়। এর নাম সুপার নোভা। নীহারিকাটির সমস্ত তারকার তুলনায় এটা হয় সবচাইতে উজ্জ্বল। তারকার জীবনকালের শেষ দিকে উৎপন্ন কিছু কিছু ভারী মৌলিক পদার্থ নীহারিকার গ্যাসের ভিতরে নিক্ষিপ্ত হয়। এগুলো হয় পরের প্রজন্মের তারকার কাঁচামাল। আমাদের সূর্য দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় প্রজন্মের তারকা। অতীতের সুপররনোভার ধ্বংসাবশেষযুক্ত ঘূর্ণায়মান গ্যাসীয় পদার্থের মেঘ থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছর পূর্বে আমার শূয় গঠিত হয়েছে। সেই জন্যে আমাদের সূর্যে অধিকতর ভারী মৌলিক পদার্থের অনুপাত প্রায় শতকরা দুই ভাগ। ঐ গ্যাসীয় পদার্থের অধিকাংশই লেগেছে সূর্যকে গঠন করতে আর বাকিটা উবে বেরিয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট অল্প পরিমাণ কিছু ভারী মৌলিক পদার্থ সংযুক্ত হয়ে কতগুলো বস্তুপিণ্ড তৈরি হয়েছে। সেগুলো এখন গ্রহ হয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী এরকম একটি গ্রহ]

বিগ-ব্যাং মডেলটি মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং বিবর্তনের ভালো তত্ত্ব। তত্ত্বটি থেকে আমরা সৃষ্টির আদি কারণ বিগ-ব্যাং (যদিও অনন্যতার বিষয়ে প্রশ্ন করা যাবে) পরবর্তী কয়েক সেকেণ্ড থেকে কয়েক ঘণ্টার বিকিরণ প্রধান যুগের একটা চিত্র পাই এবং প্রায় দশ লক্ষ বছর পর বিশ্বের বস্তু প্রধান যুগ শুরু হয়। বিশ্ব যতই শীতল হচ্ছিল তাপমাত্রা ততই কমছিল। ফলে ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় মহাকর্ষ বল বৃদ্ধি পায়। মহাকর্ষ বল হালকা প্রান্তকে টেনে অধিক ঘনত্বে পরিণত করে। সৃষ্টি হয় নীহারিকা বা নেবুলা (সামান্য ভারী কণা প্রোটন ও নিউট্রন)। নেবুলা থেকে অধিক ভরযুক্ত হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বনযুক্ত সুপারনোভা। সুপারনোভা থেকে নোভা। নোভা থেকে আমাদের সূর্য বা অন্যান্য তারকা। সূর্য থেকে গ্রহ, যার মধ্যে আমাদের পৃথিবী একটি। এর বিশেষত্ব হলো বিবর্তন ক্রিয়া। বস্তুসমূহের তাপমাত্রা হ্রাসের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভারী মৌলকণা যথা অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বনের পরমাণু সৃষ্টি হচ্ছে। প্রশ্ন থেকে যায় এর বাইরে ভারী মৌলকণা যেমন সোনা, তামা, লোহা, গন্ধক, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি যা আমরা পৃথিবীতে দেখি তা এলো কীভাবে? তাছাড়া আমাদের পরিবেশসহ জীবজগৎ উৎপত্তির কারণ কী? কীভাবে? এর উত্তরে হকিং যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এভাবে উপস্থাপন করা যায়— 'আমরা বিশ্বের যে প্রতিরূপ দেখতে পাই তাতে রয়েছে গ্যালাক্সি যা তারকার সমষ্টি। এছাড়া আছে গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জ নীহারিকা। আছে নিউট্রন তারকা, শ্বেতবামন তারকা ও কৃষ্ণগহ্বর। আরো আছে ধুমকেতু, উল্কাপিণ্ড, গ্রহ, উপগ্রহ। শতকোটি গ্যালাক্সি নিয়ে বিশ্ব আর তাতে আছে অগণন তারকা। কার্ল সাগানের মতে পৃথিবী পৃষ্ঠে যত বালুকণা আছে মহাবিশ্বের তারকার সংখ্যা তার চেয়েও বেশি। প্রতিটি তারকার আছে নিজস্ব গ্রহ ও উপগ্রহ যারা তারকাকে বিশেষ নিয়মে আবর্তন করে। একে বলা হয় প্লানেটরী সিস্টেম (Planetary system)। ছায়াপথ

www.pathagar.com

(Milky way) নামক গ্যালাক্সির সর্পিল বাহুতে (Spiral Arms) আমাদের তারকা, সূর্য। এর আছে প্লানেটরী সিস্টেম। যেখানে ৯টি গ্রহ সূর্যকে আবর্তন করছে। প্রতিটি গ্রহকে আবর্তণ করছে তাদের চাঁদ বা উপগ্রহ। পৃথিবী একটি গ্রহ যা সূর্যকে ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টায় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ। এই পৃথিবীতে রয়েছে পরিবেশ। আছে বায়ুমণ্ডল, মৃত্তিকা, সাগর, পাহাড়, নদ-নদী, খনিজ (তামা, লোহা, পানি, তেল, গ্যাস, সোনা, হিরক, গন্ধক, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি) গাছপালা প্রাণীজ এবং আছি আমরা। পৃথিবীর মতো পরিবেশ কোনো তারকায় থাকা সম্ভব নয় কারণ তারকা অতিউত্তপ্ত। কেবল যে সমস্ত গ্রহ শীতল; ঐ সমস্ত গ্রহে জীবজগৎ ও পরিবেশ থাকা সম্ভব। এখন পর্যন্ত এমন গ্রহের সন্ধান করা যায়নি। তবে যে শর্তে পৃথিবীতে জীব জগতের বিকাশ ঘটেছে সে সব শর্ত যে অন্য কোথাও নেই তা বলা যাবে না। কেবল তাই নয় যেসব বিধিতে আমাদের জীব জগত দৃশ্যায়ন, ভিন্ন গ্রহের কোনো জীব জগতের বিধি হতে পারে আমাদের মতো অথবা এর উল্টো বা বিপরীত।

আদিতে পৃথিবী বর্তমানের মতো শীতল ছিল না। তখন ছিল না গাছপালা, পাহাড়, সাগর, প্রাণী। সূর্যের জন্মের প্রায় ৫০ কোটি বছর পর সূর্য বা সুপারনোভা বা নোভার অন্তবিস্ফোরণে বেরিয়ে আসা অবশেষ (Debris) নিয়ে পৃথিবী নামক গ্রহের জন্ম। আদিতে পৃথিবী গ্যাসীয় অবস্থায় উত্তপ্ত ছিল। সূর্য বা নোভা থেকে ছিটকে আসা কিছু ভারী মৌল বহন করছিল (সূর্যের ১% ভারী মৌল এবং অবশিষ্ট হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং হালকা কণা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। সূর্য বা অধিক ভরের তারকা থেকে পৃথিবীর আয়তন ছিল অনেক কম। ফলে পৃথিবীকে কৃষ্ণগহ্বর বা শ্বেতবামনের মতো সঙ্কোচন দশায় পড়তে হয়নি। এছাড়া আদিম অবস্থায় পৃথিবী উত্তপ্ত থাকলেও তাপ সূর্যের মতো ছিল না। ফলে পৃথিবী অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়ায় ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন সমন্বয়ে ভারী মৌল গঠনের সুযোগ থাকে যা শক্ত পাথরে (Rock) পরিণত হয়। কালে পৃথিবী আরো শীতল হলো এবং বিভিন্ন প্রস্তর থেকে নির্গত হওয়া বায়বীয় পদার্থের সাহায্যে বায়ুমণ্ডল গঠন করল। সে অবস্থায় অক্সিজেন ছিল না। ছিল নানা ধরণের বিষাক্ত গ্যাস। তবে এ বায়ুণ্ডল ছিল বৃহৎ আবরণের মতো যার কেন্দ্র ছিল পৃথিবী। এ আবরণেও গ্যাসীয় অবস্থায় কিছু আদিম জীব বৃদ্ধি পেতে পারে। কালে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌলের সমন্বয়ে পৃথিবীর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। শত কোটি বছর এ অবস্থায় চলতে থাকে। এক পর্যায়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌলের যৌগ হিসেবে বায়ু মণ্ডলের বৃষ্টিপাত শুরু হয় যা কয়েক লক্ষ বা তারও বেশি সময় ধরে চলতে থাকে। কালে পৃথিবী উত্তপ্ত অবস্থা থেকে শীতল হবার ফলে তাপ, চাপ ও ভূকেন্দ্রস্থ অভিকর্ষে ভূ-পৃষ্ঠের অধিকাংশ চুপসে যায়; যা এখন সাগর। এ ছাড়া ভূ-অভ্যন্তরস্থ

www.pathagar.com

কম্পনে নরম ভূ-পৃষ্ঠ কোথায় স্ফীত হয়ে ওঠে যা পর্বৎ, পাহাড়, টিলা, মালভূমিতে পরিণত হয়। জলের ধারা প্রবাহে সৃষ্টি হয় নদ-নদী। নদ-নদী শুকিয়ে গেলে হয় খাল, বিল। আদিম অবস্থায় পৃথিবীর তাপমাত্রা যতই কমে আসছিল, ততই ভারী মৌল গঠনের কাজ চলছিল। এভাবে সোনা, রূপা, তামা, ব্রঞ্জ, কার্বন, তেল, লোহা ইত্যাদি মৌলিক পদার্থের আকর সৃষ্টি হচ্ছিল যা খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর এ বিবর্তন ক্রিয়ার সর্বশেষ স্তরে প্রাণের বিকাশ ঘটে। প্রাণীজ হিসেবে উদ্ভিদ ও জীবের বিকাশ সমকালীন বলে ধারণা করা হয়। তবে এদের বিকাশ ঘটে সাগরে, বিশেষ করে পানিতে। প্রাণ মূলত রাসায়নিক যৌগ যেখানে অক্সিজেন, কার্বন, লোহা বিভিন্ন প্রকার এসিড ইত্যাদির মৌলিক বস্তুর সমন্বয়। আদিম বিশ্বে সম্ভবত কতগুলো পরমাণুর আকস্মিক সমন্বয়ে কয়েকটি বৃহত্তর অবয়ব সৃষ্টি হয়েছিল। সেগুলোর নাম স্থূল অণু (Macromolecule)। এগুলো মহাসমুদ্র থেকে অন্যান্য পরমাণু সংগ্রহ করে সমরূপ অবয়ব গঠন করতে পারত। সুতরাং এভাবে তারা বংশ বৃদ্ধি ও বংশরক্ষা করতে পারত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্তান সৃষ্টিতে ভুল হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুলটা এমন হতো যে নতুন স্থূল অণুগুলো নিজেদের বংশ রক্ষা করতে সক্ষম হত না এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়। কিন্তু দুএকটি এমন ভুল হত; যার ফলে যে নতুন স্থূল অনু সৃষ্টি হত সেগুলো বংশ রক্ষা এবং বংশ বৃদ্ধিতে অধিক পটু। ফলে তাদের অবস্থা হত আরো একটু সুবিধাজনক এবং আদিম স্থূল অণুগুলোর পরিবর্তে নিজেদের প্রতিস্থাপন করার সম্ভাবনা থাকত। এভাবেই একটা বিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছিল। তার ফলে আরো জটিল থেকে জটিলতর আত্মজ সৃষ্টি করতে পারে এমন সক্ষম জীব বিকাশ লাভ করল। নানা পদার্থ আদিম জীবের ভক্ষণ ছিল। তার মধ্যে হাইড্রোজেন সালফাইড একটা। এরা অক্সিজেন পরিত্যাগ করত। এভাবে ধীরে ধীরে বায়ুমণ্ডল পরিবর্তীত হয়ে আধুনিক অবস্থায় পৌঁছেছে। এর ফলে উচ্চতর জীবের বিকাশ ঘটেছে। যেমন ঘাস, বৃক্ষ লতাদি, সরিসৃপ, স্তন্যপায়ী জীবন এবং সব শেষে আমরা।

সৃষ্টির বিকাশে বিগ-ব্যাং মডেলটি নিউ ডারউইনজমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ডারউইন তার অরিজিন অব স্পেসিস (Origine of species) গ্রন্থে কেবলমাত্র জীব জগতের বিবর্তন (Evolution) বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে বর্তমান বিজ্ঞান নিওডারউইনজম অনুসারী যেখানে জীবন বিকাশের পূর্বশর্ত হিসেবে গোটা মহাবিশ্বের বিবর্তন ব্যাখ্যা করে। বলা যায় Prior evolution of species with post one। জীবের বিকাশের পূর্বশর্ত ছাড়া কেবল পরবর্তী বিকাশ অসম্পূর্ণই নয় অসম্ভব। হকিং এবং তার অনুসারীরা সামগ্রিক বির্বতন ইতিহাসটিই বিশ্লেষণ করে চলেছেন।

তবে ডারউইনের এভেলুউশান বা বিবর্তনবাদ যেমন নানা প্রশ্নের সম্মুখীন; নিউডারউনইজমও সে অর্থে সমালোচিত। হকিং নিজেই এ প্রশ্ন তুলেছেন যা এ

www.pathagar.com

অধ্যায়ের শেষে বলা হয়েছে। একটি প্রশ্ন প্রায়শই তোলা হয় বিবর্তনবাদ যদি সঠিক হয় তাহলে বানর মানুষে পরিণত হচ্ছে না কেন? বা বানর থেকে মানুষ কথাটি অবিশ্বাস্য। এখানে আমরা যে ভুলটা করি তা হলো সঠিক অর্থে বিবর্তন ইতিহাস বুঝতে পারি না বা বুঝতে চাই না। ক্ষেত্র বিশেষে বোঝাতেও পারি না। মহাবিশ্ব বা জীব জগতের বিবর্তন একটি নদীর বিবর্তন ইতিহাসের মতো নয়। নদীর ভাঙনে গতিপথের পরিবর্তন, বা নদীর জন্ম মৃত্যু মাত্র কয়েক পুরুষের ঘটনা যা আমরা পূর্ব পুরুষের মুখে মুখে শ্রবণ করে নদীর পরিবর্তনে বিশ্বাস স্থাপন করি। কিন্তু মহাবিশ্বের বা জীবজগতের বিবর্তন হাজার, লক্ষ বা কোটি বছরের ধীরগতির পরিবর্তন। যা কেবল নিগূঢ় গবেষণায় প্রমাণ মেলে। আর একটি বিষয় ডারউইন কোথাও বলেননি যে মানুষ বানরের রূপান্তর হয়েছে। জৈব বিকাশে পানি আশ্রিত সাগরে অণু পরমাণু এবং যে জৈব যোগের সৃষ্টি হলো তা থেকে প্রাণের বিকাশ। যে প্রক্রিয়ায় মহবিশ্ব বিকিরণ প্রধান যুগ থেকে বস্তু প্রধান যুগের দৃশ্যায়ন ঘটালো সেই একই পদ্ধতি জৈব বিকাশের ক্ষেত্রেও। আদিতে যেমন কণা ও প্রতিকণার (particle and antiparticle) বিভাজন চক্র ছিল, সেই একই প্রক্রিয়ায় অনুবৎ একেকটি প্রাণীর (Species) বিভাজন ঘটছিল। এ বিভাজন ক্রিয়ায় কোটি কোটি আত্মজ বা প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলো এখন জৈবগুচ্ছ হিসেবে প্রাণিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের পাঠ্য। এরূপ একটি গুচ্ছ থেকেই বানর, শিম্পাজী, মানুষ জাতীয় উন্নত মস্তিস্কের প্রাণীর বিকাশ ঘটেছে। কোনোভাবেই মানুষ সরাসরি বানর বা শিম্পাজী বা ওরাংওটাং থেকে নয়। মানুষের মস্তিস্কের ক্রেটেনসিয়াল ক্যাপাসিটি ১৩৫০-১৫০০ cc। যেখানে শিম্পাজির ১২৫০cc। বানরের থেকে সামান্য কম। সভ্যতার বাহনে আরোহণকারী মানুষ নিজেদের মানুষ বলে দাবি করছে সে মানুষের আদিম ইতিহাস গৌরবের নয়। জাভা এপম্যান, পিকিংম্যান, ক্রোম্যাগনন ম্যান, নিয়ানডারথাল ম্যান এসব প্রজাতির শাখাগুলো বিবর্তন ক্রিয়ায় আধুনিক খাড়া মানুষের (খাড়া এ কারণে আদিম মানুষ দুই হাত দুই পায়ে ভর দিয়ে চলত) আবির্ভাব। মানব প্রজাতির বিকাশ ৪ থেকে ৫ লক্ষ বছর পূর্বে শুরু হলেও খাড়া মানুষের আবির্ভাব কেবল পনের হাজার বছর পূর্বে আফ্রিকার তাঞ্জিনিয়ায়। মানুষ এক সময় পাহাড়ের গুহায় বসবাস করেছে। কাঁচা মাংস ভক্ষণ করেছে। গাছের ছাল, পত্র পরিধান করেছে। মাত্র ৬ হাজার বছরের মধ্যে মানুষ মস্তিষ্ক ব্যবহারে এর প্রভূত উৎকর্ষতা সাধন করেছে আর বিগত তিন-চার শত বছরের মধ্যে অভাবনীয় চেতনায় মহাবিশ্ব কীভাবে শুরু হয়েছিল তার কারণ সন্ধান করছে।

সরলার্থে মহাবিশ্ব তথা মানব জাতির বিকাশ ধারাটি (হট বিগ-ব্যাং মডেল অনুসারে) নিম্নরূপ—মডেলটি জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান অনুসৃত লেখক কর্তৃক উপস্থাপন তবে হকিং হট বিগ-ব্যাং

www.pathagar.com

একক অনন্যতা One Singularity	আয়তন শূন্য কিন্তু ভরশক্তি অসীম
অনন্যতায় মহাবিস্ফোরণে মহবিশ্বের তথা কালের শুরু	তাপমাত্রা অসীম। ১৩.৭ বিলিয়ন বা তের শত ৭০ লক্ষ বছর পূর্বে বিগ-ব্যাং-এ মহাবিশ্বের শুরু
বিকিরণ প্রধান যুগ Radiation Domineted Era	কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক ঘণ্টার সম্প্রসারণ। তাপমাত্রা ১০০০ কোটি ডিগ্রি। ফোটন ও নিউট্রিনো কণার বিকিরণ
বস্তুপ্রধান যুগ Matter Dominated Era	তাপমাত্রা শতকোটি ডিগ্রি। ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন কণা ও প্রতিকণা
নেবুলা	তাপমাত্রার হ্রাস। কণা প্রতিকণায় আচ্ছন্ন বাস্পীয় মেঘ
তারকার গঠন	মহাকর্ষ বলে অঞ্চল ভিত্তিক চুপসে যাওয়া। প্রোটন, ইলেক্ট্রন, ভারী মৌল, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, বেরিলিয়াম, লিথিয়াম।
সুপারনোভা	মহাকর্ষ টানের সঙ্কট এড়াতে বিরাট আয়তনের তারকায় বিস্ফোরণ। অংশত বেরিয়ে অতি উজ্জ্বল তারকা। তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া ভারী মৌল গঠনের সম্ভাবনা
নোভা	সুপারনোভা বিস্ফোরণে অংশত বেরিয়ে আসা। তাপমাত্রা হ্রাস। উজ্জ্বল তারকা। অধিক হারে পরমাণু গঠন। তারকার সমাবেশে গ্যালাক্সি বা আমাদের ছায়াপথ
সূর্য	নোভা বিস্ফোরণে অংশত বেরিয়ে সুস্থির তারকা। বর্তমান বয়স ৫০০ কোটি বছর। তাপমাত্রা ৬০০০ ডিগ্রি ভারী মৌল গঠনে নিউক্লিয়াস। হাইড্রোজেন, হিলিয়ামে তাপ বিকিরণ
সৌরজগৎ	নোভা থেকে বিস্ফোরিত অংশ বেরিয়ে প্রায় ৪৫০ কোটি বছর পূর্বে গ্রহ ও উপগ্রহ। সূর্যের মহাকর্ষ ফাঁদে আটকে পড়া। আপন আপন কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ
পৃথিবী	নোভা থেকে নিয়ে আসা ভারী মৌল। শীতল হওয়ায় মৌলিক পদার্থের পরমাণু গঠন এবং ঘন হয়ে যাবতীয় মৌলিক পদার্থ। রাসায়নিক পদ্ধতিতে দৃশ্যমান বস্তু গঠন। বায়বীয় পদার্থ তথা জৈব বিকাশ
পৃথিবীতেই জীব কেন?	মহাবিশ্বের বিবর্তনে শীতল অবস্থায় নানা মৌলিক পদার্থে পরমাণু গঠন। সূর্য থেকে দূরত্বের এক্সেনট্রিটের পরিমাণ। পানির উপস্থিতি। পরিবেশ। সবকিছু মিলে মহাবিশ্বের স্বর্ণাবৃত অঞ্চলে (Gold look zone) আছে
তাহলে কি আমরা মহাবিশ্বের বিবর্তনে তারকার উপাদান সমষ্টির ফসল	বর্তমান কালের ভুবনজয়ী বিজ্ঞানী কার্ল সাগান তার 'কসমস' গ্রন্থে একথাই বলেন, We are Star Stuff. Page- 69*

মডেলে মহাবিশ্বের এ চিত্র নিয়ে মন্তব্য করেছেন এভাবে—'মহাবিশ্ব অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থা থেকে প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শীতলতর হয়েছে, মহাবিশ্বের এই চিত্রের সাথে পর্যবেক্ষণগত মিল রয়েছে। তবুও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি—

> The picture of a universe that started off very hot and cooled as it expanded is in agreement with all the observational evidence that we have to-day-Nevertheless it leaves a number of important question unanswerd.
>
> —(Brief History- page- 127)

যে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর বিগ-ব্যাং মডেলে নেই তা হলো—

(১) যে অনন্যতায় মহাবিস্ফোরণ (Big-Bang) সে অনন্যতা কোথা থেকে? বিগ-ব্যাং এর পূর্বাবস্থার ব্যাখ্যা কী?

(২) আদিম বিশ্ব কেন অত উত্তপ্ত ছিল? অনন্যতায় তাপ কেন?

(৩) মহাবিশ্বের যেদিকে তাকানো যায় (বৃহৎ স্থানে) সব দিক থেকে তা একই রকম দেখায় কেন? মহাবিশ্ব যে সবদিক থেকে একই রকম তার প্রমাণ মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ গুঞ্জন সবদিক থেকে একই হারে ধরা দেয় (পেনজিয়াস-উইলসনের গবেষণা)। আদিম বিশ্বের সর্বত্র একই উত্তাপ ছিল। আদিম মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল কাছাকাছি ছিল। কিন্তু কালে মহাবিশ্ব বিস্তৃত হয়ে যে প্রতিরূপ (বর্তমান বিশ্বের অবয়ব) গ্রহণ করল সে ক্ষেত্রে আলোকের গতির সাথে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আলোক সকল স্থানে পৌছাতে যদি সময় না পায় তাহলে কীভাবে সম উত্তপ্ত হবে? আর সম উত্তপ্ত না হলে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ একই রকমভাবে আসা উচিত নয়। ফলে মহাবিশ্বের বর্তমান সমরূপ মডেলগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একই সাথে আদিম মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের একই তাপমাত্রা হওয়ার কোনো কারণ দেখা যায় না।

(৪) মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ একটি ক্রান্তিক হার (Critical Rate) মেনে চলে। এই হারটি যথেষ্টভাবে নির্ধারিত। মহাবিস্ফোরণের এক সেকেন্ড পর যদি সম্প্রসারণ হার এক লক্ষ মিলিয়ন মিলিয়ন (১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০) কম হত তাহলে মহাবিশ্ব বর্তমান অবস্থায় পৌছানোর আগেই চুপসে যেত। সে ক্ষেত্রে কোনো কিছুরই বিকাশ ঘটত না। সম্প্রসারণের এই ক্রান্তিক হার কেন, যার ফলে প্রায় ১৩০০ কোটি বছর ধরে কেবল সম্প্রসারিত হচ্ছে?

(৫) অবশ্য বৃহদাকার দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় মহাবিশ্ব খুবই সমরূপ

www.pathagar.com

এবং সব স্থান একই রকম। তা সত্ত্বেও স্থানের অনিয়ম আছে। যেমন কোথাও তারকা, নীহারিকা ইত্যাদি। মনে করা যায় আদিম মহাবিশ্বের আঞ্চলিক ঘনত্বের পার্থক্যের জন্য এমন হয়েছে। ঘনত্বের এই হ্রাস-বৃদ্ধি হলো কেন?

উল্লেখিত প্রশ্নের আলোকে বিগ-ব্যাং মডেলটি যথেষ্ট আলোচনা ও সমালোচনার সম্মুখীন। সাধারণত মহাবিশ্বের বৃহৎ আকার দৃশ্যায়ন এবং সৃষ্টির কারণ সন্ধানে আমাদের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সাধারণ ভাবেই সৃষ্টির এ ভারটি স্রষ্টার ওপর ছেড়ে দিয়ে ভারমুক্ত হই। কিন্তু বিজ্ঞান এর মধ্যে এমন কিছু বিধির সন্ধান পেয়েছে যাতে মনে হয় এমন বিধির দ্বারা সৃষ্টির আদি কারণের সন্ধান লাভ সম্ভব। এখানে আইনস্টাইনের অপেক্ষবাদ বা সূত্রসমূহের পরীক্ষা, নীরিক্ষা ও গবেষণার ফলাফল আমাদের দারুণভাবে আশাবাদী করে তোলে। এ তত্ত্ব পরমকালের বিলুপ্তি ঘটায়। কাল হয়ে ওঠে ঘটনানির্ভর। কারণের বিধিতে ঘটনার পশ্চাতে থেকে যেতে আমাদেরকে প্রথম ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় যেখান থেকে কালের তথা মহাবিশ্বের শুরু হয়েছিল। এছাড়া মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য, উপাত্ত সাক্ষ্য দেয় মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল। মহাবিশ্বের যদি সম্প্রসারণই ঘটে তাহলে সম্প্রসারণের একটি আরম্ভ থাকতে হবে, যেখানে মহাবিশ্ব সংহত ছিল। এছাড়া মহাবিশ্বের একটা ভালো বিবর্তন ইতিহাস আমরা পাই যা থেকে স্পষ্টতই প্রতিয়মান হয় যে মহাবিশ্ব বিধি অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে বিকাশ লাভ করেছে।

মহাবিশ্বের আরম্ভের অনিবার্যতায় বিগ-ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ (কথিত উত্তপ্ত মহাবিস্ফোরণ বা হট বিগ-ব্যাং মডেল) তত্ত্বের বিকাশ, মহাবিশ্ব কোথা থেকে? কেন? কীভাবে? এর উত্তরে তত্ত্ব অনুসারে একক অনন্যতা (Singularity) অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু অনন্যতা কোথা থেকে বা কেন? এর উত্তর তত্ত্বভিত্তিক পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ তা এক অসীমত্বরূপ শূন্য সংগঠন, যেখান থেকে কোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তত্ত্বগুলো এখানে এসেই শেষ হয়ে যায়। এ কারণেই বিগ-ব্যাং তত্ত্ব উল্লেখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে ব্যর্থ।

বিগ-ব্যাং তত্ত্বটি মূলত বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়মে একটি প্রকল্প (Hypothesis) যা মহাবিশ্বকে সীমানায় (Boundary) আবদ্ধ করেছে। এর অতীত সীমানায় মহাবিশ্বের শুরু আর ভবিষ্যত সীমানায় প্রকল্প অনুসারে একটি পরিণতি থাকতেই হবে। প্রকল্পটির শুরু বিগ-ব্যাং অনন্যতায়। অনন্যতার পূর্বের অবস্থা বা সংবাদ বিজ্ঞান জানে না। আবার পরিণতির বিষয়টিও তত্ত্বটির গণনার বাইরে। তবে অন্তর্বর্তী বিকাশমান বিশ্বকে নিয়ে তত্ত্বটি গবেষণা করছে, যা বোঝা যায়। কেবল বোঝাই যায় না, বিধি অনুসারে তা ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু কিছু প্রশ্নের উত্তর তত্ত্ব

www.pathagar.com

দিতে পারে না। ফলে প্রকল্পটি মহাবিশ্বের সৃষ্টির পূর্বের না বোঝা বিষয়কে বাদ রেখে কেবল বোধের অংশটুকুর ব্যাখ্যা দেয়।

তাহলে সৃষ্টির বিষয়টি কি অনিশ্চিত? বিজ্ঞানে অনিশ্চয়তার বিধি ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞান কি অনিশ্চয়তার নিরিখেই একগুচ্ছ বিধি আবিষ্কার করেছে? বিধিগুলোর বিশেষত্ব কী এমন যে তা জানা গেলে সৃষ্টির আদি ইতিহাস জানা যাবে? বিষয়টি কি এমন যে শুরুতে এগুলো ঈশ্বরের (God) বিধান হতে পারে? এরপর তিনি মহাবিশ্বকে বিধিগুলো অনুসারে বিবর্তিত হওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন? যেখানে তিনি আর হস্তক্ষেপ করেন না।

তবে সে ক্ষেত্রেও ঈশ্বর একটি প্রাথমিক অবস্থা বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু তা কীভাবে? ঈশ্বর কেন মহাবিশ্বের এমন প্রাথমিক অবস্থা বেছে নিলেন যা আমাদের বোঝার আশা নেই। আবার কেনই বা তিনি এমন বিধি অনুসারে এর বিবর্তনের স্বাধীনতা দিলেন যা আমাদের বোঝা সম্ভব? বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ ইতিহাস হলো ঘটনাগুলো বিশেষ অন্তর্নিহিত নিয়মে ঘটে। এলোমেলো ভাবে তা ঘটে না। এ নিয়মগুলো ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে আবার নাও সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

> "These laws may have originally been decreed by God, but it appears that He has since left the universe to evolve according to them and does not now intervene in it. But how did he choose the initial state or configuration of the universe? What were the 'boundary' condition at the beginning of time? One possible answer is to say that God chose the initial configuration of the universe for reason of that can not hope to understand. This would certainly have been within the power of an omnipotent being, but if He has started it off in such incomprehensible way? Why did He chose to let evolve according to law that we could understand? The whole history of science has been the gradual realization that events do not happen arbitrary manner but that they reflect a certain underlying order which may or may not be divinely inspired. It could be only natural to suppose that this order should apply not only to the laws but also to the conditions at the boundary of the apace-time that specify the initial state of the universe. —Brief History- Page-129'
>
> [শুরুতে এগুলো ঈশ্বরের বিধান হতে পারে। কিন্তু মনে হয় তার পর থেকে তিনি মহাবিশ্বকে ঐ বিধিগুলো অনুসারে বিবর্তিত হওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তিনি আর এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু কীভাবে মহাবিশ্বকে প্রাথমিক অবস্থা কিংবা গঠন নির্বাচন করেছিলেন? কালের সীমান্তে (মহাবিশ্ব সৃষ্টির আরম্ভে)

www.pathagar.com

গঠন কীরূপ ছিল? একটি সম্ভাব্য উত্তর হল — ঈশ্বর কেন মহাবিশ্বের এই প্রাথমিক গঠন বেছে নিয়েছিলেন যেটা আমাদের বোঝার আশা নেই। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষে নিশ্চয়ই সেটা সম্ভব ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা তিনি কেন এমনভাবে শুরু করলেন যা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আবার কেনইবা তিনি এর বিধি অনুসারে এমন বিবর্তনের স্বাধীনতা দিলেন যা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব? বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ ইতিহাস হল ধীরে ধীরে এই বোধ জাগ্রত হওয়া যে ঘটনাগুলো এলোমেলো ঘটে না, সেগুলো একটা অন্তর্নিহিত নিয়মের প্রতিফলন। সে নিয়মগুলো ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় হতে পারে আবার নাও সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে এ নিয়ম কেবল বিধিগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। মহাবিশ্বের আদিম অবস্থার স্থান কালেও তা প্রযোজ্য]

হকিং বিগ-ব্যাং এর সীমাবদ্ধতায় মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থার অনেকগুলো ব্যাখ্যা বা মডেল থাকতে পারে, এ বিষয়ের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও পরিণতির বিধি অনুসৃত আরো কয়েকটি মডেল উপস্থাপন করেছেন। এর মধ্যে একটি সম্ভাবনা হলো 'শৃঙ্খলাহীন সীমানা অবস্থা' (Chaotic Boundary condition)। এর অর্থ মহাবিশ্ব কোনো অনন্যতা থেকে নয়, তা সুবিন্যস্ত বিশেষ অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রস্তাবনায় একটি অনুমান এরকম যে মহাবিশ্ব হয় অসীম অথবা অন্তহীন সংখ্যক মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে। অন্তহীন সংখ্যক মহাবিশ্বের অর্থ প্রায় দশ হাজার কোটি তারকা নিয়ে একটি গ্যালাক্সি। এরূপ শতকোটি গ্যালক্সি নিয়ে একটি মহাবিশ্ব। এরূপ অগণন মহাবিশ্বের স্বরূপ হলো সীমানাহীন মহাবিশ্ব যা মাল্টিভার্স (Multiverse) তত্ত্ব বলে হকিং মত ব্যক্ত করেন। এরূপ অন্তহীন মহাবিশ্বের মধ্যে আমাদের মহাবিশ্বকে খুঁজে পাওয়া সুশৃঙ্খলাবিহীন মহাবিশ্বের চিন্তনের ফলাফল। বৃহৎ অর্থে মহাবিশ্ব বলতে যা বোঝায় তা হয়ত ছিল বিশৃঙ্খল। স্থূল সৃষ্টিতে সৌরজগতসহ দূর আকাশের তারকামণ্ডলী এবং আমাদের চারপাশের জগতকে শৃঙ্খলায় মনে হয়। বাস্তবত এর বিশৃঙ্খলা (Entropy) বেশি। যে কারণে আমাদের ঘরবাড়ি আসবাবপত্র প্রতিনিয়তই মেরামত করতে হয়। তবে এরকম বিশৃঙ্খল প্রাথমিক অবস্থা থেকে কী করে মসৃণ এবং নিয়বদ্ধ বিশ্ব সৃষ্টি হলো এ তত্ত্ব অনুযায়ী তা বোঝা কঠিন। তবে ধারণা করা যায় মহাবিশ্ব যদি অসীম এবং এর সংখ্যা অন্তহীন হয় তাহলে সম্ভবত এমন কতগুলো বৃহৎ অঞ্চল থাকবে যেগুলো হয়েছিল মসৃণ ও সমরূপভাবে। মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে, আমরা এখন একটি অঞ্চলে রয়েছি, সেটা ঘটনাক্রমে মসৃণ ও নিয়মবদ্ধ? যেখানে আমাদের মতো জীবের বিকাশ ঘটেছে। যারা প্রশ্ন করতে পারে বিশ্ব এরকম কেন? বা আমরা এখানে কেন? উল্লেখিত প্রশ্নের সরল উত্তর 'আমরা এখানে আছি তাই বিশ্ব এমন'। অর্থাৎ বিশ্ব সে সাথে আমাদের বিকাশ ঘটবে বলেই বিশ্ব এমনভাবে এসেছে। বিশ্ব

www.pathagar.com

অন্যরকম হলে আমরা থাকতাম না। ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলিম ধর্মমতে ঈশ্বর বা স্রষ্টা জগত সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য। মানুষের চেতনা ও স্রষ্টার প্রতি অনুগত ও প্রার্থনার জন্য। হকিং এ চিন্তনকে অবুঝ মনের বুঝ (যেহেতু বোঝা যায় না, তাহলে এভাবে বুঝি) বলে মন্তব্য করেছেন এবং একে সাধারণ মনের অভিব্যক্তি (Anthropic Principle) বলে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত বিশ্বের বিধিগুলো এতটাই সুবিন্যস্ত যে এর সকল রহস্যের দ্বার উন্মোচন সম্ভব। কারণ অনেক দ্বার এরই মধ্যে খোলা গেছে। অ্যানথ্রপিক নীতির বিপরীতে হকিং বলেন—

> The objection to the strong anthoropic principle is that it is against the tide of the whole history of science. We have developed from the geocentric cosmologies of Ptolemy his the forebears through the heliocentric cosmology of Copernicus and Galileo, to the modern picture in which the earth is a medium sized planet orbiting around an average star in the outer suburbs of an ordinary spiral galaxy. Which is itself only one about million and million of galaxies in the observable universe? Yet the anthropic principle would claim that this whole vast construction exists simply for our sake. This is very hard to believe. Our solar system is certainly prerequisite for our existence, and one might extend this to the whole of our galaxy to allow for an earlier generation of stars that created the heavier elements. But there does not seem to be any need for all those other galaxies, nor for the universe to be so uniform and similar every direction on large scale.
>
> [মানুষের এরূপ ভাবনার (anthoropic principle) আপত্তি হল এরূপ ভাবনার বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ ইতিহাসের স্রোতের বিরুদ্ধে। আমরা প্রবেশ করেছি টলেমি এবং তার পূর্বগামীদের পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্ব থেকে কপারনিকাস ও গ্যালিলিওর সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বে যা আধুনিক মহাবিশ্বের চিত্র। পৃথিবী একটি সাধারণ সর্পিল (spiral) গ্যালাক্সির প্রান্তিক অঞ্চলে একটি সাধারণ তারকাকে প্রদক্ষিণরত মাঝারী আকারের গ্রহ। এই গ্যালাক্সির পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের এক লক্ষ কোটি গ্যালক্সীর ভিতর একটি। তবুও সাধারণ মানুষের মনের দাবি এই বিরাট সংগঠনের অস্তিত্ব শুধু আমাদেরই জন্যে। এটা বিশ্বাস করা খুব শক্ত। আমাদের সৌরজগত অবশ্যই আমাদের অস্তিত্বের একটি পূর্বশর্ত এবং পূর্ব প্রজন্মের যে তারকাগুলো ভারী মৌলিক পদার্থ তৈরি করেছিল সেইগুলোর প্রয়োজন ছিল। সেই জন্য আমরা এই সূর্য শত গ্যালক্সীসমূহ অবধি বিস্তার করতে পারি। কিন্তু এত বেশি গ্যালাক্সির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এছাড়া মহাবিশ্ব সব দিক থেকে সমরূপ (Uniform) হবে কেন?]

www.pathagar.com

মহাবিশ্ব কেন এবং এর গঠন এমন কেন যার কিছু বোঝা যায় আবার কিছু বোঝা যায় না। মহাবিশ্বের বিবর্তন ভালো বোঝা যায়। মহাবিশ্বকে নিয়ে আমাদের চিন্তা, চেতনা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণে যে সব বিজ্ঞানসম্মত মডেল প্রস্তুত হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা এখন বিশ্বাস করি না, সূর্য পৃথিবীকে আবর্তন করে তাই দিন আর রাত আসে। আমরা বিশ্বাস করি পৃথিবীটা তার অক্ষে ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে একবার পাক খায় তাই দিন আর রাত আসে। আবার পৃথিবী আপন কক্ষপথে সূর্যকে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় সূর্যকে আবর্তন করে। কেবল পৃথিবীটাই নয় এরূপ নয়টি গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তন করছে। এভাবে আমরা সৌরজগতের একটি মডেল প্রস্তুত করেছি যা আমাদের জ্ঞান বিকাশ ও জ্ঞান অনুশীলনের পাঠ ও পাঠ্য।

কিন্তু মানব মনের নিগূঢ়তম প্রশ্ন বিশ্ব কোথা থেকে এবং কীভাবে তা আমাদের তাড়িত করে। বিগ-ব্যাং মডেলটি বিশ্বের বিবর্তনের ভালো ইতিহাস। কিন্তু বিশ্বের শুরুতে অনন্যতার কারণ কী? বিশ্ব এমন সমরূপ কেন যে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ সবদিকে সমান? মহাবিশ্ব বিকশিত হলো বিগ-ব্যাংএ। এরপর তার সম্প্রসারণের পালা। সম্প্রসারণ না হলে বিশ্ব বিকাশলাভ করত না। আবার সম্প্রসারণের হার যদি সংকোচনের হার থেকে সামান্য কম (Critical বা ক্রান্তিক হার) হত তাহলেও মহাবিশ্ব চুপসে যেত বা সংকুচিত হত—

> The initial expansion of the universe also would have to be chosen very proudly for the rate of expansion still to be so close to the critical rate needed to avoid re collapse. This reasons that the initial state of the universe must have been very carefully chosen indeed of the hot big-bang model was correct right back to the beginning of time. It would be very difficult to explain why the universe should have begun in just this way, except as the act of god who intended to create being like us.
>
> —(Brief History- page-133-134)
>
> [মহাবিশ্ব আবার চুপসে যাওয়া এড়ানোর জন্যে সম্প্রসারণের যে ক্রান্তিক (critical) হার প্রয়োজন, বাস্তবে সম্প্রসারণের হার এখনো তার এত কাছাকাছি যে সম্প্রসারণের প্রাথমিক হার খুবই নিখুঁতভাবে নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল। এর অর্থ হলো উত্তপ্ত মহাবিস্ফোরণে প্রতিরূপ যদি কালের আরম্ভ থেকেই হয় তাহলে শুরু মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা খুবই সতর্কভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। মহাবিশ্ব কেন এভাবে শুরু হয়েছিল এ তথ্য ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে একজন ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করার ইচ্ছায় এভাবে কাজ করেছিলেন]

www.pathagar.com

বিগ-ব্যাং মডেলে যেমন একক অনন্যতার বিষয়ে এক ঘোর সৃষ্টি হয় সেখানে সাধারণ তত্ত্বগুলো ব্যাখ্যা দিতে অপারগ হয়, তেমনি শৃঙ্খলাহীন মডেলটিও নানা প্রশ্নের সম্মুখীন। উভয় তত্ত্ব বিবর্তনের ভালো ইতিহাস বহন করে কিন্তু আদিম অবস্থার কারণ বিশ্লেষণে অপারগ। এ অবস্থায় আরও একটি মডেল হকিং উপস্থাপন করেছেন। এটি হলো 'অতিস্ফিতি' বা ইনফ্লেশনারী (Inflationary) মডেল।

ম্যাচাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির বিজ্ঞানী এলান গুথ (Alan Guth) এ মডেলের প্রবক্তা। তার চেষ্টা ছিল মহাবিশ্বের এমন একটি প্রতিরূপ অন্বেষণ করা, যে প্রতিরূপের বহু প্রাথমিক আকার ছিল। যে সব আকার বিবর্তনের ফলে আধুনিক মহাবিশ্বের মতো একটি বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। তার ধারণা আদিম মহাবিশ্ব অনেকগুলো আকারে অতিদ্রুত সম্প্রসারণের কালের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। এই সম্প্রসারণকে বলা হয় অতিস্ফিতি। গুথের মতে এখন যেমন সম্প্রসারণের হার হ্রাস পাচ্ছে, এক সময় সে রকম না হয়ে সম্প্রসারণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মতে এক সেকেন্ডের সামান্য মাত্র ভগ্নাংশ কালের ভিতরে মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন (একের পৃষ্টে ত্রিশটি শূন্য) বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতিস্ফিতি তত্ত্ব অগণিত বিশ্বের প্রস্তাবনা করে যেখানে অনন্যতার পরিবর্তে কেবল অগণিত বিশ্বের স্ফিতির কথা ব্যক্ত হয়েছে। স্বাভাবিক প্রশ্ন দেখা দেয় তা হলে মহাবিশ্বের যে অঞ্চলে আমরা বাস করি সে অঞ্চলে দশ মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন, কণিকা রয়েছে এগুলো এল কোথা থেকে? এর উত্তর দিচ্ছে কোয়ান্টাম বা কণাবাদী তত্ত্ব। কণাবাদী তত্ত্ব অনুসারে শক্তি থেকে কণা ও প্রতিকণার (Particle and Antiparticle) জোড়ায় কণিকা তৈরি হয়। এখানেও একটি প্রশ্ন এসে যায় শক্তি এল কোথা থেকে? আইনস্টাইনের ভরশক্তির সূত্র অনুসারে বিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ শূন্য। মহাবিশ্বের পদার্থ সৃষ্টি হয় পরাশক্তি (Positive) থেকে। আবার মহাকর্ষের রয়েছে একটা অপরাশক্তি (Negative) (সূর্য ও পৃথিবী পরস্পর মহাকর্ষবলে যুক্ত। এদের বিচ্ছিন্ন করতে শক্তির প্রয়োজন হয়। ফলে এক অর্থে মহাকর্ষের রয়েছে অপরাশক্তি)। মহাবিশ্বের যে স্থান মোটামুটি সমরূপ তার ক্ষেত্রে দেখান যেতে পারে পরাশক্তির পরিমাণ অপরা মহাকর্ষীয় শক্তি দ্বারা নির্ভুলভাবে বাতিল হয়। সুতরাং মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ শূন্য। অতিস্থিতিমান এ তত্ত্বের সাহায্যে দেখান যেতে পারে শূন্য থেকে অগণিত মহাবিশ্বের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু হকিং নানা তথ্য উপাত্ত দ্বারা এ তত্ত্বকে বর্তমানে মৃত বলে মন্তব্য করেছেন। সে সাথে তিনি একথাও বলেন, 'তাহলে কি আমাদের

www.pathagar.com

আবার সে কথাতেই ফিরে যেতে হয় যেখানে আমরা বিশ্বাস করি এ বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে কেবল আমাদের অস্তিত্বের জন্যে। এমন অবস্থায় হতাশা—মনে হয় মহাবিশ্বকে বোঝার সব আশা শেষ হয়ে যায়।

মহাবিশ্বের বিরাটত্ব ভেবে আমরা শিহরিত হই। প্রকৃতি তথা গ্রহ, নক্ষত্র, জীবজগৎ সবই রহস্যের জাল বোনে আমাদের মনে। আমরা এর রহস্য ভেদ করতে চাই। সব রহস্যের সমাধান যদি আকাশ কুসুম ভেবে মিলাতে চাই তাহলে আর কারণ জানার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এরই মধ্যে এমন সব তত্ত্ব, তথ্য ও বিধি জেনে ফেলেছি তা থেকে আমরা বিশ্বের আদি রূপায়নের ক্ষেত্রে আশাবাদী। এক্ষেত্রে একমাত্র নির্ভরতা বিজ্ঞানের মডেল প্রস্তুতিতে, কারণ বিজ্ঞানের সেসব মডেলই বিশ্বের অংশত রহস্য আমরা উন্মোচন করেছি। যেমন সৌরজগতের মডেল, মহাকর্ষীয় তত্ত্বের মডেল, কণাবাদী তত্ত্বের মডেল, জৈব বিকাশে বিবর্তন মডেল ইত্যাদি। মহাবিশ্ব কীভাবে শুরু হওয়া উচিত ছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হলে এমন বৈজ্ঞানিক মডেল বা বিধি প্রয়োজন যাকে শুরুতে সঠিক ও সত্য ছিল। আলোচিত 'অনন্যতার বিগ-ব্যাং তত্ত্ব', 'শৃঙ্খলাহীন সীমানা তত্ত্ব', 'অতিস্ফিত তত্ত্ব' নানা প্রশ্নের সম্মুখীন। এ বিষয়ে হকিং এর তাত্ত্বিকতা স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ববাদ এর মধ্যে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব পরমকালের (পরমকাল অর্থ ঘটনা কালকে প্রভাবিত করে না। ঘটনার মতো কাল নিরপেক্ষ) বিলুপ্তিতে কালের শুরু বা মহাবিশ্বের শুরু অনিবার্য করে। অন্যদিকে তার ব্যাপক অপেক্ষবাদ তত্ত্ব মহাকর্ষ বলে স্থান ও কালের অসীম বক্রতায় (curvature) একক অনন্যতা নির্দেশ করে। তবে এ অনন্যতা কেন ও কোথা থেকে সে বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। এ প্রশ্নে তত্ত্বটি ভেঙে পড়ে। হকিং আশাহত নন। তিনি অনন্যতার ক্ষেত্রে কণাবাদী বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রয়োগে নতুন ফলাফলের অপেক্ষায়। একক অনন্যতায় কোয়ান্টাম প্রভাব থাকতেই হবে (যা কৃষ্ণগহ্বর অত কালো নয় অধ্যায়ে জানা গেছে)। ফলে হকিং আপেক্ষিক ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের ঐক্যবদ্ধতায় (unification) 'কোয়ান্টাম গ্রাভিটি (Quantum gravity) তত্ত্বের প্রস্তাব করেন। এ তত্ত্বের প্রয়োগে দেখা যাবে বিশ্বের শুরুও নেই শেষও নেই। বিশ্ব ছিল, আছে এবং থাকবে। বিশ্ব যদি চির অস্তিমান হয় তাহলে অনন্যতা বিষয়ক জটিলতা পরিহার করা যায়। কারণ সেখানে কোনো অনন্যতার প্রয়োজন হবে না। এখানেও যে প্রশ্নটি থাকে তা হলো বিশ্বের যে বিবর্তন এ যাবৎ আলোচিত হল তা কী মিথ্যা? বিবর্তন থাকলে তার একটা কিনারা (Boundary) বা শুরু থাকতেই হবে। এখানে উপায় কী? আমরা হকিং এর কোয়ান্টাম গ্রাভিটি তত্ত্বে সে বিষয়টিই দেখবো।

www.pathagar.com

In order to predict how the universe should have started off one needs laws that hold in the beginning of time. The classical theory of general relativity was correct, the singularity theorems that Roger Penrose & proved show that the beginning of time would have been a point of infinite densely and infinite curvature of space-time. All the know laws of science would break down at such a point. One might suppose that there were new laws that hold at singularity but it would be very difficult even to formulate such laws at such badly behaved, and we would have no guide from observation as to what those laws might be. However what the singularity theorems really indicates that the gravitation field becomes so strong that quantum gravitational effect becomes important classical theory in no longer a good description of the universe. So we have to use a quantum theory of for the ordinary laws of the science to hold everywhere, including at the beginning of time, it is not to necessary to postulate new laws of singularity because there need not be any singularity in the quantum theory.

— Brief History—page-141]

"মহাবিশ্বের কীভাবে শুরু হওয়া উচিত ছিল সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হলে এমন বৈজ্ঞানিক বিধি প্রয়োজন, যে বিধি কালের আরম্ভে সঠিক ছিল। ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব ব্যাপক অপেক্ষবাদ (আইনস্টাইনের সাধারণ অপেক্ষবাদ তত্ত্ব) যদি সত্য হয় তাহলে রজার পেনরোজের প্রমাণিত অনন্যতা (Singularity) উপপাদ্য থেকে দেখা যায় কালের প্রারম্ভ এমন একটি বিন্দু সে বিন্দুতে ঘনত্ব ছিল অসীম এবং স্থান কালের বঙ্কিমতাও ছিল অসীম। সে বিন্দুতে বিজ্ঞানের জানা সকল তত্ত্বই ভেঙে পড়বে (প্রয়োগ সম্ভব নয়)। অনুমান করা যেতে পারে অনন্যতার সময় নতুন বিধি ছিল কিন্তু সে সমস্ত বিধির আচরণ কোনোভাবেই মানা সম্ভব নয় এবং বিধি গঠন করা খুবই কঠিন। সে বিধিগুলো কীরকম হওয়া উচিত সে সর্ম্পকে কোনো ইঙ্গিত আমরা পর্যবেক্ষণ থেকেও পাই না। তবে অনন্যতা উপপাদ্যগুলো জানান দেয় সে অবস্থায় মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রগুলো (মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র বলতে বোঝায় বৃহৎ ভরের বস্তুর মহাকর্ষীয় বল স্থানের যে পরিধি বিস্তার করে আছে। পৃথিবী তার নির্দিষ্ট পরিধিতে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করে আছে) এতই শক্তিশালী হয় যে কোয়ান্টাম মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়া (অসীম মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রে কণাবাদীতার প্রভাব। যেমন কৃষ্ণগহ্বরে বিকিরণ) গুরুত্ব লাভ করে। ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব আর মহবিশ্বের বিবরণে উত্তম নয়। অতএব মহাবিশ্বের অতিআদিম (আরম্ভ কালে) অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে হলে

www.pathagar.com

কণাবাদী মহাকর্ষীয় তত্ত্ব (কোয়ান্টাম গ্রাভিটি, যে তত্ত্বে কণিকায় মহাকর্ষ প্রভাব) ব্যবহার করতে হবে। আমরা দেখতে পাব কণাবাদী তত্ত্বে বিজ্ঞানের সাধারণ তত্ত্বগুলো সর্বত্র প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব। প্রযোজ্য হবে কালের প্রারম্ভে, তথা বিশ্ব কোথা থেকে কীভাবে শুরু হয়েছিল। কোয়ান্টাম বা কণাবাদী তত্ত্বের বিশেষত্ব হলো কোয়ান্টাম তত্ত্বে অনন্যতার প্রয়োজন নেই।"

আপেক্ষিক ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব মূলত আংশিক তত্ত্ব। আপেক্ষিক তত্ত্ব মহাবিশ্বের বৃহৎ গঠনের ভালো ব্যাখ্যা দেয়। অন্যদিকে কণাবাদী বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব বস্তুর অন্তর্নিহিত কণিকা বিশ্লেষণে বৃহৎ বস্তুর গাঠনিক তত্ত্ব। উভয় তত্ত্বের আলোকে জগত গঠনের কারণ, আকার, আয়তন স্থিতিগতি, ওজন শক্তির উত্তম বিধিতে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু মৌলিক প্রশ্ন জগৎ কোথা থেকে বা এর মূলে কী? এমন সব কিছুর তত্ত্ব আপেক্ষিক ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব নয়। তবে তত্ত্ব দুটিকে ঐক্যবদ্ধ করলে মৌলিক প্রশ্নের উত্তর মিলবে এমন আশায় হকিং আপেক্ষিক তত্ত্বের অনন্যতায় কণাবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ ফল ব্যাখ্যায় প্রয়াসী। হকিং এর কথায় "কণাবাদী বলবিজ্ঞান এবং মহাকর্ষে (সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের মূল বিষয় মহাকর্ষ) যুক্ত করে সম্পূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ এরকম তত্ত্ব আমাদের এখন পর্যন্ত আমাদের নেই। কিন্তু এমন একটি ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের অবয়বে কি থাকা উচিত তার কিছু কিছু বিষয়ে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত। একটি হলো ফাইনম্যানের প্রস্তাবকে এ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।"

আমেরিকান বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান সুবিখ্যাত কণাবাদী পদার্থবিজ্ঞানী। কণাকে তরঙ্গ এবং কণা হিসেবে নবতর মতামত ব্যক্ত করে যা কণার সকল ইতিহাসের যোগফল হিসেবে (someover histories) খ্যাত। কোয়ান্টাম তত্ত্বকে বহু ইতিহাসের ধারায় ব্যাখ্যা দেন। ক্লাসিক্যাল বা পুরোন তত্ত্ব হিসেবে একটি কণার একটি পথেই গমনাগমনের ইতিহাস থাকে। কিন্তু ফাইনম্যান এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে একটি কণিকার একটিই ইতিহাসে নয়, তার বদলে অনুমান করা হয় কণিকাটি স্থান কালের সম্ভাব্য সমস্ত পথই অন্তকরণ করে। আর এর প্রতিটি গমনের ইতিহাসে রয়েছে দুটি সংখ্যা। একটি প্রকাশ করে তরঙ্গের আয়তন আর অন্যটি প্রকাশ করে তার অবস্থান। অবস্থান বলতে এর দশা (phase) বোঝান হয়েছে। কণিকার এমন আচরণ তার গমনাগমনের সম্ভাব্যতা প্রকাশ করে। ফলে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব সমূহে (নিউটন ও আইনস্টাইন) যেমন অনন্যতা অনিবার্য হয়ে পড়ে যেখান থেকে বিশ্বের শুরু এবং এর পথের বিবর্তনের ভালো ইতিহাস পাওয়া যায়, কোয়ান্টম তত্ত্বের এমন অনন্যতার অনিবার্যতা নেই। কোয়ান্টাম তত্ত্বে বিশ্বের আরম্ভের বিষয়ে অনেক সম্ভাবনার মধ্যে যে কোনো একটি কার্যকর ভাবা যায়। প্রশ্ন থাকে সে সম্ভাবনাটাইবা কী? তা কি ঈশ্বরের ইচ্ছায়? নাকি স্বপ্রণোদিত কোনো

www.pathagar.com

ঘটনা? হকিং এখানে কিছু বিজ্ঞান ভিত্তিক মডেল, কিছু প্রস্তাবনা, কিছু প্রশ্ন রেখে তা ব্যাখ্যা করেছেন।

হকিং এর ব্যাখ্যায় বস্তুত মহাবিশ্বের শুরু আছে কি নেই সে ব্যাখ্যানির্ভর করে স্থান ও কালের ওপর। স্থানের চিন্তনে আমরা বিভ্রান্ত কারণ স্থানের বিস্তৃতি কত বা স্থান কত দূরে যায় তা আমরা জানি না। মহাবিশ্বের যদি কোনো আরম্ভ না থাকে তাহলে কালের চিন্তনও অনুরূপ হয়। কারণ কালের ধারণা আসে ঘটনা থেকে। বিগ-ব্যাং এ কালের বোধ স্পষ্ট কারণ বিগ-ব্যাং এ মহাবিশ্বের আরম্ভের ঘটনা আছে। এ বিষয়ে হকিং এর বক্তব্য এমন, হকিং কল্পকাহিনী ভিত্তিক বিশ্বের রূপায়ণ বিজ্ঞানী নন। বাস্তব কালের বাস্তব মডেলে বিশ্বের বিবরণ, গতি ও পরিণতি তার তাত্ত্বিকতা। বাস্তব মডেল হিসেবে তিনি আপেক্ষিক ও কণাবাদী তত্ত্বকেই তার গবেষণার বিষয় বেছে নিয়েছেন। আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে এক বা একশত কোটি অনন্যতা থাকতে পারে। এই অনন্যতা বঙ্কিম স্থান-কালের প্রতিনিধি। অনন্যতা রূপ বঙ্কিম স্থান-কালে কণাবাদী তত্ত্ব প্রয়োগ করলে কণাসমূহের পথরেখাও হবে বঙ্কিম স্থানের মতো। এখানে আইস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ফাইনম্যানের ইতিহাসগুলোর যোগফল প্রয়োগ করলে কণিকার ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ বঙ্কিম স্থান-কালের সদৃশ্য। এটাই সমগ্র মহাবিশ্বের প্রতিরূপ। হকিং এর মন্তব্য- যাকে আমরা শূন্যস্থান ভাবি আসলে তা শূন্য নয়। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিপ্রসূত বিষয় ওপর থেকে কোনো জিনিষ ছেড়ে দিলে তাৎক্ষণিক ক্রিয়া করে এবং নিচের দিকে তা ধাবিত হয়। এর অর্থ ফাঁকা স্থান ফাঁকা নয়। তা অতিক্ষুদ্র কণায় পূর্ণ থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'কোয়ান্টাম জিটারস' (Quantum jeeters)। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সীমানাহীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করলে একক অনন্যতার প্রয়োজন হয় না। তবে বিশ্বের আরম্ভে অতিঘনত্বরূপ এককত্বের প্রয়োজন। এরূপ একত্বের সংখ্যা হতে পারে অগণন। ফলে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনগণন বিশ্বের (Multivers) প্রস্তাবনা রাখে। যার শুরু নেই শেষও নেই। বিশ্ব ছিল, আছে এবং থাকবে—

> There would be no singularities at which the laws of science broke down and no edge of space-time at which one would have no approach to God or some new laws to set the boundary conditions of space lime. One would say "The boundary condition of the universe is that it has no boundary" The universe would be self contained and not affected by anything outside itself. It would be neither be created nor destroyed. It would just Be.
>
> —[Brief History-page-143-144]

www.pathagar.com

অর্থ—সে ক্ষেত্রে এমন কোনো অনন্যতা থাকবে না যেখানে বিজ্ঞানের বিধি ভেঙে পড়ে এবং স্থান কালের এমন কোনো কিনার বা পার্শ্ব থাকবে না যেখানে স্থান কালের সীমানা স্থির করার জন্য ঈশ্বর কিংবা অন্য কোনো বিধির দ্বারস্থ হতে হবে। বলা যেতে পারে মহাবিশ্বের সীমান্ত অর্থ এর কোনো সীমান্তের অস্তিত্ব নেই। মহাবিশ্ব আত্মঅন্তর্ভুক্ত এবং বাইরের কোনো কিছু দিয়ে প্রভাবিত নয়। এর সৃষ্টিও নেই, ধ্বংসও হবে না—এটা শুধু থাকবে।

বিগ-ব্যাং অনন্যতায় বিশ্বের একটি কিনার বা সীমানা আছে। ১৩.৭ বিলিয়ন বা ১৩০০ শত ৭০ লক্ষ বছর পূর্বে মহাবিশ্বের শুরু। কিন্তু যে অনন্যতায় বিগ-ব্যাং তা কোথা থেকে সে প্রশ্নে এ তত্ত্বটি বিগ-ব্যাং এর পরবর্তী ইতিহাসটাই গ্রহণ করে, পূর্ব ইতিহাস নয়। অনন্যতার বিষয়ে হকিং কোয়ান্টাম গ্রাভিটি তত্ত্বের প্রস্তাবনায় সীমানাহীন বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে সচেষ্ট। বিশ্ব সীমানাহীন হলে কেবল আমাদের বিশ্ব নয়, এরূপ অগণিত মহাবিশ্ব থাকতে হবে যা আত্মঅন্তর্ভূক্ত (Self contained)। এ অবস্থায় কালের কোনো শুরু বা প্রান্ত থাকবে না। কাল হবে অসীম। কাল অসীম হলে অনন্যতার প্রয়োজন থাকে না। প্রশ্ন করা যায় কালের শুরু যদি নাই থাকে তাহলে এ অধ্যায়ের শুরুতে আমাদের বিশ্বের যে বিবর্তন ইতিহাস তুলে ধরা হল তার মূল্যায়ন কী? এ বিষয়ে হকিং এর তত্ত্ব জানান দেয় সকল শূন্যস্থান আসলে কণায় পরিপূর্ণ যা মহাকর্ষ বলে ঘনীভূত হবে এবং এমন ঘনত্বরূপ থেকে বিস্ফোরণে এক একটি মহাবিশ্বের বিকাশ ও বিবর্তন। অঞ্চলভিত্তিক বিশ্বের ঘনত্বের তারতম্যের উদাহরণে হকিং তার তত্ত্ব মত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য হকিং তার সদ্য প্রকাশিত 'গ্রান্ড ডিজাইন' গ্রন্থে (২০১০) এর স্বপক্ষে তত্ত্ব ও তথ্য তুলে ধরেছেন।

জগতের যদি শুরু থাকে তাহলে তার একটা কিনার পর্যন্ত আমাদের ভাবনাগুলো তাড়িত হতে পারে এবং বিজ্ঞানের বিধিগুলোর নিবেশন সম্ভব। কিন্তু জগত যদি সীমাহীন হয় তাহলে আমাদের ভাবনা ও বিজ্ঞানের বিধির অবস্থা কী? হকিং এর তত্ত্বমতে সীমাহীন স্থানে সীমাহীন কণিকা। যে সমস্ত কণিকার স্বল্পমাত্রিক ইতিহাসের সাথে আমরা পরিচিত। ফাইনম্যানের কণিকার ইতিহাসের যোগফলে তা বর্ণনা করা যাবে। তবে বাস্তবকালে কণিকার সকল ইতিহাস গণনা আদৌ সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে হকিং কৌশলগত হিসেবে কাল্পনিক কালের (Imaginary time) আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

আমরা বাস্তব কালের বাস্তব ঘটনায় কাল নিরূপন করি। অনুরূপ কাল্পনিক ঘটনায় কাল্পনিক কালের একটি বিধি হকিং ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিষয়টি তিনি বাস্তব সংখ্যা (Real Number) এবং কাল্পনিক সংখ্যা (Imaginary Number) এ গাণিতিক সূত্র আরোপে তা তুলে ধরেছেন। বাস্তব কালের বাস্তব সংখ্যা ২ x ২= ৪। অনুরূপ

www.pathagar.com

- ২ x - ২ = ৪ এখানে '+' (plus) x '+' (plus) = plus আবার '−' (Minus) x '−' = plus এ্যালজাবরায় আমরা সহজে শিখি প্লাসে প্লাসে = প্লাস এবং মাইনাসে মাইনাসে = প্লাস। এখানে সংখ্যা বাস্তব বলেই উভয় ক্ষেত্রে সংখ্যা ধনাত্মক (positive) বা বাস্তব হয়। ধরা যাক আমার ডান পকেটে ২ টাকা এবং বাম পকেটে ২টাকা অর্থাৎ ২ x ২ = ৪ টাকা আছে। এখন উভয় পকেটের টাকা হারিয়ে গেল অর্থাৎ - ২ x - ২ = ৪ টাকা। উভয় ক্ষেত্রেই তা বাস্তব সংখ্যা বলে প্লাসে প্লাসে প্লাস এবং মাইনাসে মাইনাসে প্লাস। এখানে টাকা চারটি বাস্তব যা আমার নিকট আছে (এ ক্ষেত্রে প্লাস) আবার যা নাই (মাইনাস) তাও বাস্তব ৪ টাকা। যেখানেই থাক তা বাস্তব সংখ্যায় ৪। ফলে বাস্তব কালের বাস্তব সংখ্যা আরোপের অর্ডার (Order) বা নির্দেশ থাকে বাস্তবতা (Reality)।

অনুরূপ কাল্পনিক সংখ্যার রয়েছে অবাস্তবতার অর্ডার বা নির্দেশ। অবাস্তব (Non Reality)। উদাহরণস্বরূপ আমি কল্পনায় উত্তর মেরুতে দুটি বাড়ি এবং দক্ষিণ মেরুতে দুটি বাড়ি নির্মাণ করলাম। এর গাণিতিক নির্দেশ হবে - ২ x - ২= - ৪। যেহেতু বাড়িগুলো কল্পনায় তাই অর্ডার হবে মাইনাস। তাই বাস্তব কালের বাস্তব যেমন বাস্তব অর্ডার থাকে (+) অনুরূপ কাল্পনিক কালে কাল্পনিক সংখ্যার অবাস্তব অর্ডার (-) থাকে। প্রশ্ন থাকে এরূপ কাল্পনিক কাল ব্যবহারের কোনো ভিত্তি আছে কি না? আমরা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হিসেবে চিহ্নিত করেছি। বাস্তবে বৃত্তাকার পৃথিবীর এরূপ কোনো মেরু নেই। গোলাকার পৃথিবীর পৃষ্ঠের যে কোনো স্থানকেই মেরু ভাবা যায়। আবার আমরা পৃথিবীর বিষুবরেখা, অক্ষরেখা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ রেখা দিয়ে স্থানকে চিহ্নিত করি। বাস্তবকালে পৃথিবীর এরকম কোনো রেখা নেই। এগুলো সবই কাল্পনিক রেখা। কিন্তু কাল্পনিক রেখায় আমরা বাস্তব কাল ব্যবহার করে থাকি। বিমান চালক অক্ষাংশের কৌণিক দূরত্ব পরিমাপে বিমান চালনা ও স্থান নির্ধারণ পূর্বক বিমান অবতরণ করে। দ্রাঘিমাংশের ওপর ভিত্তি করে দিন, তারিখ বা সময় নিরূপন করা হয়। বিষুব রেখার ওপর ভিত্তি করে পৃথিবী উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ভাগ করা হয়েছে। অক্ষ রেখার কল্পনায় ভর করে পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিক একবার পাক খায়। এগুলো আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্য যা অনুশীলনী। কাল্পনিক বিষয়কে অবলম্বন করে আমরা বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব কালের বর্ণনা দেই। হকিং এর কথা, তাহলে আমাদের কাল্পনিক কালই বাস্তব কাল? আর যা আমাদের বাস্তব তা কল্পনার প্রতিভাস কিনা, হকিং—

> This might suggest that the so called imaginary time is the real time, and that what we call the real time is just figment of our imagination. In real time the universe has a beginning and that end at singularity and that form a boundary of space-time and which the laws of science break down. But in imaginary time,

www.pathagar.com

there are no singularities or boundaries, so may be what we call imaginary time is really more basic, and what we call real time is just an idea that we invent to help us describe what we think the universe is like a scientific theory is just a mathematical model we make to describe our observations, it exists only in our minds. So it is meaningless to ask which is 'real' or 'imaginary' time. It is simply a matter of which is the more useful description.

—(Brief History- page-147)

এ থেকে প্রতিয়মান হতে পারে তথাকথিত কাল্পনিক কালই আসলে বাস্তবকাল, আর যাকে বাস্তব কাল বলি তা আমাদের কল্পনার রূপায়ণ। বাস্তব কালে অনন্যতাগুলোর ভিতরে মহাবিশ্বের শুরু ও শেষ রয়েছে। এই অনন্যতাগুলো স্থান-কালের সীমানা এবং এখানে বিজ্ঞানের বিধির প্রয়োগ অচল হয়ে পড়ে। কিন্তু কাল্পনিক কালে কোনো অনন্যতা কিম্বা সীমানা নেই। সেইজন্য আমরা যাকে কাল্পনিক কাল বলি হয়ত সেটাই আরো বেশি মৌলিক, আর যাকে আমরা বাস্তব কাল বলি তা কেবলই চিন্তন মাত্র। যে চিন্তনকে আমরা আবিষ্কার করি মহাবিশ্ব তথা জাগতিক বিষয়কে আমাদের চিন্তনে বিবরণ দেওয়ার জন্যে। তবে প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত মতানুসারে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব একটি গাণিতিক প্রতিরূপ মাত্র। এগুলো আমরা বেশি তৈরি করি আমাদের পর্যবেক্ষণের বিবরণ দেওয়ার জন্য। আসলে তত্ত্বের অস্তিত্ব আমাদের মনে। সুতরাং কোনটা বাস্তব কাল আর কোনটা কাল্পনিক কাল এ সমস্ত প্রশ্ন অর্থহীন। কোনো বিবরণটি বেশি কার্যকর সেটাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়।

হকিং এর কাল্পনিক কাল অভিনব সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের মডেলগুলো যেমন কপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মডেল, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক সময় ও মহাকর্ষ মডেল, ডেমোক্রিটিয়াস, রাদাফোর্ড, ডিরাক, চ্যাডউইকের পরমাণু মডেল, ফ্রীডম্যানের সম্প্রসারণশীল বিশ্বের মডেল, হকিং ও পেনরোজের বিগ-ব্যাং এবং কৃষ্ণগহ্বর ও কৃষ্ণগহ্বরে অনন্যতার মডেল আইডিয়া ভিত্তিক যা প্রথম অবস্থায় অভিনব বলে মনে হয়েছে। পরে তা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণে প্রমাণিত সত্য বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিশ্বের যাবতীয় বিষয়কে এখন আমরা এসব মডেলেই ব্যাখ্যা দেই। আমরা মডেলের ভিত্তিতেই এর বর্ণনা দেই। দৈনন্দিন জীবনে তা ব্যবহার্য করে তুলেছি। সবকিছুর ভালো বর্ণনা জেনে আমরা জ্ঞানী হয়ে উঠছি। এক্ষেত্রে কাল্পনিক কাল আইডিয়া মাত্র। এর পরীক্ষণ এখনো আমরা জানি না। তবে মহাবিশ্ব কীভাবে এলো তা যদি কাল্পনিক কালে স্থাপন করা যায় তাহলে অনন্যতা কোথা থেকে এলো সে প্রশ্ন থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কারণ কাল্পনিক

www.pathagar.com

কালে বিশ্ব যে কোনো ভাবে শুরু হতে পারে। তা হতে পারে ঈশ্বরের আদেশে, হতে পারে স্বপ্রণোদিত ভাবে শূন্য থেকে, বিশেষ বিধিতে। যদি তা হয় ঈশ্বরের আদেশে তাহলে বিশ্বের আদি বিবরণ কখনো জানা যাবে না কারণ ঈশ্বর মডেলে আরোপিত নন। ঈশ্বর জ্ঞানের অতীত। আর তা যদি হয় স্বপ্রণোদিত তাহলে সে বিধি বা মডেল এক সময় জানা যাবে কারণ এখন পর্যন্ত আমরা মহাবিশ্বকে নিয়ে যা জেনেছি তা মডেল ভিত্তিকই জেনেছি। এ আলোকে হকিং অধ্যায়টি শেষ করেছেন শেষ প্রশ্ন রেখে—

> The idea that space and time way form closed surface without boundary also has found implication of the role of god in this affairs of universe. With the success of scientific theories in describing events, most people have come to believe that god allows the universe to evolve according to a set of laws and does no intervene in the universe to break these laws. However the laws do not tell us what the universe should have looked like when it started it would still be up to God is wind up the clockwork and choose how to start it off. So long the universe had a beginning we would suppose it had a erector. But if the universe is really completely self-contained, having no boundary or edge, it would have neither beginning nor end: it would simply Be, What place then for a creator?
> —(Brief History- page-149).

এর সরলার্থ-স্থান এবং কাল সীমাহীন বদ্ধপৃষ্ঠ। মহাবিশ্বের বিষয়ে ঈশ্বরের ভূমিকা এরূপ চিন্তনের ফলশ্রুতি গভীরতর হতে পারে। ঘটনাবলী ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোর সাফল্যের ফলে অধিকাংশ লোকই এখন বিশ্বাস করে ঈশ্বর একগুচ্ছ বিধি অনুসারে মহাবিশ্বের বিবর্তণ অনুমোদন করেন এবং এই বিধি ভঙ্গ করে তিনি মহাবিশ্বে হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু শুরুতে মহাবিশ্বের অবস্থা কেমন ছিল সে বিষয়ে বিধিগুলো কিছুই বলে না। ঘড়ির মতো বিশ্বের এই গতি বন্ধ করা ঈশ্বরেরই দায়িত্ব এবং কী করে এটা আবার শুরু করবেন সে পদ্ধতি নির্বাচনের দায়িত্ব ঈশ্বরেরই। যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বের শুরু ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অনুমান করতে পারতাম মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টাও ছিল। কিন্তু মহাবিশ্ব যদি সঠিক অর্থেই পূর্ণরূপে স্বপ্রণোদিত বা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এবং যদি এর কোনো সীমানা কিংবা কিনার না থাকে তাহলে এর আদিও থাকবে না, এর অন্ত থাকবে না, থাকবে শুধুই অস্তিত্ব। তাহলে স্রষ্টার কাজ কী?

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো মহাবিশ্বের বিবর্তনের ভালো ব্যাখ্যা দেয়। কিন্তু কোথা থেকে মহাবিশ্বের শুরু সে বিষয়ে তত্ত্বগুলো জানাতে পারে না। এক্ষেত্রে বেশির ভাগ লোকের বিশ্বাস ঈশ্বর একগুচ্ছ বিধি সমন্বয়ে বিশ্ব শুরু করেছেন। এরপর বিশ্ব বিধি অনুসারে বিকশিত হয়েছে। বিধিতে ঈশ্বর আর কোনো হস্তক্ষেপ করেন না। হকিং এর প্রশ্ন ঈশ্বর এ বিশ্ব সৃষ্টির ঝামেলা কাঁধে নিতে গেলেন কেন? এ ছাড়াও নানা প্রশ্ন থেকে যায়। বিশ্ব সৃষ্টিতে তার কী লাভ বা না হলে কী লোকসান হত? ঈশ্বরের অবস্থানগত স্বরূপ কী? ঈশ্বরকে নিয়ে ধর্ম ও দর্শনে প্রচুর মতবিরোধ আছে। কেউ আকারে—কেউ নিরাকারে—কেউ স্থানে—কেউ সর্বব্যাপী—কেউ মনে—কেউ গুণে—কেউ মূর্ততায়—কেউ বিমূর্ততায়—কেউ সজ্ঞান—কেউ অজ্ঞান—কেউ লৌকিক—কেউ অলৌকিক—কেউ আত্মায়—কেউ স্বত্ত্বায়—কেউ শক্তি—কেউ নিগুণ ভেবে ঈশ্বরকে বুঝতে চান। এখানে নানা মত নানা পথ। সুসংবদ্ধ কোনো বিধি নেই। বিজ্ঞান সুসংবদ্ধ বিধিতে সকল বিষয় ব্যাখ্যা করে। এমন বিধিতে পার্থিব ঘটনা, সৌরমণ্ডলের আয়তন অবস্থান গতি, তারকা তথা গ্যালাক্সির গঠন জন্ম মৃত্যু আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। কিন্তু বিশ্ব কী করে সৃষ্টি হয়েছিল বিজ্ঞানের এ যাবৎকালের জানা বিধিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। হকিং এখানে কণাবাদী তত্ত্বের নব সংস্করণে নবতর আইডিয়ার প্রবক্তা। বিশ্ব সীমানাহীন, চিরন্তন এবং স্বপ্রণোদিত বা আত্ম অন্তর্ভূক্ত। আগামী দিনের বিজ্ঞান তার তত্ত্বকে ভুল অথবা নির্ভুল প্রমাণ করবে?

www.pathagar.com

সময়ের অভিমুখ

The Arrow of Time

গ্রন্থটিতে এ অধ্যায়টি বিশেষ আকর্ষণীয়। পূর্ব অধ্যায়গুলোতে আমরা কাল নিয়ে বিস্তর কথা বলেছি। এ অধ্যায়ে কালের সুসংহিত সংজ্ঞা, কালের গতি এবং কালের সাথে বিশ্ব সৃষ্টির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করা যাবে। সময় বা কালের মুখ বলতে বোঝানো হয়েছে যে মুখে সময় অগ্রগামী। কালের মুখ সম্মুখে (Time Arrow forward) অর্থাৎ কাল সামনে অগ্রগামী হচ্ছে। কালের মুখ পশ্চাতে (Time Arrow backward) অর্থ কালের পরিমাপ বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পাবে। কাল বিষয়ে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক বোধ এমন যে সময় পশ্চাতে দৌড়াচ্ছে আর আমরা সময় কেটে সম্মুখে অগ্রগামী হচ্ছি। ফলে দূর অতীত দূরতর মনে হয়। ভবিষ্যতের পশ্চাৎ প্রান্তে আমরা অনবরত বর্তমানে অবস্থান করি। অতীত পশ্চাতে, ভবিষ্যৎ সামনে, মাঝে থাকে বর্তমান। এতে আমরা ভবিষ্যতের দিকে ভ্রমণ করছি। সময়ের মুখ পশ্চাতে হলে আমরা পশ্চাতে ধাবমান হতাম। আমাদের অতীতের ঘটনা বর্তমান হয়ে উঠত। ভবিষ্যৎ থাকতো পশ্চাতে। আমরা সময়ের আরম্ভ ঘটনায় ফিরে যেতাম। বাস্তব অর্থে মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল অবস্থায় আমরা আছি বলে সময় অগ্রগামী হচ্ছে। মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ হয়ে যদি কখনো সংকোচন দশায় আসে তাহলে সময়ের মুখ হবে পশ্চাৎগামী। সে অবস্থায় কি সকল অতীত ঘটনা আমরা দেখতে পাব? সংকোচন দশায় বিশ্বের বিধি হবে বিপরীত। ফলে আমরা বাঁচার আগে মরে যাবো। তারপরেও যে সমস্ত ঘটনা অতীতে গ্রোথিত তার পুনরাবৃত্তি হবে কিনা? সেটা নির্ভর করছে কালের যে পথে বিশ্ব প্রসারিত হয়েছে সে পথেই সংকোচন হতে হবে। এ বিষয়ে কোনো তাত্ত্বিকতা নেই। তারপরেও যে মহাকর্ষ বলে বিশ্ব সংকুচিত হবে সে বলের মাত্রাগত পরিবর্তনের হার এত বেশি পরিবর্তিত হতে থাকবে যে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাই সুসংবদ্ধভাবে ঘটার সম্ভাবনা নেই। সময় ভ্রমণ নিয়ে বর্তমান বিজ্ঞান কথা বলছে। এ বিষয়ে রয়েছে আমাদের অস্পষ্ট ধারণা। সাধারণভাবে সময় ভ্রমণ বলতে অনেকেই বোঝেন সময়ের পশ্চাৎ ভ্রমণ যা কখনো সম্ভব নয়। অনেকে বোঝেন এর অর্থ আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে ভ্রমণ। এ ভ্রমণে সময়ের নানা ফল প্রাপ্তি ঘটতে পারে, যেমন সময় সংকোচন (Time dilation)। যে ঘটনা সে সময়ে আমরা ঘটতে দেখতে অভ্যস্থ, সময় সংকোচনের তা হবে আরো কম। এভাবে মহাবিশ্ব ভ্রমণ সহজ হতে পারে। হকিং

www.pathagar.com

এ অধ্যায়ে কাল, পরমকাল, আপেক্ষিক কাল, কাল্পনিক কাল, কালের উৎস, কালের মুখ, কালের মধ্যে বিশ্ব ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করেছেন। হকিং এর গভীর তাত্ত্বিকতার পূর্বে সময় বা কাল বিষয়ের সংজ্ঞা স্পষ্ট ভাবে গ্রহণ করা যায়নি। এ অর্থে হকিং সঠিক অর্থে স্মরণকালের তাত্ত্বিক।

সকাল, দুপুর, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। ছেলেটি এখনো ফিরে এলো না। উৎকণ্ঠায় মা এভাবেই সময় গুনছে। দশটার ক্লাসের ঘণ্টা বেজে দশ মিনিট অতীত হলে শিক্ষক ক্লাসে এলেন। ছাত্ররা ভেবে নিল ক্লাসের সময় দশ মিনিট কমে গেল। বন্ধু বলেছে বিকেল পাঁচটায় দেখা করতে। আমাকে ঠিক ঠিক পৌঁছে যেতে হবে। বিবেকী মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জগতে এভাবেই সময়ের ছায়াপাত ঘটে। আমাদের মনে হয় সময় প্রতিনিয়ত ধাবমান। আমরা সময় মেপে চলছি কিন্তু সময়ের বোধ স্পষ্ট নয়।

মূলত সময়ের ভৌত বিধি নেই। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতায় জোয়ার ভাটার মতো সময় দৃশ্যমান নয়। তবু আমরা বলি সময় ও জোয়ার ভাটা কারো জন্যে অপেক্ষা করে না (Time and tide wait for none)। জোয়ার ও ভাটার চলাচল বুঝি, কিন্তু সময়ের চলাচল বলতে কী বুঝি? তবুও সময় সময়ের গতি, সময়ের শুরু, সময়ের শেষ, কাল, মহাকাল, চিরন্তনকাল, খণ্ডকাল, অখণ্ডকাল, পরমকাল, শাশ্বতকাল, আপেক্ষিক কাল, কাল্পনিক কাল, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কাল নিয়ে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষের কত কথা, কত গবেষণা, কত ভাবনা। কাল নিয়ে দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক, কবি, ভাবুক যত ভাবনাই করুন কালের ভৌত বিবরণ না থাকায় কালের সংজ্ঞা তর্কনির্ভর হয়ে পড়ে। তর্কের সঠিক সিদ্ধান্ত বিধিনির্ভর। ফলে বিজ্ঞানের বিধিনির্ভরতায় কালের একটা সাধারণ সংজ্ঞা পাওয়া যেতে পারে। (ধর্ম ও দর্শনের দুর্বলতা হলো তা বিধিনির্ভর ও গাণিতিক হিসেবসিদ্ধ নয়। এখানে বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব যে তা বিধিনির্ভর)।

কাল বা সময়ের হিসেব হল দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী ব্যবধানটুকু মেপে নেওয়া। এ গ্রন্থ যখন লিখছি তখন একটি শব্দ লেখার পর আর একটি শব্দ লিখছি। দুটি শব্দ লেখার ব্যবধানে সময় ঘড়ির কাঁটায় এক সেকেন্ড। আমি সময় মাপি এক সেকেন্ড। এভাবে আমি পর পর দুইশত শব্দ লিখেছি। আর সময় গত হয়েছে দুইশত সেকেন্ড। উল্লেখ্য এই শব্দগুলো আমি একবারে একসাথে লিখি নাই। লেখার ঘটনাটি ঘটেছে শব্দের পর শব্দ লিখে। তা আবার ঘটেছে কাগজের কয়েক পৃষ্ঠার স্থানব্যাপী। ফলে সময়ের যেমন অতিবাহন থাকছে তেমনি ঘটেছে স্থানের ব্যাপ্তি। আমাদের জাগতিক ঘটনার বিধি এমন যে একই স্থানে সকল ঘটনা একসাথে ঘটে না। নির্দিষ্ট স্থানে একটি ঘটনা একবার ঘটে, ঐ স্থানে আর একটি ঘটনা ঘটতে হলে তা ঐ ঘটনার পরে ঘটে। ডাইনিং টেবিলের নির্দিষ্ট স্থানে দুটি প্লেট একসাথে

www.pathagar.com

রাখার সুযোগ নেই। প্রথমটিকে সরিয়ে দ্বিতীয়টি ঐ স্থানে বসাতে হবে। এরই মধ্যে এক বা দুই সেকেন্ড সময় অতীত হয়েছে। আবার দুটি প্লেট একসাথে রাখতে পারেন তা প্রথম প্লেটের ওপরের তলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা। মনে রাখা ভালো, ভূ-পৃষ্ঠের তল, যেমন তল তেমনি টেবিলের পৃষ্ঠ, খাতার পৃষ্ঠা, কলমের গা, ঘরের মেঝে, বিছানার উপরিদেশ, আমার আপনার শরীরের গা সবই তল। আমরা যে শূন্যস্থান দেখি তাও তল। ঘনবস্তুর দেহও তল। এক কথায় আমরা যা দেখি ও মহাশূন্য স্থান নিয়ে যা ভাবি তার সকল স্থানই তল। তল আসলে স্থান বিশেষ। তলের বৈশিষ্ট্য তা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের দুই মাত্রার। কেবল উচ্চতার মাত্রা যোগ করলে তিন মাত্রার ঘনবস্তু দেখি। এই ঘনবস্তু যাবতীয় ঘটনার উৎস। যা কালের বোধ সৃষ্টি করে।

ঘটনার উৎস আবার গতি থেকে। আমরা স্থবির অঞ্চল অনমনীয় বিশ্বকে দেখি না। যা কিছু দেখি তা গতিশীল। গ্যালাক্সির গতি, নক্ষত্র ও গ্রহের গতি, বায়ুর গতি, জাহাজের গতি, প্লেন ও ট্রেনের গতি, খেলার মাঠে ফুটবল ও ক্রিকেটের গতি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মের গতি, বিশ্বের দৃশ্যপট। গতির ভাষা আবার বুঝি বস্তুর স্থিরতা থেকে। বিশ্বের সবকিছুই যদি অনড় ও স্থবির হত তা হলে আমরা গতির ভাষা বুঝতাম না। সেখানে বিশ্ব বিকাশলাভ করত না। আবার সবকিছুই যদি কেবল গতিশীল হত তাহলেও গতি বা স্থিতির ভাষা বুঝতাম না কারণ আমরা একই দৃশ্যপট দেখতাম। একটি বস্তু স্থির সে তুলনায় অন্য আর একটি বস্তু গতিশীল তাই স্থিতি ও গতি বুঝি। বিজ্ঞানের ভাষায় বলে Body of reference বা তুল্য। স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতা নিয়ে যাবতীয় ঘটনায় আমাদের বিশ্ব। এমন বিশ্ব দেখতেই আমরা অভ্যস্থ।

ঘটনার উৎস গতি। তা হতে পারে আমাদের হাঁটার মতো স্বল্প গতি বা আলোর গতির মতো দ্রুতগামী গতি। গতি যাই হোক বিশেষ স্থানে ঘটনা যুগপৎ ঘটে না বা ঘটার সুযোগ নেই। তা পর পর ঘটে। এভাবে পর পর ঘটনার ক্রমিক তা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। একে বলা যায় ঘটনার সিরিজ বা তালিকা। যেমন আমি যত বেশি লেখার ঘটনার সৃষ্টি করেছি ততই লেখার ক্রমিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্রমিকে পাঁচশত শব্দ লিখে মনে করা যাক ৫০০ সেকেন্ড অতিবাহন করছি। এর অর্থ ৫০০ সেকেন্ড সময় পশ্চাতে আর বর্তমানে এখন যে শব্দ লিখলাম। আমার ভবিষ্যত থাকছে পরের শব্দ লেখায়। এরূপ ঘটনার তালিকায় আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের বোধ। এখানে কালের অস্তিত্ব নেই। আছে ঘটনার প্রবাহ। ঘটনার সেসব স্মৃতি আমাদের মস্তিষ্ক ধারণ করতে সক্ষম। ফলে প্রবাহমান ঘটনার স্মৃতি সময়ের বোধ হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক জগতে নাড়া দেয়। আমাদের মস্তিষ্ক যদি অতীত স্মৃতি বহন করতে সক্ষম না হত তাহলে সময়ের বোধ সৃষ্টি হত না। তাই সময়

www.pathagar.com

মূলত ঘটনার তালিকার স্মৃতি যা সুসংহতভাবে আমাদের মস্তিষ্ক ধারণ ও স্মরণ করতে পারে। মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে মানুষ সময়কে সুসংহতভাবে স্মরণ করতে পারে না। সময় আসলে ঘটনার বিন্যস্ততায় অতীত ও বর্তমান ঘটনার স্মৃতির সমন্বয়।

বাংলায় সময় ও কাল ইংরেজিতে টাইম ও এরা (Time and Erra)। সময় ও কাল একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও কিঞ্চিত পার্থক্য বিদ্যমান। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঘটনার পরিসরে সময়ের বোধ জন্ম নেয়। এরূপ অর্থে সময়কে আমরা সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছরে হিসেব করি। ঘটনার স্রোত যখন দূর থেকে দূরতর হতে থাকে তখন কালের বোধ সৃষ্টি হয়। ঘটনার প্রান্ত ভবিষ্যতের রেখা ধরে দূর থেকে যত দূরতর হতে থাকে কালের ব্যাপ্তি ততই বাড়তে থাকে। কাল তখন লক্ষ কোটি বছর বা শতাব্দীতে মান গ্রহণ করে। কাল হয়ে ওঠে মহাকাল। সময় যেখানে নিঃশেষে মুছে যায় কাল সেখানে গণনাতীত ঘটনার নানা স্মৃতিচিহ্নের মাঝে স্থায়িত্ব গ্রহণ করে। কালের এক অর্থ বিনাশ। সৃষ্টি প্রবাহে দূর অতীতের নানা ঘটনার বিনাশে প্রান্তকালের মুহূর্তিক ঘটনার কালকে 'সময়' বলা সঙ্গত। এভাবে সময় ও কালের বিভেদ বুঝে নেওয়া যায়। কালের প্রবাহ নিরন্তর হলেও কালের পশ্চাৎ ভাবতে গেলে কালের আরম্ভ ঘটনা ভাবতে হয়। বলা যায় প্রথম ঘটনা কি যেখান থেকে কালের শুরু?

নিউটন ভাবতেন বিশ্ব অনাদি, স্থির ও স্থবির। বিশ্ব চির অস্তিত্বশীল। এর শুরুও নেই শেষও নেই। তিনি কালকে পরম জ্ঞানে অভিহিত করেছেন। স্থান বলতে অসীম মহাশূন্যস্থানকে বুঝেছেন। জগৎ সৃষ্টির এ রহস্যকে তিনি স্রষ্টার কৌশল হিসেবে ভেবেছেন। পরমজ্ঞানে কাল কোনো বাহ্যিক কারণে প্রভাবিত নয়। যে কোনো বস্তুর মতো কাল একটি বিষয়। বস্তুর মতই কাল নিরপেক্ষ বা আপন অস্তিত্বে বিদ্যমান। আমরা যে এক মিটার দৈর্ঘ্য মাপি। মিটার দণ্ড বা ফিতা বিশেষ যার আপন অস্তিত্ব আছে। অনুরূপ দুটি ঘটনার ব্যবধান মাপি কাল দিয়ে। নিউটনের মতে কালদণ্ডের মতো আপন অস্তিত্ব গ্রহণ করে আছে। অনুরূপ স্থানও নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। স্থানে ঘটনা ঘটে কাল নামক রাশি দ্বারা ঘটনার শুরু ও শেষের ব্যবধানের মাপন করি।

প্রাচীন কাল থেকে মানুষ সময়ের বোধে সময় মাপনের সাধারণ কৌশল হিসেবে জলঘড়ি, ছায়াঘড়ি, ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে আসছে। প্রায় ৩০০০ হাজার পূর্ব থেকে সুমেরীয়, মিশরীয়, চীনাদের ক্যালেন্ডার ব্যবহারের ইতিহাস রয়েছে। সূর্যের উদয়াস্তের ঘটনা, তারকার স্থান পরিবর্তনের ঘটনা, ঋতু পরিবর্তনের ঘটনায় তারা ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করত। এগুলো ছিল বৃহৎ ঘটনার বিষয়। কিন্তু ক্ষুদ্র ঘটনার কাল মাপনের কৌশল হিসেবে ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়। ঘড়িতে সময়ের সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক

www.pathagar.com

সেকেন্ড। মাত্র ষোড়শ শতক থেকে ঘড়ি ব্যবহার শুরু হয়।

নিউটনের প্রায় ৩০০ বছর পর আলোর গতির সীমাবদ্ধতা স্বীকৃতিলাভ করে (প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিমি)। নিউটনের তত্ত্ব স্বল্প গতির ঘটনার ব্যাখ্যা। নিউটন স্বল্পগতির ক্ষেত্রে দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী ব্যবধান কাল নামক স্বাধীন রাশি দ্বারা পরিমাপ করেছেন। ফলে দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী কালের পরিমাপ সকল ভালো ঘড়িতে সমান হবে। ধরা যাক একজন দৌড়বিদ ৫ সেকেন্ডে ১০০ গজ অতিক্রম করল। সকলেই যার যার ঘড়ি দেখে সময়ের মাপনে একমত হবেন। কাল এখানে পরম বা স্বাধীন একক, যেমন মিটার দিয়ে দূরত্ব এবং গ্রাম দিয়ে ওজন মাপা হয়। কিন্তু গতি যদি আলোর গতির কাছাকাছি হয় তাহলে এ মাপন সঠিক বা ফলদায়ক হবে না। পূর্বেই বলা হয়েছে সময় ঘটনার পরিমাপ। ঘটনা গতির ফলাফল। পূর্বে ভাবা হত আলোর গতি অসীম। ফলে আলোর গতি ঘটনার জন্ম দিবে না। কিন্তু আলোর গতি সীমিত এ তথ্য জানার পর আলোর গতির মানে ঘটনা তথা সময় মাপনের ক্রিয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। এর প্রেক্ষিতে আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের ঘোষণা দেন। এ তত্ত্বে দেখা যায় স্বল্পগতির ক্ষেত্রে সময় মাপনে একই ফলাফল পাওয়া যায়। কিন্তু একই ঘটনাকে যদি আলোর গতির মানে প্রতিস্থাপন করা যায় তাহলে সকল ঘড়ি সময়ের একই মাপন দেয় না। যে ব্যক্তি স্বল্পগতিতে ৫ সেকেন্ডে ১০০ দৌড়ে অতিক্রম করল সে যদি আলোর গতির নিকটতর গতিতে চলমান হয় তাহলে ১০০ গজ অতিক্রম কালে তার ঘড়ির সেকেন্ডের কোটায় কোনো টিক দিবে না। তিন লক্ষ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করলে তার ঘড়িতে সেকেন্ডের কাঁটা টিক দিবে। ফলে স্বল্পগতির লোকটির হাতের ঘড়ির সময় এবং যিনি আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে চলছেন তার হাতের ঘড়িতে ভিন্ন ভিন্ন সময় তারা পরিমাপ করবে। এর অর্থ সময় পরম বা স্বাধীন নয়। যার যার কাছে তার তার সময়। অতএব সময় আপেক্ষিক। এভাবে আইনস্টাইনের তত্ত্ব নিউটনের পরমকালের বিলুপ্তি ঘটায়। আপেক্ষিক কালে পর্যবেক্ষক সময় পরিমাপ করবেন যে ঘড়ি তিনি নিজে বহন করছেন। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি সূর্য থেকে এই মুহূর্তে আলোর গতিতে পৃথিবীর দিকে যাত্রা করলেন। তিনি যখন পৃথিবীতে পৌছালেন তখন যে ঘড়ি তিনি বহন করছেন তিনি দেখবেন তার ঘড়িতে সময় ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড (আলো সূর্য থেকে পৃথিবীতে পৌছাতে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড লাগে)। ভ্রমণকারী ব্যক্তি সাপেক্ষে পৃথিবীতে অবস্থানকারী ব্যক্তির ঘড়িতে সময়ের মান '০' (শূন্য)। এখন উভয় ব্যক্তিই এক সাথে আলোর গতিতে চলমান হলে ৫ সেকেণ্ড পর প্রথম ব্যক্তি তার ঘড়িতে সময় মাপবেন ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড + ৫ সেকেন্ড = ৮ মিনিট ২৪ সেকেন্ড। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তার ঘড়িতে সময় মাপবেন ৫ সেকেন্ড। ফলে প্রতিটি স্থানের বিন্দুই হয়ে ওঠে কালের বিন্দু। এ

www.pathagar.com

কারণে আপেক্ষিক তত্ত্বে পরম স্থান এবং পরমকালের অস্তিত্ব নেই। যা স্থান তাই কাল বা যা কাল তাই স্থান। স্থান ও কাল একে অপরের বুনন। যা বিভিন্নতায় স্থান ও কাল নয়, একসাথে স্থান-কাল (Space-time)।

নিউটনের পরমকালে মহবিশ্বের আরম্ভ প্রশ্নটি জড়িত নয়। কারণ সে তত্ত্বে কাল শাশ্বত, অনাদি। কাল এখানে মহাকাল, অখণ্ডকাল, অসীম কাল বলে বিবেচিত। জগত কালের এমন বোধে চিরন্তন। কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক কাল মহবিশ্বের শুরু নির্দেশ করে। যেহেতু স্থান ও কাল অভিন্ন এবং ঘটনার প্রবাহ কালের প্রবাহ; ফলে স্থান-কালের প্রথম কোনো ঘটনা থেকে কালের শুরু অনিবার্য হয়ে পড়ে। আপেক্ষিক তত্ত্বানুসারী বিজ্ঞানীরা বিগ-ব্যাং ঘটনায় কালের শুরু মতামত ব্যক্ত করেন। এ থেকে ঘটনার ক্রমিকতায় বিকাশমান জগতের কালের মুখ সম্মুখে অর্থাৎ, কাল অগ্রগামী।

আপেক্ষিক তত্ত্ব তথা আপেক্ষিক কালের ধারণায় কালের শুরু অনিবার্য হয়ে পড়ে। ধারণা করা হলো অসীম ঘনত্বরূপ একক অনন্যতায় মহাবিস্ফোরণে (Big-Bang) সময়ের অনন্যতায় বিশ্বের যাত্রা শুরু। কিন্তু অনন্যতার বিবরণ বিজ্ঞানের তত্ত্বের অতীত। ফলে অনন্যতা প্রকল্প প্রশ্নের সম্মুখীন। হকিং আপেক্ষিক তত্ত্বের অনন্যতায় কোয়ান্টাম বা কণাবাদী তত্ত্ব প্রয়োগে অনন্যতার অপ্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তত্ত্ব-মত ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে তিনি 'কাল্পনিক কাল' ধারণা উপস্থাপন করেছেন। বাস্ত ব কালের (Real Time) অগ্র ও পশ্চাত রয়েছে কিন্তু কাল্পনিক কালের মুখ অগ্র, পশ্চাৎ, ডানে, বাঁয়ে ঘোরাতে পারেন। আপনার কল্পনার কালের ভ্রমণে দক্ষিণে যেতে যেতে আবার পশ্চাৎগামী হতে পারবেন বা পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে কালের মুখ ফেরাতে পারেন। ফলে কালের অগ্র পশ্চাতের কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু বাস্তব কালের দিকে দৃষ্টি দিলে কালের অগ্র পশ্চাতের অভিমুখে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। আমরা সবাই অতীত ও ভবিষ্যত মেনে নেই। অতীত ও ভবিষ্যতের এই পার্থক্যের উৎস কী? কেন আমরা অতীতকে স্মরণ করতে পারি কিন্তু ভবিষ্যত কেন জানি না? এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়েই বিজ্ঞানের বিধি অনুসৃত বিবরণ এবং বিধির আলোকে উচ্চতর বিধির সংযোজনে আমরা এভাবেই জ্ঞানে সমৃদ্ধ হচ্ছি। বিশ্বলোকের অন্ত ঃগভীরে রহস্যের দ্বার উন্মোচনে সচেষ্ট হচ্ছি। কণাবাদী বলবিজ্ঞান বা কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিধিগুলো অতীত এবং ভবিষ্যতের ভিতরে কোনো পার্থক্য নির্ণয় করে না। পদার্থবিজ্ঞানের মূলে কণা। ফলে কণার বিধিতে কালের রূপরেখা ব্যাখ্যা করা যাবে। যা কাল্পনিক কালে স্থাপন করা যায় বলে হকিং মন্তব্য করেছেন।

কণাবাদী তত্ত্বে কণা বিষয়ক বিজ্ঞানের বিধিগুলো অতীত এবং ভবিষ্যতের ভেতর কোনো পার্থক্য স্বীকার করে না। পূর্বের আলোচনায় আমরা জেনেছি কণিকাসমূহ C, P এবং T প্রতিসাম্য মেনে চলে। এদের সমন্বয় ক্রিয়াতে বিধিগুলো অপরিবর্তিত

www.pathagar.com

থাকে। এর অর্থ কণিকা বিপরীত কণিকায় পরিবর্তন। P এর অর্থ দর্পণবিম্ব গ্রহণ অর্থাৎ ডান ও বাঁয়ে পরস্পর পরিবর্তন। এবং T এর অর্থ সমস্ত কণিকার গতির অভিমুখ বিপরীত করা অর্থাৎ কণিকার গতিকে পশ্চাতমুখী করা। C কণিকাকে প্রতিকণিকায় পরিণত করা এবং P দর্পণ প্রতিবিম্ব যা পদার্থের সকল আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এখন P বিধি ও C বিধিকে সমন্বয় করলেও পদার্থের আচরণের পরিবর্তন হবে না। এ বিষয়ে হকিং বলেন, 'অন্য একটি গ্রহের অধিবাসীরা যদি আমাদের দর্পণ প্রতিবিম্ব (প্রতিচ্ছায়া) হয় এবং তারা যদি পদার্থ দিয়ে গঠিত না হয়ে বিপরীত পদার্থ দিয়ে গঠিত হয় তাহলেও তাদের জীবন একই রকম হবে।

> Life would be just the same for the inhabitants of another planet who were both mirror images of us and who ware made of antimatter, rather than matter.
>
> —(Brief History by hawking page-152).

CP এবং CPT ক্রিয়ায় যদি প্রতিসাম্য (Symmetries) অপরিবর্তীত থাকে তাহলে কেবলমাত্র T এর ক্ষেত্রেও তা অপরিবর্তীত থাকবে। অর্থাৎ T প্রতিসাম্য জানান দেয় কণিকার গতি পশ্চাতমুখী করলেও এর আচরণের পার্থক্য হবে না। কণিকার এমন আচরণে কাল্পনিক কালের নির্দিষ্ট কোনো দিক বা গতি নেই। কিন্তু বাস্তব কালে অগ্র ও পশ্চাত অভিমুখের বিরাট পার্থক্য থাকে। বাস্তবকালের মুখ অগ্রমুখী ও পশ্চাতমুখী করা যায় কিন্তু কাল্পনিক কালের ন্যায় বাস্তব কালের মুখ চারদিকে (অগ্র, পশ্চাত, ডান ও বামে) করা যায় না। কল্পনা করা যাক একটি চায়ের পেয়ালা টেবিল থেকে মেঝেতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এর একটি আলোকচিত্র নিলে দেখা যাবে কাল অগ্রমুখী। ঘড়িতে তা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ২ সেকেন্ড কাল অগ্রগামী হয়েছে। এবার আলোকচিত্রটি ফ্ল্যাশব্যাক করা যাক। দেখা যাবে পেয়ালার ভাঙা টুকরোগুলো একত্রিত হয়ে ভালো পেয়ালা লাফিয়ে টেবিলে উঠেছে। বাস্তবকালে কখনো এমনটি হয় না। হলে কোনো কিছুই নষ্ট হওয়ার ভয় থাকতো না। বাস্তবকালের অগ্রগামীতা সম্মুখে। তবে তার পশ্চাতগামীতায় থাকে অতীত যা আমাদের কল্পনায় স্মৃতি মাত্র। এভাবেও কাল্পনিক কালের একটি ভীত আছে।

বাস্তব কালের মুখ কেন সম্মুখে বা কাল কেন অগ্রগামী হয় এবং ভাঙা পেয়ালা কেন ভালো পেয়ালা হয়ে ফিরে আসে না তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাপগতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র থেকে। আমরা জানি পদার্থবিজ্ঞানে গতি, স্থিতি, তাপ, চাপ, ভর শক্তি ইত্যাদি বিষয় সূত্রবদ্ধ। সূত্র বা বিধি বিশ্লেষণে তা ব্যাখ্যা করা যায়। তাপ ও গতি এক সাথে পদার্থবিজ্ঞানে Thermo-dynamic বা তাপগতিবিজ্ঞান বলে পরিচিত। তাপগতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিধি অনুসারে কালের সঙ্গে কোনো তন্ত্রের (System) তাপদীপ্ত কারণে বিশৃঙ্খলা (Entropy) বৃদ্ধি পায়। আমরা প্রত্যক্ষ করি বা না করি প্রতিটি ঘটনাতেই তাপীয় অবস্থা কাজ করে। এর অর্থ কোনো সুশৃঙ্খল বিষয়ের

www.pathagar.com

মধ্যে ক্রমান্বয়েই বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আপনি একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন যা সুশৃঙ্খল। কিন্তু কালের সঙ্গে তা বিশৃঙ্খল হতে থাকবে। যে কারণে আপনাকে বাড়িটি মেরামত করতে হবে। এক সময় বাড়িটি মেরামত করেও সুশৃঙ্খল রাখা যাবে না। তা ভগ্নস্তূপে পরিণত হবে। পেয়ালাটি যতক্ষণ টেবিলের ওপর ছিল ততক্ষণ তা উঁচু স্তরের সুশৃঙ্খল অবস্থা। কিন্তু মেঝের ওপর ভাঙা পেয়ালাটি বিশৃঙ্খল অবস্থা। টেবিলের ওপরের অতীতের ভালো পেয়ালা থেকে মেঝের ওপর ভবিষ্যতের ভাঙা পেয়ালার দিকে সহজেই যাওয়া যায় কিন্তু উল্টো দিকে যাওয়া যায় না। এর একটি অর্থ রয়েছে যা কালের অভিমুখ দান করে। বস্তুত কালের এমন তিনটি অভিমুখ রয়েছে যথা (১) তাপগতীয় কালের অভিমুখ (Thermo-dynamical arrow of time) অর্থাৎ কালের যে অভিমুখে বিশৃঙ্খলা (Entropy) বৃদ্ধি পায় এবং কাল অগ্রগামী হয়। (২) কালের মনস্তাত্ত্বিক অভিমুখ (Psychological arrow of time) অর্থাৎ যে অভিমুখে কালপ্রবাহ বা কালের স্রোত বোধ করি- এর অভিমুখে অতীত স্মরণ করি কিন্তু ভবিষ্যত স্মরণ করি না। (৩) মহাবিশ্ব তাত্ত্বিক কালের অভিমুখ (Cosmological arrow of time) অর্থাৎ যে মুখে বিশ্ব সংকুচিত না হয়ে প্রসারিত হচ্ছে।

সাধারণত আমরা কাল অতীতমুখী, বর্তমানমুখী এবং ভবিষ্যৎমুখী এমন সব কথা বলে থাকি। কাল বিষয়ে এমন বললেও কোনো ব্যাখ্যা বা কারণ আরোপ করতে পারি না। এছাড়া কাল এভাবে ত্রিমুখীও নয়। কাল একমুখী। কালের মুখ সম্মুখে অর্থাৎ ভবিষ্যতের দিকে। ঘটনার ক্রমিক অগ্রগামী হতে থাকে। এ অগ্রগামীতায় তাপগতিবিজ্ঞানে সময়ে কালের মুখ, মনস্তাত্ত্বিক কালের মুখ এবং বিশ্বতাত্ত্বিক কালের মুখ সম্মিলিত ভাবে ব্যাখ্যা দেয় কালের অভিমুখ অগ্রগামীতার বা সামনের দিকে। কাল অগ্রগামী হয়। তাই পশ্চাতের ঘটনা অতীত যা স্মরণ করতে পারি। কাল যেখানে এসে দাঁড়ায় তা বর্তমান কিন্তু অভিমুখ ভবিষ্যৎ ঘটনার দিকে।

কাল রেখা (ক চিত্র)

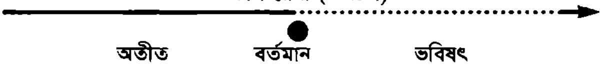

একীভূত কাল রেখা (খচিত্র)

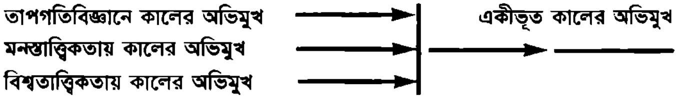

ক চিত্রে কালের অভিমুখ ভবিষ্যতে। কালের তিনটি অভিমুখ খ চিত্রে একীভূত কাল সম্মুখে চলমান। কালের এ তিনটি অভিমুখ কেন কালকে সম্মুখে চালনা করে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে তাদের পরস্পর সম্পর্কে। আর সেটার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের সীমাহীনতার সাথে মানব মনের বোধকে যুক্ত করে। আরো ব্যাখ্যা করা যাবে কেনইবা কালের অভিমুখ পশ্চাত অভিমুখে নয় অর্থাৎ কেন তা সম্মুখ অভিগামী?

প্রথমত তাপগতীয় অভিমুখ এবং মনস্তাত্ত্বিক অভিমুখ নিয়ে ব্যাখ্যা কারা যাক। তাপগতীয় বিধির বিশেষত্ব হল সুশৃঙ্খল অবস্থা থেকে সব কিছুই বিশৃঙ্খলার দিকে। যে কারণে আগে ভালো পেয়ালা পরে ভাঙা পেয়ালা দেখি। ভালো পেয়ালা ভাঙা পেয়ালার দিকে সময় অগ্রগামী হয় এবং তা হয় সুশৃঙ্খল থেকে বিশৃঙ্খল হওয়ার কারণে। তাপগতিবিজ্ঞানের বিধি যদি বিশৃঙ্খলার দিকে না হয়ে শৃঙ্খলার দিকে হতো তাহলে আগে দেখতাম ভাঙা পেয়ালা এবং পরে দেখতাম তা ভালো। এর অর্থ আমাদের মহাবিশ্বের শুরু মসৃণ বা সুশৃঙ্খল থেকে কিনা সে বিষয়ে আলোচনার পূর্বে কেন তাপগতীয় কালের মুখ যেদিকে মনস্তাত্ত্বিক অভিমুখ সেদিকে সে বিষয়ে জানা যাক।

তাপগতীয় কালের মুখ বিশৃঙ্খলার দিকে। অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা যেদিকে বৃদ্ধি পায় কাল সে মুখে অগ্রগামী হয়। অন্য পক্ষে আমাদের মনাত্ত্বিকতায় বিশৃঙ্খলার দিকে যে কাল অতিবাহিত হয় সেদিকেই আমাদের কালের বোধ। কাল ভবিষ্যৎমুখী। টেবিলের ভালো কাপটি মেঝেতে পড়ে ভেঙে টুকরো হতে হতে মেঝেতে তা ছড়িয়ে থেমে গেল। টেবিলের ওপর ভালো অবস্থা থেকে ভেঙে যাওয়ার দৃশ্য অতীত। টুকরোগুলো থেমে যাওয়া বর্তমান। টুকরোগুলোর অবস্থান কোথায় হবে তা ভবিষ্যৎ যা আমরা জানি না।

তাপগতিবিজ্ঞানে সময়ের অগ্রগামীতার সাথে মনস্তাত্ত্বিক অগ্রগামীতায় সময় কেন অগ্রগামী হয় তা আমাদের মস্তিস্কের গঠননির্ভর। হকিং বলেন মানবিক স্মৃতিশক্তি বিষয়ে আলোচনা করা শক্ত, কারণ মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে তা আমরা বিস্তৃত ভাবে জানি না। কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি কীভাবে কাজ করে তা আমরা জানি। কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তির সাপেক্ষে কালের মনস্তাত্ত্বিক অভিমুখ আলোচনার বিষয়টি হকিং ব্যাখ্যা করেছেন।

কম্পিউটারের স্মৃতি নথিভুক্ত করণ এবং মানুষের স্মৃতি নথিভুক্ত করণে মিল রয়েছে। উভয়ের স্মৃতি নথিভুক্ত হয় বিশৃঙ্খলার দিকে। যেমন অবিন্যস্ত তথ্যকে বিন্যস্ত করে। আমাদের মস্তিষ্ক তেমন একটি ভাঙা পেয়ালাকে জোড়া দিয়ে তা আবার শৃঙ্খলায় নিতে পারে। কিন্তু উভয় কাজে শক্তি হিসেবে যে তাপশক্তির ক্ষয় হবে তা সামগ্রিকভাবে বিশ্বের অনেক অনেক বেশি বিশৃঙ্খলা ঘটাবে। সুতরাং কালের অভিমুখ সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিনিষ্ঠ বোধ বা কালের মনস্তাত্ত্বিক অভিমুখ আমাদের মস্তিস্কের ভিতর স্থির হয় কালের তাপগতীয় তীর দিয়ে। কম্পিউটারের

www.pathagar.com

মতে যে ক্রমে বিশৃঙ্খলা বাড়ে সেই সেই ক্রমেই আমরা বিভিন্ন বিষয় স্মরণে রাখি। কালের গতির সঙ্গে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায় তার কারণ যে অভিমুখে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায় সে অভিমুখেই আমরা কাল মাপি।

মহাবিশ্ব যদি বিশৃঙ্খলা দিয়ে সৃষ্টি হতো তাহলে তাপগতীয় কালের মুখে মহাবিশ্ব আরো বিশৃঙ্খল হতো। সেক্ষেত্রে আমরা সৌরজগতের গ্রহ, উপগ্রহকে সূর্য থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে স্ব-স্ব কক্ষপথে যে শৃঙ্খলায় ভ্রমণ করতে দেখি তা হত না। দূরের গ্যালাক্সির তারকাগুলো নিভে যেত। আমরা তেমন বিশ্বকে দেখছি না। তাহলে কি ঈশ্বর একটি শৃঙ্খল থেকে বিশৃঙ্খলার দিকে বিশ্বকে ছেড়ে দিয়েছেন? এ বিষয়ে হকিং কী বলেন—
আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদ (Theory of general relativity) অনুসারে বিশ্ব কীভাবে শুরু হয়েছিল তা জানা সম্ভব নয়। কারণ এ তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্বের আরম্ভের কারণ হিসেবে একক অকক অনন্যতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সে অনন্যতার কোনো বিবরণ তত্ত্ব দ্বারা দেওয়া সম্ভব নয়। অনন্যতার প্রকৃত স্বরূপ কী ছিল তার কোনো সংবাদই জানা সম্ভব নয় যেমন কৃষ্ণগহ্বরের কোনো সংবাদ জানা সম্ভব নয়। বিষয়টি নিছক অনুমাননির্ভর। তা হতে পারে মসৃণ বা শৃঙ্খল কোনো অনন্যতা অথবা তা হতে পারে পিণ্ড পিণ্ড বিশৃঙ্খলা থেকে। তা যদি হয় শৃঙ্খলা থেকে তাহলে তাপগতীয় বিধির কার্যকরিতা থাকবে। কিন্তু যদি হয় বিশৃংখল পিণ্ড পিণ্ড (lumpy) থেকে তা হলে সময়ের তাপগতীয় বিধি থাকত না। কারণ বিশ্ব এতদিনে এতটাই বিশৃঙ্খল হতো যে তা বর্তমান শৃঙ্খলা হারাত। ফলে মহাবিশ্ব কীভাবে শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে আপেক্ষিক তত্ত্ব নিজেই নিজেই নিজের পতনের অনিবার্যতা ডেকে আনল। এক্ষেত্রে হকিং আপেক্ষিক তত্ত্বের পরিবর্তে কণাবাদী তত্ত্ব প্রয়োগে প্রয়াসী। হকিং এর কথায়—

> 'However as we have seen classical general relativity predicts its own downfall. When the curavature of space-time becomes large, quantum gravitational effects will become important and the classical theory will cease to be a good description of the universe. One has to use a quantum theory of gravity to understand how universe began.'- (page-156)
>
> [আমরা কিন্তু দেখেছি প্রচলিত ব্যাপক অপেক্ষবাদ ভবিষ্যদ্বাণী করে নিজের পতনের। স্থান-কালের বক্রতা বৃহৎ হলে কণাবাদী মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং মহাবিশ্বের উত্তম বিবরণরূপে প্রচলিত তত্ত্বের গুরুত্ব আর থাকবে না? মহাবিশ্বের আরম্ভ বুঝতে হলে কণাবাদী মহাকর্ষীয় তত্ত্ব ব্যবহার করতে হবে]

www.pathagar.com

কণাবাদী মহাকর্ষীয় তত্ত্ব (Quantum gravity theory) মহাবিশ্বের সীমানাহীনতার প্রস্তাব করে যা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে জেনেছি। মহাবিশ্বের যদি আরম্ভের সীমানা বিন্দু না থাকে তাহলে অনন্যতা বিষয়ক জটিলতা পরিহার করা যায়। কারণ মহাবিশ্বের তখন কোনো কিনার (edge) থাকবে না। থাকবে না অনন্যতা। মহাবিশ্ব হবে আত্মঅন্তর্ভুক্ত সীমাহীন। মহাবিশ্ব হবে চিরন্তন। এ ক্ষেত্রে হকিং মাল্টিভার্স বা অগণন মহাবিশ্বের অস্তিত্বের প্রবক্তা।

মাল্টিভার্স (Multiverse) বা অগণিত মহাবিশ্বের ধারণাটি এমন যে শতকোটি গ্যালাক্সি নিয়ে যেমন একটি বিশ্ব তেমনি শতকোটি বিশ্ব নিয়ে মহাবিশ্ব। তারপরেও এক একটি বিশ্বের কালের শুরু থাকতে হবে। স্থান-কাল কল্পনাতীত এবং সীমাহীন। তবে স্থান-কালকে আমরা মহাশূন্য বলে যা ভাবি তা নয়। মহাশূন্যের স্থানের কোণ বিন্দু শূন্যস্থান নয়। কণাবাদী তত্ত্ব অনুসারে তা কনায় যা 'কোয়ান্টাম জিটারস বলে হকিং মন্তব্য করেন। এই কোয়ান্টাম জিটারস বা শূন্যস্থানের কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশনে যে কোনো মহাবিশ্ব নিয়মানুগ বা মসৃণতায় শুরু হয়ে অতিস্ফীত অবস্থায় প্রসারমান ছিল। সে ক্ষেত্রে মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ সমরূপ ছিল না কারণ তাহলে কণাবাদী তত্ত্বের অনিশ্চয়তাবাদ লঙ্ঘিত হত। সীমানহীনতার প্রকৃত অর্থ এই হ্রাসবৃদ্ধি হত যতটা সম্ভব অল্প তা অনিশ্চয়তাবাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। মহাবিশ্বের শুরুতে কিছুকাল অতিদ্রুত সম্প্রসারণ হত। আয়তনে মহাবিশ্ব বৃদ্ধি পেত বহুগুণ। এই সম্প্রসারণের সময় ঘনত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রথমে কম থাকত কিন্তু পরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করত। যে অঞ্চলের ঘনত্ব গড় ঘনত্বের চেয়ে সামান্য বেশি সেই সমস্ত অঞ্চলের অধিক অধিক ভরের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের জন্য সম্প্রসারণের হার হ্রাস পেত। শেষে ঐ সমস্ত অঞ্চলের সম্প্রসারণ বন্ধ হত এবং চুপসে গিয়ে তৈরি হত নীহারিকা, তারকা এবং আমাদের মতো জীব।

কালের অভিমুখ বিষয়ে ফিরে আসা যাক। ইতিপূর্বের আলোচনায় বোঝা গেল আমাদের বিশ্ব তাপগতীয় বিধি মেনে চলে, যে কারণে সময়ের হিসেব করা যায় এবং কালের অভিমুখ যেদিকে সেদিকে বিশৃঙ্খলা বাড়ছে। আবার আমাদের মনস্তাত্ত্বিক বোধও কালের স্রোতের সেদিকে যেদিকে বিশৃঙ্খলা বাড়ে। ফলে তাপগতীয় বিধিতে কালের অভিমুখ এবং মনস্তাত্ত্বিক কালের অভিমুখের কোনো বিভেদ নেই। প্রশ্ন হতে পারে তাপগতীয় বিধি কেন? এর উত্তর দিচ্ছে বিশ্ব তাত্ত্বিক বিধি। কালের অভিমুখ বিশ্বতাত্ত্বিক বিধিতে সম্মুখে কারণ বিশ্ব সম্প্রসারণশীল (Expanding)। আমরা এখন যে বিশ্বে আছি তার শুরুটা ছিল মসৃণ বা শৃঙ্খলা থেকে। বিকাশমান কালে বিশ্ব তাপগতীয় বিধি মেনে চলে সে কারণে সময় অগ্রগামী হয়। বিশ্বের সম্প্রসারণ যদি এখন বন্ধ হয়ে সংকোচন শুরু হয় তাহলে সময়ের অভিমুখ

www.pathagar.com

পশ্চাতগামী হবে। অর্থাৎ আমরা ভবিষ্যৎ স্মরণ করব কিন্তু অতীত ভুলে যাবো। কেবল সম্প্রসারণশীল অবস্থায় সময়ের অভিমুখ সম্মুখে। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের অবস্থার শেষ পরিণতি কী? এ বিষয়ে হকিং এর অভিমত তাপগতির বিধিতে বলা যায় মহাবিশ্বে বিশৃঙ্খলা বাড়তে বাড়তে তা এক সময় মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। এখন যে সৌরজগৎ ও নক্ষত্র চিত্র আকাশ দেখি তখন থাকবে না। সে জগৎ হতে পারে অন্ধকারে ঢাকা। তবে এমন বিশৃঙ্খলায় যেতে হকিং এর কথায় লাগবে এক হাজার কোটি বছর। অতএব আপাতত আমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই।

www.pathagar.com

পদার্থবিজ্ঞানকে ঐক্যবদ্ধ করা

The unification of physics

আমরা জ্ঞানার্জন বলতে যা বুঝি তা মূলত বিধি মোতাবেক জেনে নেওয়া বা বর্ণনা করা। আপনার ২ বা ৩ বছরের শিশু সন্তানটির সামনে পেন্সিল, লেখার খাতা, বই রেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোনটি পেন্সিল, কোনটি খাতা, কোনটি বই? সে ঠিক ঠিক উত্তর দিল। উত্তর শুনে আপনি খুশি হলেন। কিন্তু ভেবে দেখেছেন কী, কেন সে সঠিক উত্তরটি দিতে পেরেছে? এখানেই জ্ঞানের কথা আছে। ঐ তিনটি বস্তুর আকার, আয়তন, রঙে পার্থক্য আছে। অর্থাৎ তিনটি বস্তুর তিনটি বিধি। ঐ বিধিগুলো শিশুটি ইতিপূর্বে তার মস্তিস্কে ধারণ করেছে। আর বিধি অনুসারে শিশুটি পেন্সিল, খাতা বইয়ের জ্ঞান অর্জন করেছে। এখন আপনি আপনার চারপাশের বস্তুসহ সাগর, পাহাড়, ঝড়, প্লাবন, উৎপাদন, বিপণন, যোগাযোগ, দেশ, মহাদেশ, পৃথিবীর আকার আয়তন, গতি স্থিতি তথা মহাবিশ্বকে জানতে চান। এ জানার কৌশল একটাই আর তা হলো বিধি মোতাবেক তা জানতে হবে। হয়তো আমরা এ ভাবে ভাবি না। কিন্তু আপনার জ্ঞান ভাণ্ডার বৃদ্ধিতে সর্বাধিক বিধির আয়ত্বে তা কাজ করে।

এ বিশ্ব অগণন বস্তু, অগণন ঘটনা, অগণন আচরণের বিশ্ব। ঘটনার তালিকা অগণন হলেও তাকে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। যেমন মানুষ, গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি। অনুরূপ ঘর, বিছানা, আসবাবপত্রসহ বস্তু ও ভাবনার শ্রেণিকরণে বিশেষ বিধিতে তারা সংজ্ঞায়িত। আসলে এসব বিধিতে আমরা পারিপার্শ্বিকতা বিষয়ে যেমন জানি, তেমন বস্তু, বিশ্ব তথা মহাবিশ্বকে এভাবেই জানতে হয়।

প্রকৃতির ঘটনাসমূহ বিধি মোতাবেক ঘটে। এসব বিধি একবার জানা গেলে সে বিধিতে প্রকৃতির আচরণের ভবিষ্যৎ ঘটনা বিষয়ে সম্ভাব্য ভবিষ্যদ্বাণী (Predication) করা যায়। আকাশে মেঘের ঘনঘটায় বৃষ্টিপাত হয়। মেঘশূন্য আকাশ দেখে সহজেই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায়। আমরা এখন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, ঝড়, প্লাবনের গতির বিধি নিখুঁতভাবে বর্ণনা দিতে পারি। কেবল প্রকৃতির বিধিই নয়, মানুষ ঘটনাকে চিহ্নিত করতে নিজেই বিধি উদ্ভাবন করেছে। মহাশূন্যে আবর্তনকারী গোলাকার পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম বলে

www.pathagar.com

কোনো দিক নেই। অথচ পৃথিবীর বুকে স্থান, ঘটনাকে চিহ্নিত করতে আমরা তা চারটি বিধি রচনা করেছি।

পদার্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল পদার্থিক জগতের আচরণ বিষয়ে জানা। পদার্থিক জগতকে এক অর্থে প্রকৃতি (Nature) বলে থাকি। প্রকৃতির নিজস্ব একটা ভাষা বা আচরণ আছে যাকে সহজ অর্থে বলি প্রাকৃতিক কারণ। ঐ কারণগুলোর অন্তর্নিহিত সংযোজনকারী বিষয়গুলো সুবিন্যস্ত কাজটি হল বিধি। প্রকৃতির আচরণের প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এর কর্ম প্রবাহ এলোমেলো নয়। বিশেষ নিয়ম বা ধারাবাহিকতা মেনে চলে। দিনের পরে রাত বা রাতের পরে দিন, তারকাদের অবস্থানের পরিবর্তন, ধুমকেতুর আগমন, চন্দ্র সূর্য গ্রহণ, বায়ুর চলাচল, ঋতুর পরিবর্তন, বৃষ্টিপাত, ঝড়, প্লাবন, জীবন, মৃত্যু নিয়মবদ্ধ ঘটনা। আবার এসব যে নিয়মবদ্ধ ঘটনা মানুষ তা জেনেছে সভ্যতা বিকাশেরও অনেক পরে। পূর্বে এসব ঘটনাকে মানুষ অলৌকিক বা প্রকৃতির বাইরের কোনো শক্তির কাজ বলে ভাবত। কেবল বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে এখন তা প্রকৃতির বিধি বলে মেনে নিয়েছে। বিশ্বজগতের বস্তু সম্ভারের মতোই জগতে বিধির সম্ভার। তবে বস্তুর শ্রেণিকরণের ওপর ভিত্তি করে বিধির শ্রেণিকরণ করা গেছে। শ্রেণিগত এসব বিধিকে বলা হয় আংশিক বা পার্শিয়াল বিধি (Partial theory)। বিধিতে বিশ্বকে দেখা অনেকটা মানচিত্রে পৃথিবী, সাগর, মহাসাগর, দেশ, মহাদেশ, দেখার মতো। শ্রেণিকরণ ভিত্তিক আংশিক বিধি অগণন হলেও বিজ্ঞান মোটা দাগে একে দুই ভাগে ভাগ করে। এর একটি দৃশ্যমান বৃহৎ বস্তুর আকার, আয়তন, অবস্থান, ওজন, গতি শক্তির বিধি। অন্যটি ঐ বস্তুর গাঠনিক ক্রিয়ার মূলের বিধি। প্রথমটি আংশিক তত্ত্ব হিসেবে আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of relativity) এবং দ্বিতীয়টি কোয়ান্টাম বা কণাবাদী আংশিক তত্ত্ব।

মানুষ মহাবিশ্বের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত নিবদ্ধ করেছে প্রকৃতির গুচ্ছ গুচ্ছ বিধি আবিষ্কারের ফলে। পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্বের পরিবর্তন হয় কপারনিকাসের মডেল থেকে। কেপলার, গ্যালিলিও সূর্য কেন্দ্রিক সৌরজগতের তত্ত্ব হাজির করেন। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং গতি, ভর, ওজনের বিধিসমূহ বিশ্বকে ভিন্নভাবে ভাবতে সুযোগ করে দেয়। স্মরণকালের বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের বিশেষ ও আপেক্ষিক তত্ত্বে আলোকের সীমিত গতি, স্থান ও কাল, শক্তির বিকাশ, ভরশক্তির সমতা, মহাকর্ষের প্রভাব বলয়ে জগত সৃষ্টির নিগূঢ় বন্ধনের বিধি উপস্থাপন করেন। জাগতিক ঘটনাসমূহ, মহাজাগতিক বস্তুর গঠন, কাঠামো, বিনাশ সকল বিষয়ে সে তত্ত্বে আমরা ব্যাখ্যা দিতে পারি।

অন্যপক্ষে বৃহৎ বস্তু গঠনের মূলে কী উপাদান? এ প্রশ্নে বস্তুকে বিভাজন ক্রিয়ায় মূলের সন্ধানে ডেমোক্রেটিয়াস, ডাল্টন, থমসন, ডিরাক, চ্যাডউইকের গবেষণায়

www.pathagar.com

পাওয়া গেল পরমাণু, পরমাণুর উপাদান, পরমাণুর গঠনসহ পরমাণু বিধি। উল্লেখিত বিধিতেই আমরা এখন যেমন মহাজাগতিক খবর জানি, তেমনি দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ রেডিও, টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল ফোনসহ ইলেক্ট্রনিকস সামগ্রীতে সভ্যতার প্রশস্ত পথ নির্মাণ করে চলেছি। মূল কথা এসব বিধিতেই আমরা কাছের ও দূরের বিশ্বকে চিনি। এসকল আংশিক বিধিকে ঐক্যবদ্ধ করা পদার্থবিদদের সুপ্রাচীন প্রয়াস। আইনস্টাইন জীবনের শেষ কয়েক বছরের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন এরকম একটি তত্ত্বের সন্ধানে। কিন্তু সফলতা পাননি। এর একটি কারণ হতে পারে তখন এরকম ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কারের সময় আসেনি। ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের উদ্দেশ্য একটি মাত্র কারণ বা বিধি জানা যা দ্বারা বিশ্বের মূল গঠনের কারণ জানা যাবে। মনে করা যাক একমাত্র প্রোটন পদার্থ গঠনের মূল উপাদান। তাহলে কেবল প্রোটন গঠনের বিন্যাসের বিধিতেই জগত গঠনের কারণ বলা যেত। এ বিষয়ে প্রচলিত এরকম একটি কথা আছে যে, ১৯২৮ সালে নোবেল বিজয়ী ম্যক্সবর্ণ গয়েটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল সাক্ষাৎকারীকে বলেছিলেন "আমরা যাকে পদার্থবিজ্ঞান বলি ছ'মাসেই তার সমাপ্তি ঘটবে।" তার এ বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল ডিরাকের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রনের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সমীকরণ আবিষ্কার। আর তখন পর্যন্ত প্রোটনই ছিল জানা মূল কণিকা। আর তিনি বিশ্বাস করতেন এমন একটি সমীকরণ অচিরেই আবিষ্কৃত হবে যা প্রোটনের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবে। আর এতেই পদার্থবিজ্ঞানের কৌতূহল শেষ হবে। কিন্তু তারপর নিউট্রন এবং কেন্দ্রকীয় বলের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমরা কিন্তু এতসব তত্ত্বের বদলে একটি তত্ত্বই পেতে চাই যা সকল বিষয়ের কারণ বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে আমরা সহজেই ঈশ্বরতত্ত্বে নির্ভরশীল হতে পারি। কিন্তু সে তত্ত্বও নিয়মানুগ হতে হবে। তা যদি হত তাহলে এত মত, এত পথ, এত ধর্ম কেন? তাহলে এটাই কি ঈশ্বরের বিধি? ঈশ্বরের অবস্থানগত অবস্থা কী? বা তিনি কীরূপে সৃষ্ট? তিনি কেনই বা এমন সব বিধি দিলেন যা দিয়ে বিশ্বকে বুঝি কিন্তু কেন তিনি বিধির অতীত হলেন? এ কারণে বিজ্ঞান তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব তালাশে তৎপর আছে। এ বিষয়ে হকিং বলেন— 'I still believe there are grounds in cautions optimism that we may now be near the end of the search for the ultimate laws of the nature. (page-164)। তবুও আমি বিশ্বাস করি সতর্ক আশাবাদের যুক্তি রয়েছে। আমরা হয়তো প্রকৃতির চূড়ান্ত বিধি অনুসন্ধানের শেষ প্রান্তের কাছাকাছি এসে গেছি। এ লক্ষ্যে তিনি মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব (Grand unified theory-Gut অতিমহাকর্ষ তত্ত্ব' (Super gravity theory) 'তন্তু তত্ত্ব' (String theory)mn নিজের মতামত এ অধ্যায়ে ব্যক্ত করেছেন।
পদার্থবিজ্ঞানের ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের উদ্দেশ্য মূলত মহাকর্ষ বল, বৈদ্যুতিক বল, চুম্বকীয়

www.pathagar.com

বল, সবল বল, দুর্বল বলকে এক বলে একীভূত করা। জগতকে আমরা বুঝতে চাই ঘটনার ব্যাখ্যায়। সকল ঘটনাতেই থাকে বল বা শক্তির ক্রিয়া। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে পারস্পারিক মহাকর্ষ বলের টানে স্থির দূরত্বে পৃথিবী স্থিতিশীল। অনুরূপ চাঁদ ও পৃথিবী ভারসাম্য রক্ষা করে আবর্তিত হচ্ছে। এদিকে বস্তুর মূলে রয়েছে ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, নিউক্লিয়াস। এসব কণার পারস্পারিক ক্রিয়ায় সবল, দুর্বল ও বৈদ্যুতিক বলের প্রকাশ পায়। বস্তুর বল বলতে বোঝায় বস্তুর গঠনের মূলে কণা প্রতিকণার ক্রিয়া যে ক্রিয়ায় কণা বলবাহী হয়। বৃহৎ শক্তির ক্ষেত্রে হয়তো আমরা তা বুঝি না কিন্তু সকল ঘটনার মূলে কাজ করে কণিকার পারস্পারিক ক্রিয়া (Particle interaction) বল। পার্টিকেলস্ যন্ত্রে কণাকে বলবাহী করা যায়। যেমন বিদ্যুৎ বল, পারমাণবিক বল ইত্যাদি।

চারটি বলের চারটি বিধি। এই বিধিগুলোর ফলাফলও ভিন্ন। যেমন মহাকর্ষ তথা আপেক্ষিক বিধিতে কালের একটা সীমানা বা মহাবিশ্বের অনন্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ বিশ্বের একটি সীমানা আছে, যে সীমানায় বিশ্বের শুরু। কিন্তু কণাবাদী তত্ত্বে বিশ্ব সীমানাহীন। ফলে এ তত্ত্বে অনন্যতা প্রকল্পের প্রয়োজন হয় না। কণাবাদী তত্ত্বে কণার অবস্থান ও গতির প্রশ্নে রয়েছে অনিশ্চয়তাবাদের নীতি। এই নীতি বিজ্ঞানে ধ্রুব সত্য। যা মেনে নিয়েই বিজ্ঞান সেভাবে বিশ্বের বিকাশ ব্যাখ্যা করে। এই নীতি অনুমোদন করে যে শূন্য স্থানও জোড়া জোড়া কল্পিত কণিকা ও কল্পিত বিপরীত কণিকায় পূর্ণ। এই জোড়াগুলোতে শক্তি থাকবে অসীম। অতএব আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E = Mc^2$ অনুসারে তাদের ভর হবে অসীম। তাদের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ মহাবিশ্বকে বক্র করে অসীম ক্ষুদ্র আকারে নিয়ে আসবে কিন্তু এমনটি আমরা ঘটতে দেখছি না। একারণেই পদার্থবিজ্ঞানে একক বলের তথা একটি বিধির সন্ধান—যা পদার্থবিজ্ঞানের আংশিক সকল তত্ত্বকে ঐক্যবদ্ধ করবে।

বলগুলোকে একক বিধিতে আরোপ করা সম্ভব কিনা? এ প্রশ্নে বিজ্ঞানীদের মতভেদ থাকলেও বলের ঐক্যবদ্ধতার ইতিহাস আছে। ইলেক্ট্রিক এবং ম্যাগনেটিক বা বিদ্যুৎ ও চুম্বকীয় বলের বিধি ভিন্ন ভিন্ন ভাবা হত। কিন্তু ম্যাক্সওয়েল এ দুটি বলকে একই বলের রূপান্তর বলে ব্যক্ত করেন যা এখন বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলে (Elecro-magnetic force) পরিচিত। ওয়াইনবাগ ও আব্দুস সালাম দুর্বল বলকে আবার বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলে একীভূত করেন। ফলে এখন মূল বল তিনটি যথা—মহাকর্ষ বল, ইলেক্ট্রোউইক বল ও সবল বল। মহাকর্ষ বলে মহাজাগতিক গঠন, ইলেক্ট্রোউইক বলে বিকিরণসহ দৈনন্দিন ধীর গতির ঘটনা এবং সবল বলে পারমাণবিক উচ্চশক্তির সংগঠন আমরা দেখতে পাই।

বলকে একীভূত করার সফলতায় 'মহান ঐক্যবদ্ধ বলে'র (Grand Unified Theory-GUT) তত্ত্বের প্রস্তাবনা করা হয়। এ বিষয়ে হকিং এর বক্তব্য হল

www.pathagar.com

ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তথা ইলেকট্রউইক ফোর্সকে সবল বলে একীভূত করার প্রয়াস সফল হলেও তা মহাকর্ষ বলে কীভাবে একীভূত হবে? মহাকর্ষ বল কণাবাদী বল নয়।

এ সমস্যার সম্মুখীন হলে বিজ্ঞানীগণ ১৯৭২ সালে 'অতিমহাকর্ষ' (Super gravity) নামে একটি সম্ভাব্য সমাধান উপস্থাপন করেন। মহাকর্ষ বলের 'গ্রাভিটন' (Graviton) নামে চক্রণ-২ কণিকা মহাকর্ষীয় বল বহন করে। তারা প্রস্তাব করেন সূর্য ও পৃথিবীর আকর্ষণ পরস্পর গ্রাভিটন কনিকা বিনিময়ের ফল। কিন্তু গ্রাভিটন কল্পিত ওজনহীন কথা। বলবাহী কণা ইলেক্ট্রন, প্রোটনের সাথে তা কীভাবে সমন্বয় করা যাবে? গণনার ক্ষেত্রেও তা জটিল ও অসীমতা প্রকাশ করে। ফলে একক বল যা সব কণার বলের উৎস হিসেবে কাজ করবে এ প্রশ্নে 'অতিমহাকর্ষ' অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় এ তত্ত্ব বর্জন করা হয়।

এরই মধ্যে ১৯৮৪ সালে তন্তু তত্ত্বের (String Theory) স্বপক্ষে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। এই তত্ত্বের বিশেষত্ব হলো সাবএ্যাটোমিক লেভেলে বিশেষ কোনো কণিকা নয়; কণিকাগুলোর অবস্থান স্থানের একটি বিন্দুতে। এই তত্ত্বে মূলগত বস্তুর দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু কোনো মাত্রা (Dimension) নেই। এগুলো অসীম অতিপাতলা (thin) তন্তু বা সুতার মতো। এই তন্তুগুলোর মুক্ত তন্তুর মতো প্রান্ত থাকতে পারে কিংবা একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে বদ্ধ ফাঁস বা জালের মতো হতে পারে। এ তত্ত্বের মূলগত তাৎপর্য হল একটি কণিকা কালের প্রতিটি ক্ষণে স্থানের প্রতিটি বিন্দু ও অধিকার করে থাকে। ফলে স্থান কাল হবে একটি রেখা যা বিশ্বরেখা (world line) বলা যায়। এটা কণিকার ইতিহাসের প্রতিনিধি হতে পারে। অন্যদিকে একটি তন্তু কালের প্রতিক্ষণে স্থানের একটি রেখা অধিকার করে থাকে। সুতরাং স্থান কালের ইতিহাসে তা একটি দ্বিমাত্রিক (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ) পৃষ্ঠ। এর নাম বিশ্বপাত (World Sheet)। এরকম একটি বিশ্বপাতের যে কোনো একটি বিন্দুর ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে দুটি সংখ্যা দিয়ে। একটি সংখ্যা নির্দেশ করে কাল, অন্যটি নির্দেশ করে তন্তুর ওপর বিন্দুটির স্থান। একটি মুক্ত তন্তুর বিশ্বপাত একটি ফালি (strip)। এর কিনারগুলো তন্তুর প্রান্তগুলোর স্থান-কালের ভিতর দিয়ে পথের প্রতিরূপ।

তন্তু তত্ত্ব ১৯৬০ এর দশকের শেষ দিকে আবিষ্কৃত হয়েছিল সবল বল ব্যাখ্যার একটি তত্ত্বের জন্য। এ সময় চিন্তনটি ছিল প্রোটন কিংবা নিউট্রনের মতো কণিকাগুলোকে তন্তুর ওপর তরঙ্গরূপে কল্পনা করা যায়। কণিকাগুলোর অন্তর্বর্তী সকল ফলগুলো 'অন্যান্য' তন্তুখণ্ডের ভিতর দিয়ে গতিশীল একাধিক তন্তুখণ্ডে তা যেন মাকড়সার জাল। এ সময় এ গবেষণা বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেনি কারণ তখন অধিকাংশ বিজ্ঞানী সবল বলের (strong force) মূল তন্তুতত্ত্ব পরিত্যাগ

www.pathagar.com

করেন। তারা গ্রহণ করেন 'কার্ক' (quark) এবং গ্লুয়োন (gluon) তত্ত্ব।

১৯৮৪ সালে হঠাৎ তন্তুতত্ত্বের ওপর আকর্ষণ পুনরায় ফিরে আসে। ধারণা ছিল যে কণিকাগুলো পর্যবেক্ষণ করা যায় সেগুলো অতিমহাকর্ষ (super particle) ব্যাখ্যা করতে পারে। আর একটি কারণ উপস্থাপন করেন লন্ডনের কুইন মেরী কলেজের জন শোয়ার্জ এবং মাইক গ্রীন। তারা এক গবেষণাপত্রে দেখান তন্তুতত্ত্ব আমরা যে কণিকাগুলো পর্যবেক্ষণ করি সেগুলোর ভিতর গ্রামমুখীতা আছে। (এ গ্রন্থের Elementary particle and force of nature অধ্যায়ে আলোচিত) সে রকম কণিকার অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। কারণ যাই হোক, অনেকেই তন্তু তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। এই তত্ত্বের একটি নতুন রূপ বিকাশ লাভ করে যার নাম হেটরেটিক তন্তু (Hetorotic string theory) তত্ত্ব। মনে হয়েছিল এ তত্ত্ব আমাদের পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন কণিকার ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

তন্তুতত্ত্বগুলোর বৃহত্তর সমস্যা আছে। তন্তুতত্ত্বগুলো সামঞ্জস্য হবে যদি সাধারণভাবে চারমাত্রার পরিবর্তে স্থান-কালের মাত্রা হয় দশ বা ছাব্বিশ। সাধারণ ভাবে আমরা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার তিন মাত্রার জগতের সাথে পরিচিত। গভীর জ্ঞানে আইনস্টাইনের স্থান-কালের আর একমাত্রা যোগ করে চারমাত্রার বিশ্বকে চিনি। মাত্রা যদি চারের ওপর দশ বা ছাব্বিশ হয় সে জগতের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা কেমন হবে তা অনেকটা বিজ্ঞানের কল্পকাহিনীর মতো। যেখানে যে কোনো জীব বা বস্তু যে কোনো সময় বা অবস্থায় রূপ বদলাতে পারে। তার গমণাগমনের পথে বাধা নেই। তবে আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে আলোর গতির বেশি গতিতে কোনো কিছুই চলতে পারে না। এ পর্যায়ে হকিং এ অধ্যায়ের শেষে তিনটি প্রশ্ন রেখেছেন—

(১) একটি ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব সত্যিই কী রয়েছে? আমরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান হলে কোনো না কোনো দিন আমরা সে তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারব? অথবা আমরা কি কোনো মরীচিকার পিছনে ছুটছি?

(২) আসলে মহাবিশ্বের চূড়ান্ত কোনো তত্ত্ব নেই। শুধু রয়েছে বহু তত্ত্বের অসীম পরম্পরা। যে তত্ত্বগুলো ক্রমশই অধিকতর নির্ভুলভাবে মহাবিশ্বের বিবরণ দান করছে।

(৩) অথবা মহাবিশ্বের কোনো তত্ত্ব নেই। একটি বিশেষ সীমার বাইরে ঘটনাবলী সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। ঘটনাগুলো ঘটে এলোমেলোভাবে, যাদৃচ্ছকতায়।

www.pathagar.com

হিগস-বোসন—ঈশ্বর কণা বিতর্ক

৪ জুলাই ২০১২ ইউরোপীয় সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ তথা সার্ন ঘোষণা দেয়, ঈশ্বর কণা (God particle) সদৃশ একটি কণার সন্ধান তারা পেয়েছেন। লন্ডনে সার্নের এক সংবাদ সম্মেলনে ব্রিটেন সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির ফ্যাসিলিটিস কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী জন উমার্সলী বলেন, 'একটি নতুন কণা আবিষ্কারের বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। যা হিগস-বোসন তত্ত্বে উল্লেখিত কণার সাথে যথেষ্ট মিল আছে।'

গবেষণা কর্মের মুখপাত্র জো ইনকেনডেলা জেনেভায় নতুন কণা আবিষ্কারের ঘোষণায় বলেন, 'এটি প্রাথমিক ফলাফল। তবে আমরা মনে করি এ ফল যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য।' উল্লেখ্য সার্ন কর্তৃপক্ষ ৪ জুলাই জেনেভায় জাঁকালো এক অনুষ্ঠানে এ ধরণের নতুন কণা আবিষ্কারের ঘোষণা দিলেও এর শুরুটা হয়েছিল ২০০৮ সালে। সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সের সীমান্তে ২৭ কিলোমিটার বৃত্তাকার তিন কিলোমিটার মাটির নিচে এক হাজার কোটি পাউন্ড ব্যয়ে বিশ্বের প্রায় এক হাজার বিজ্ঞানী এ যাবৎকালের বিজ্ঞানের সবচেয়ে ব্যয়বহুল এবং বৃহৎ গবেষণাগার নির্মাণে ঈশ্বর কণার সন্ধান চলছিল। এ পর্যন্ত তিনবার তারা এ গবেষণা চালায় কিন্তু নিশ্চিত ফলাফল ঘোষণা করেনি। কেবল ৪ জুলাই ২০১২ তারা অনেকটা নিশ্চিত ঘোষণা দিলেন তবে এ কথাও বলা হয়েছে আরো পরীক্ষা নীরিক্ষার পর সুনিশ্চিতভাবে বলা যাবে এটা 'পিটার হিগস' প্রস্তাবিত কণা কিনা? সংবাদটি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানপ্রেমী, বোদ্ধাজন, দার্শনিকসহ উৎসুক পাঠক মহলে হৈ চৈ পড়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হলো এই নব আবিষ্কৃত কণাটি কী? নামকরণে কখনো হিগস-বোসন (হিগস পার্টিকেল) আবার কখনো ঈশ্বর কণা (গড পার্টিকেল) কেন? পদার্থবিজ্ঞানের কণাবাদী তত্ত্বে (কোয়ান্টাম ম্যাকানিকজমস) সাব এটোমিক এলিমেন্টরি পার্টিকেল বিষয়ের পরিসংখ্যান বিষয়টি এর অধ্যায়ন। পদার্থের মূল গঠন ক্রিয়ায় আছে পরমাণু। পরমাণু গঠনক্রিয়ায় আছে আরো ক্ষুদ্র কণা ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, কোয়ার্কের মতো ভর বহনকারী কণা। এদের বলা হয় পদার্থ কণিকা বা ম্যাটার পার্টিকেল (Matter perticle)। পদার্থ কণিকা পার্টিকেল বিজ্ঞানের ফারমিয়নস (Farmions) গ্রুপভুক্ত। ফারমিয়নস নামটি এসেছে বিজ্ঞানী

www.pathagar.com

এনরিকো ফার্মীর নাম অনুসারে। যে সব মৌলিক কণিকা ফার্মী ডিরাক উদ্ভাবিত পরিসংখ্যান তত্ত্ব মেনে চলে তাদের একত্রে বলা হয় ফারমিয়ন। এনরিকোফর্মী ১৯০১ সালে রোমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরে যুক্তরাষ্ট্রে পরমাণু বোমা তৈরিতে ভূমিকা রাখেন। তার উদ্ভাবিত এটমিক পাইল পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। ফারমিয়ন গ্রুপের কণিকাসমূহের আছে ভর। এসব কণিকার ভর না থাকলে কখনো পরমাণু গঠন তথা কোনো পদার্থই সৃষ্টি হত না। ছুটন্ত আলোর বেগে, তারা থাকত বিচ্ছিন্ন। কেউ কারো সাথে ঘর বাঁধতো না। কিন্তু ফারমিয়নস গোষ্ঠীভুক্ত পদার্থ কণিকার এই ভর বা শক্তি তার নিজের নয়। এই ভর বা বল বা শক্তি যাই বলা হোক তা আসে অন্য যে সব কণিকা থেকে তা বোসন (Boson) গোষ্ঠীভুক্ত। এ গোষ্ঠীভুক্ত কণিকা শক্তিকণা (Force particle) বলেও পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে একে কল্পিত কণিকা বা ভার্চুয়াল (Virtual) পার্টিকেল বলা হয়। যেমন আলোক কণিকা ফোটন, মহাকর্ষ কণিকা গ্রাভিটন, পরমাণু ও নিউক্লিয়াসে গ্লুয়োন, ওয়াইনবার্গ ও আব্দুস সালাম আবিষ্কৃত W^+, W^-, Z^0 এসব কণিকা বোসন গোষ্ঠীভুক্ত। এসব কণিকার মধ্যে কিছু কিছু কণিকা ভরযুক্ত আবার কিছু কিছু কণিকা ভরমুক্ত। যেমন ফোটন ও গ্রাভিটন।

পদার্থ কণিকার গোষ্ঠীভুক্ত কণিকা ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন জে জে থমসন। ইলেকট্রন আবিষ্কারের বেশ কিছুকাল পরে ১৯১১ সালে রাদার ফোর্ড আবিষ্কার করেন প্রোটন। এরপর ১৯৩২ সালে কেমব্রীজের রাদার ফোর্ডের সহকর্মী জেমস স্যাডউইক আবিষ্কার করেন নিউট্রন। এর অনেক পরে ক্যালটেক পদার্থবিদ গ্যারে গোলম্যান আবিষ্কার করেন কোয়ার্ক। এ আবিষ্কারে ১৯৬৯ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

অন্যদিকে কল্পিত কণিকা যা পদার্থ কণিকাকে ভর যোগায় এর উদ্ভাবন ক্রিয়া শুরু হয় বিজ্ঞান জগতের এক অহংকারী নাম সত্যেন্দ্রনাথ বসুর হাতে। তাঁকে কোয়ান্টাম ম্যাকানিক্সের জনক বলা যায়। কারণ তার প্রস্তাবিত সূত্র ধরেই পরবর্তীতে পদার্থবিজ্ঞানের স্টান্ডার্ড মডেলটি গড়ে ওঠে। বিজ্ঞান জগতের অগ্রগামীতায় বলবাহী কণিকার বিশ্লেষণে উদ্ভাবিত কণিকাকে সত্যেন বসুর নামে বসু কণা বা 'বোসন' গোষ্ঠীভুক্ত কণা বলা হয়। সালাম ও ওয়েনবার্গ আবিষ্কৃত W^+, W^-, Z^0 কণিকা ভেক্টর বোসন (Vector Boson) নামে পরিচিত। পিটার হিগস প্রস্তাবিত যে কণাটি সার্ন আবিষ্কারের দাবি রাখছে তার নাম হিগস-বোসন। কণাটি বোসনভুক্ত। যেহেতু প্রস্তাবনা হিগসের তাই হিগস-বোসন। তবে তা ঈশ্বর কণা কেন? এ বিষয়টি আলোচনার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ বসু নির্দেশিত বোসন মডেলটি জানা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৮৯৪ সালে ১ জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ৫ম এবং ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। গণিতে অনার্সসহ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বিএ পাশ করেন। মিশ্রগণিতে ১৯১৫ সালে প্রথম স্থান লাভ করে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণায় রত হন। এ সময় তিনি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার সাহচর্যে আসেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সত্যেন্দ্রনাথ বসু পদার্থবিদ্যা বিভাগের রিডার পদে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটানা ২৪ বছর অধ্যাপনা কালে তার গবেষণাকর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে পদার্থবিজ্ঞান নতুন ডাইমেনশনে বিকাশ লাভ করে। পদার্থবিদ্যা ও এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি তাঁর গবেষণার বিষয়। ১৯২৪ সালে 'প্লাঙ্কসল এ্যান্ড দ্য লাইট কোয়ান্টাম হাইপোথিসিস' গবেষণাপত্রটি কণাবাদী পরিসংখ্যান বিজ্ঞান বা কোয়ান্টাম ম্যাকানিক্সের পথিকৃত। সত্যেন্দ্রনাথ গবেষণাপত্রটি আইনস্টাইন বরাবর প্রেরণ করেন। আইনস্টাইন তা পাঠ করে বিস্মিত হন। এতদিনে ম্যাক্সওয়েল-বোলজমান স্ট্যাটিসটিক্স এবং প্লাংকের আলোক বিকিরণ তত্ত্বে যা জানা ছিল তার কোথাও যেন সামান্য অমিল। কিন্তু আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণাপত্রটি পাঠ করে সে অমিলের সন্ধান খুঁজে পান। চার পৃষ্ঠার গবেষণা পত্রটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে আইনস্টাইন 'সাইট ফুইর ফিজিক' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই পদ্ধতিটি বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিসটিকস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং এখান থেকেই কোয়ান্টাম স্ট্যাটিসটিকসের সূচনা।

কী এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ঐ গবেষণাপত্রে যা পরবর্তীতে কণাবাদী বিজ্ঞান বা কোয়ান্টাম ফিজিক্স ফারমিয়ানস ও বোসন গোষ্ঠীভুক্ত কণিকায় বিভক্ত হল? এটাই হবে মূল বিষয়। সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বে ম্যাক্সওয়েল বোলজম্যান স্ট্যাটিকসে পদার্থের অণুকে পৃথক পৃথক ধরা হত। যেন তাপ পেলে অণুগুলো আলাদা আলাদা আচরণ আরম্ভ করে দেয়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের সূত্র অনুসারে তাপে অণুরা সরে দাঁড়ায় এবং তাদের মধ্যে একটি গতির বৃদ্ধি সঞ্চারিত হয়। এর ফলে উত্তপ্ত পদার্থ দৈর্ঘ ও প্রস্থে বেড়ে যায়। সত্যেন্দ্রনাথ তার নতুন পদ্ধতিতে অণুর স্বাতন্ত্রটি অস্বীকার করে দেখালেন এরা এক-একটা গুচ্ছে ঘোরাফেরা করে, একেবারে স্বতন্ত্র বা এককভাবে নয়। অণুরও ক্ষুদ্র একটি অংশ যে প্রোটন—তিনি তার ওপর এ পদ্ধতি ব্যবহার করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন ধারার সৃষ্টি করেন। পদার্থবিজ্ঞান পরবর্তী ধাপে পদার্থ কণিকা ফারমিয়নস গোষ্ঠীভুক্ত কণিকা কীভাবে ভর তথা বল গ্রহণ করে তা সত্যেন্দ্রনাথ বসু অনুসৃত নীতির ওপর ভর করে বিকাশ লাভ করেছে। এই প্রবাদ প্রতিম বিজ্ঞানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার ২৪ বছর পরে ১৯৪৫ সালে

www.pathagar.com

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালে এমিরিটাস অধ্যাপক এবং অবসরে দুই বছর বিশ্বভারতীর উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৮ তে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়। কলকাতা বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' এবং ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত। ১৯৭৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আবার ফিরে আসি হিগস বোসনে। হিগস-বোসন কী? হিগস-বোসন কেন? এ দুটি প্রশ্নের উত্তরে আমারা অর্থাৎ সাধারণ পাঠক সম্যক জ্ঞান অর্জন করব বলে আশা রাখি। পদার্থবিজ্ঞান, পদার্থ গঠনের মূল সূত্র সন্ধানে ব্যস্ত। এ পর্যায়ে কণিকা তত্ত্বই দিতে পারে সন্ধান। কারণ আগে পদার্থকে যেভাবে অবিচ্ছিন্ন ভাবা হত এখন দেখা যায় তা ছিন্ন করে ভাঙতে ভাঙতে এটম (এটম শব্দের অর্থ অবিভাজ্য-Uncutable) পর্যন্ত পৌছানো যায়। পরবর্তীতে জানা গেল এ পরমাণুও ভেঙে দেখা সম্ভব। এর ফলে পাওয়া গেল ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রনের মতো কণা যা সাধারণভাবে অণু বলে পরিচিত। অর্থাৎ পরমাণুর রয়েছে একটি গঠন কাঠামো। কেবল গঠন কাঠামো জানলেই হবে না। এসব কণিকা বিশেষ করে ইলেক্ট্রন এবং প্রোটন চার্জ বা শক্তির বিকাশ ঘটায়। শক্তি আসে এদের ভর থেকে। ভর অণুদের স্থায়িত্ব দান করে। কিন্তু ভর বা বল বা শক্তি যাই বলা হোক তা আসে কীভাবে এবং কোথা থেকে? এ প্রশ্নে গড়ে ওঠে সাব এ্যাটোমিক লেভেলে মৌলকণা তত্ত্ব (Elementary particles theory)। এ তত্ত্বে পাওয়া গেল পদার্থ কণিকা বা ম্যাটার পার্টিকেল (Farmions) এবং বলবাহী বা ফোর্স পার্টিকেল (Bosons)। উভয় শ্রেণির কণিকার আবার রয়েছে বিশেষ একটি ধর্ম তা হলো চক্রণ (Spin)। বলবাহী কণিকার পূর্ণসংখ্যার চক্রণ যথা ০, ১ ও ২ শ্রেণিভুক্ত। আর পদার্থ কণিকার বা অর্ধেক চক্রণ শ্রেণিভুক্ত। উল্লেখ্য যে সমস্ত কণিকার চক্রণ অর্ধেক যেমন ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, কোয়ার্ক পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই সেই কণিকা দ্বারা গঠিত। আর যে সমস্ত কণিকার চক্রণ ০, ১ ও ২ সেগুলো পদার্থ কণিকার অন্তর্বর্তী বল এনে দেয়। মূলত পদার্থ কণিকার সাথে বলবাহী কণিকার যে ক্রিয়াটি হয় তার অনুমান হল অর্ধচক্রণের পদার্থ কণিকাগুলোর অন্তর্বর্তী বল কিংবা পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলো বোসন গোষ্ঠীভুক্ত ০, ১ এবং ২ পূর্ণ সংখ্যার চক্রণবিষ্টি কণিকা দ্বারা বাহিত হয়। আসলে যা ঘটে তা হল ইলেক্ট্রন কিংবা কোয়ার্কের মতো কণিকা একটি বলবাহী কণিকা নিক্ষেপ করে। এই নিক্ষেপে (emission) যে প্রত্যাগতি (recoil) হয়, তার ফলে পদার্থ কণিকাটির গতিবেগের পরিবর্তন ঘটে। এসময় বলবাহী কণিকাটির সঙ্গে তখন অন্য আর একটি পদার্থ কণিকার সংঘর্ষ হয়। ফলে বলবাহী কণিকাটি বিশোষিত (absorbed) হয়। এই সংঘর্ষের ফলে দ্বিতীয় কণিকাটির গতিবেগের

www.pathagar.com

পরিবর্তন হয়। মনে হয় যেন দুটি পদার্থ কণিকার ভিতরে একটি অন্তর্বর্তী বল ছিল।

পদার্থ কণিকার এই অন্তর্বর্তী বল যোগায় ফোর্স পার্টিকেল বা বোসন গোষ্ঠীভুক্ত কণিকা। পদার্থ কণিকায় শক্তি কণিকা যেভাবে বলের সৃষ্টি করে তা বিশ্লেষণে কণিকা বিজ্ঞান এ পর্যন্ত চারটি বলের সন্ধান করেছেন। আর তা হল মহাকর্ষ বল, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল, সবল বল ও দুর্বল বল। আবার এ কথাও বলা যায় বলবাহী কণিকা চার প্রকার। ক্রিয়াশীল এই চারপ্রকার বলের কার্যকরীতা আমরা বৃহৎ বস্তু যেমন আমাদের নিকট পৃথিবী বস্তুখণ্ডসহ দূরের সূর্য, চাঁদ, অন্যান্য গ্রহসহ মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তুপিণ্ডের (দূরের নক্ষত্র গ্যালাক্সি, কৃষ্ণগহ্বর ইত্যাদি) গঠন, ভর শক্তি, ভারসাম্যের ব্যাখ্যা দিতে পারি তেমনি ক্ষুদ্র পরমাণু স্তরে বৈদ্যুতিক শক্তি, পারমাণবিক শক্তি, তেজস্ক্রিয়তার ব্যাখ্যা দিতে পারি।

এ ক্ষেত্রে মহাকর্ষীয় বলকে বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল, দুর্বল বল এবং সবল বল থেকে কিছুটা পৃথক করে দেখা হয়। কারণ এই বলের শক্তি খুবই ক্ষীণ। নিকট থেকে এ বল একেবারেই বোঝা যায় না। কেবল বৃহৎ বস্তু পৃথিবী, চাঁদ, গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে এ বলের প্রভাব বোঝা যায়। কণাবাদী বলবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে মহাকর্ষীয় বলের ক্ষেত্রে দুটি পদার্থ কণিকার অন্তর্বর্তী বল বহন করে গ্রাভিটন (Graviton) নামক দুই চক্রণ বিশিষ্ট একটি কণিকা যা পরীক্ষাগত ভাবে শনাক্ত করা একেবারেই সম্ভব নয়। অবশ্য বিজ্ঞানের কথা আলাদা। গ্রাভিটনের নিজস্ব কোনো ভর নেই। নিজস্ব ভর না থাকায় কেবল দূরপাল্লায় তা বোঝা যায়। এই কণিকাগুলো যদিও কল্পিত তবে এরা নিশ্চিত ভাবে একটা মাপনযোগ্য ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কারণ তারা যে বল প্রয়োগ করে তাতে সূর্যের মহাকর্ষ বল পৃথিবীটাকে সূর্যের চারিদিকে ঘোরায়।

মূলত কণিকা বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি মহাকর্ষ নয়। এর ভিত্তি পরমাণু বিশ্লেষণ যা পদার্থ সৃষ্টির ক্রিয়া ব্যাখ্যা করে। ফলে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের, নিউট্রন এবং প্রোটনের আবর্তনশীল ইলেক্ট্রন বিশ্লেষণে শ্রেণিভুক্ত বল হিগস-বোসন সন্ধানের ভিত্তিভূমি। এ পর্যায়ে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল এবং সকল বল বিশ্লেষণ মূলত একটি মডেল যা আমাদের হিগস-বোসন সন্ধানের দিকে টেনে নেবে।

এ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল কেন্দ্রকের সাথে আকর্ষণকারী ইলেক্ট্রনের পারস্পারিক ক্রিয়াতে প্রতিফলন ঘটে। এ ক্রিয়ায় যে চার্জ সংগঠিত হয় তা শক্তি হিসেবে কাজ করে। অবশ্য দুটি অপরা চার্জভুক্ত (Nagative) দুটি ইলেক্ট্রনের শক্তি পরস্পরকে বিকর্ষণ বলের ক্রিয়া করে। আবার পরাআধান বিশিষ্ট (Positive) কেন্দ্রকের অন্ত র্বর্তী বলও বিকর্ষণ করে। কিন্তু পরাআধান (চার্জ) বিশিষ্ট কেন্দ্রক অপরাআধান বিশিষ্ট ইলেক্ট্রনের ওপর আকর্ষণকারী বল প্রয়োগ করে। যে কারণে ইলেক্ট্রন নির্দিষ্ট কক্ষ অনুসরণ করে নিউক্লিয়াসকে আবর্তন করে। তাদের পরস্পর ক্রিয়ায় যে শক্তি

www.pathagar.com

নির্গত হয় তা মহাকর্ষীয় শক্তি থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন গুণ শক্তিশালী। বিদ্যুৎ শক্তি হিসেবে এ শক্তি আমরা পাই। কিন্তু প্রশ্ন হল কেন্দ্রকের সাথে প্রোটন ও এর জোড় নিউট্রন এবং প্রোটন গঠনে কোয়ার্ক পরস্পর ক্রিয়ার অন্তর্বর্তী বলের চার্জ কে করে? আবার সে বল বা শক্তি কী মাধ্যমে চলমান থাকে? মনে করা হয় বিদ্যুৎ চুম্বকীয় এ আকর্ষণ ফোটন নামক এক চক্রন বিশিষ্ট বহু কণিকার বিনিময়ের ফলাফল। মূলত এখানে বলবাহী কণিকা ফোট হল বোসন। ফোটন ভরমুক্ত। এ বল কীভাবে বাহিত হতে থাকে? এখানে বলবাহী কণিকা ফোটনের সঙ্গে আর একটি পদার্থ কণিকার সংঘর্ষ হয়। ফলে বলবাহী কণিকা ফোটন বিশেষিত (Charged) হয়। এর ফলে দ্বিতীয় কণিকাটির গতিবেগের পরিবর্তন হয়। এভাবে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় যে শক্তি বিকশিত হয় তা আসলে একটা ক্ষেত্র (field) অনুরূপ। কণাবাদী তত্ত্বে শূন্যস্থানে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তির অনবরত ক্ষেত্রমানে প্রবাহিত হতে থাকে। মূলত এই ক্ষেত্র শক্তির নাম নির্ধারণে রয়েছে পিটার হিগসের কিছু প্রস্তাবনা যা ক্ষীণ বল এবং সবল বল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সে বিচ্যুতিটা বুঝতে পারব।

বিদ্যুৎ ও চুম্বকীয় বলের মধ্যে প্রথমে এমন বিচ্যুতি ও বিভাজন ছিল। মনে করা হত বিদ্যুৎ ও চুম্বকীয় বল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ম্যাক্সওলের সমীকরণ ও পরীক্ষায় একশত বছরেরও কিছু বেশি সময় পূর্বে জানা গেল উভয় বল একই বলের নামান্ত র। অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও চুম্বকীয় বলের পরিবর্তে একীভূত বলের নাম হল বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল (Eloctro-magnetic force)।

তৃতীয় শ্রেণির বল ক্ষীণ বল যা বিজ্ঞানের ভাষায় উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এ বলের কার্যকারীতা বোঝাই যায়নি। এই বল তেজস্ক্রিয়তার (Radioactivity) কারণ। বিকিরণ হিসেবে এ বল কাজ করে। এই বল বিশ্ব সৃষ্টির প্রারম্ভে তারকার উপাদান গঠনে কাজ করেছিল। অর্ধেক চক্রণ বিশিষ্ট পদার্থ কণিকার (ইলেকট্রন, প্রোটন) ওপর এ বল কাজ করে কিন্তু বোসন গোষ্ঠীভুক্ত ১ চক্রণ বিশিষ্ট ফোটন এবং ২ চক্রণ বিশিষ্ট গ্রাভিটনের ওপর কাজ করে না। এ সময় (১৯৬৭ সাল) লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের অধ্যাপক আব্দুস সালাম হারভার্ডের অধ্যাপক স্টিভেন ওয়েনবাগ কয়েকটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল ফোটন ছাড়া আরো এক চক্রণ বিশিষ্ট কণাবাহী কণার অস্তিত্ব আছে। তাঁরা একত্রে এগুলোর নামকরণ করেন অধিক ভরযুক্ত 'ভেক্টর বোমনস' আর তাদের চিহ্নিত করা হলো W^+, W^- এবং Z^0 হিসেবে। এর প্রত্যেকটি ভর প্রায় ১০০ GEV (Giga electron volt)। এক গিগা ইলেক্ট্রন ভোল্ট হল সেই পরিমাণ ভর বা শক্তি যা ১৮ কেজির এক কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের একভাগ (1.8×10^{-27} kg) ভর বিশিষ্ট পদার্থের সমতুল্য। ফোটনের সাথে এর পার্থক্য হলো ফোটন ভরমুক্ত কিন্তু

www.pathagar.com

ভেক্টর বোসন ভরযুক্ত। W^+, W^-, Z^0 দুর্বল বল বহন করে। এই কণিকাগুলোর একটি বিশেষ ধর্ম আছে। তারা স্বল্প শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন মনে হলেও উচ্চ শক্তিতেই সমস্ত কণিকার আচরণ একই রকম বা সমরূপ। এ মডেলটি দুর্বল বলকে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলের সাথে একীভূত করে। কারণ ১০০ GEV এর চেয়ে অনেক বেশি উচ্চ শক্তিতে এই তিনটি কণিকা এবং ফোটন সবগুলোর আচরণ হবে একরকম। এরা এখন ভরমুক্ত। কিন্তু পার্থক্য হল স্বল্প শক্তিতে এরা ভর গ্রহণ বা ভারী হয়ে ওঠে। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বলের সাথে দুর্বল বল একীভূত হয়ে নাম হয়েছে ইলেক্ট্রো উইক ফোর্স (Elecrto weak force)। দুর্বল বল আর বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল যদি একই বলের রূপায়ণ হয় তাহলে প্রশ্ন থাকে W^+, W^- এবং Z^0 নিম্ন শক্তিতে ভর পায় কেন? অথচ ফোটন ভরমুক্তই থেকে গেল। অন্য কথায় বলা যায় এক চক্রণ বিশিষ্ট W^+, W^-, Z^0 এবং ফোটন বোসনভুক্ত হয়েও এরা ভর পেল আবার ফোটন ভর পেল না। তাহলে মডেলটির সার্থকতা কী? তাহলে কি আরো কিছু রহস্য আছে? এখানেও হিগস বোসনের সন্ধানের যৌক্তিকতা থাকে।

চতুর্থ শ্রেণির বল হল সবল বল বা সবল নিউক্লিয়ার ফল (Strong nuclear force) এই বল পরমাণুস্থ গর্ভে প্রোটন এবং নিউট্রনকে আটকে রাখে। এছাড়া এই বল প্রোটন এবং নিউট্রনের কোয়ার্কগুলোকে একত্রে ধরে রাখে যে কারণে কোয়ার্কগুলো দ্বারা প্রোটন এবং নিউট্রন গঠিত হয়। সবল বলটি সূর্যের শক্তির উৎস এবং আমাদের ব্যবহৃত পারমণবিক শক্তি। বিশ্বাস করা হয় এক চক্রণ বিশিষ্ট অন্য একটি কণিকা গ্লুয়োন (Gluon) এই বল বহন করে। এই কণিকার পারস্পারিক প্রতিক্রিয়া হয় শুধুমাত্র নিজের সঙ্গে এবং কোয়ার্কের সঙ্গে। বল হিসেবে গ্লুয়োন কোয়ার্ক এবং কোয়ার্ক প্রোটন ও নিউট্রন গঠন করে। কিন্তু বিশেষ একটি গ্লুয়োন শনাক্ত করা যায় না কারণ সবল বলের একটি অদ্ভুত ধর্ম আছে অবরোধ (Confinement)। সঙ্গত কারণেই বলা যায় সবল বলের এই অবরোধী ধর্মের কারণেও হিগস বোসনের খোঁজ।

কণাবাদী বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক মডেলসমূহ থেকে আমরা কণিকা জগতের নানা ক্রিয়ার ফলে পদার্থ গঠন তথা জগত গঠনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পেরেছি। তারপরেও আমরা শেষ দরজার অনর্গল খুলতে পারিনি। উল্লেখিত বলসমূহের আলোচনায় আমরা তা লক্ষ্য করেছি। মহাকর্ষ বলের গ্রাভিটন চিহ্নিতকরণ, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলের ফোটনের ভরমুক্ততা ও ক্ষেত্র শক্তি মডেলের অসম্পূর্ণতা, দুর্বল বলের প্রতিসাম্য ভেঙে যাওয়া এবং সবল বলে অবরোধী ধর্ম সীমিত আকারে হলেও ভিন্ন আর একটি মডেলের নির্দেশনা দেয়। বিষয়টি আরো যুক্তি মাফিক বলা যায় বলবাহী বোসনভুক্ত কণিকা 0, 1 ও 2 পূর্ণ চক্রণের সারণীতে আর পদার্থ

www.pathagar.com

কণিকা অর্ধ ½ চক্রণের সারণীতে। আমরা উল্লেখিত বলের আলোচনায় দেখেছি ১ চক্রণ বিশিষ্ট ফোটন এবং 2 চক্রণ বিশিষ্ট গ্রাভিটন W^+, W^-, Z^0 গ্লুয়োন কণিকা। কিন্তু কল্পিত '০' চক্রণ বিশিষ্ট কণিকা গেল কোথায়? তাহলে কি এই সেই হিগস-বোসন যার চক্রণ ০। অনেকে অবশ্য এ কথাই বলেছেন। যদি তাই হয়, তাহলে পদর্থ কণিকার ভরের গূঢ় রহস্যটি জানা যাবে। অবশ্য সালাম উইনবার্গের W^+, W^-, Z^0 কণিকা প্রতিসাম্য ভঙ্গ করে নিম্নগতিতে ভর পাওয়ার মডেলটি নতুন করে সাজাতে হবে।

বস্তুত বলের এরূপ শ্রেণিকরণ বা বিভিন্ন মডেল নয়। বিজ্ঞান চায় একটি মডেল তথা একটি কারণ বা একটি বলের সন্ধান যা দ্বারা সকল প্রকার বলকে সে সূত্রে বা বিধিতে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এ স্বপ্ন দেখেছিলেন। ফলে পদার্থবিজ্ঞানের ঐক্যবদ্ধতায় (Unification of physics) বিকাশ লাভ করে 'একীভূত তত্ত্ব' (Unified theory)। এ প্রচেষ্টায় ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলের একত্রিকরণের পর সালাম ও উইনবার্গ দুর্বল বলকে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলের সাথে একীভূত করে ইলেক্ট্রউইক ফোর্সে রূপদান করে। তারপরও থেকে গেল নিউক্লিয়ার ও মহাকর্ষ বল। জন্ম নিল মহান ইউনিফায়েড তত্ত্ব (Grand Unified Theory-GUT) অতিমহাকর্ষ বা সুপার গ্রাভিটি তত্ত্ব, (Super Gravity Theory), কোয়ান্টাম ফিল্ড এবং তন্তু তত্ত্ব (String Theory), কোয়ান্টাম গ্রাভিটি এবং সর্বশেষ হকিং এর এম তত্ত্ব। কিন্তু সকল তত্ত্বই কোনো না কোনো বিচ্যুতির সম্মুখীন যা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখেছি। এ পর্যায় বর্তমান বিজ্ঞানীগণ ফিরে দেখতে চান বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে পিটার হিগস ও আরো কয়েকজন বিজ্ঞানীর প্রস্তাবিত মডেলটি। তাহলে হিগস মডেলটি কী?

১৯৬৪ সালে স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পিটার হিগস বোস-আইনস্টাইনের পরিসংখ্যান তত্ত্ব বোসনের আচরণ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন। ফ্রাংকেল এ্যাংলচি, রবার্ট ব্রাউট, জেরল্ড গুরলেনিক, সি-আর হ্যাগেন, টম কিবল ছয়জন বিজ্ঞানী কণার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। পিটার হিগসের নামানুসারেই কণাটি হিগস পার্টিকেল হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছিল। তাদের প্রস্তাবনা ছিল বলবাহী বোসনভুক্ত কণিকাদের মধ্যে আরো একটি কণিকা থাকবে যা এখনো জানা হয়নি। তাদের অনুমানের ভিত্তি ছিল পূর্ণ চক্রণের কণিকা হিসেবে 0, 1 ও 2 চক্রণের কণিকার প্রস্তাবনা থাকলেও ০ চক্রণের কণিকাটি এখনো কোনো মডেলেই স্থান পায়নি। এছাড়া কণিকাটির খোঁজ করার কোনো পরীক্ষাগত ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। ধারণা করা হয়েছিল এ কণাটি ১ চক্রণ বিশিষ্ট কণিকা ফোটনের (আলোক কণিকা) মতো ভরহীন হবে না। কণাটির থাকবে ভর যা পদার্থ কণিকা

www.pathagar.com

প্রোটন, ইলেক্ট্রন, কোয়ার্কের ভরের ব্যাখ্যা দিবে। উল্লেখ্য কণায় ভর না এলে কণিকা স্থিতিশীল হতে পারে না। আর কণিকা স্থিতিশীল না হলে পরমাণু গঠন হবে না। পরমাণু গঠন না হলে পদার্থ গঠন হবে না। আসলে পরমাণুর ঘনত্বই আমাদের দৃশ্যমান পদার্থ। আর জগত বলতে যা বুঝি তা হল দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান পদার্থের (বাতাস পদার্থ কিন্তু দেখা যায় না) সমষ্টিরূপ। আর পদার্থ অর্থ ভর, ভর অর্থ শক্তি। ফলে আইনস্টাইনের ভরশক্তির সমীকরণে এ জগত যেমনি পদার্থিক তেমনি শক্তির। হিগস পার্টিকেল প্রস্তাবনার পর থেকে নানা তর্ক বিতর্ক চলতে থাকে। এর মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী লিয়ন লেভারম্যান 'দ্য গড পার্টিকেল-ইফ দ্য ইউনিভার্স ইজ দ্য আনসার হোয়াট ইজ দ্য কোশ্চেন' (The God particle- If the universe is the answer, what is the question?) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানীরা এমন একটি গড পার্টিকেলের সন্ধান একেবারেই অসম্ভব বলে মত ব্যক্ত করলেন। অনেকে একে গডড্যাম (Goddam) বলে আখ্যায়িত করেন। পিটার হিগস নাস্তিক হলেও মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে তা তিনি চাননি। এ রকম নামকরণে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। এর নামকরণ করা হল গড পার্টিকেল (God particle) যা হল 'ঈশ্বর কণা'।

এ শতাব্দীর শুরুতে বিজ্ঞানীরা ঈশ্বর কণা নিয়ে বিতর্ক শুরু করেন। এর কারণটি ছিল স্ট্যান্ডার্ড মডেলটিকে মিলানো যাচ্ছিল না। তারা হিগস প্রস্তাবিত মডেলটির সামধানে তা মেলানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা এও জানতেন হিগস পার্টিকেল খুঁজে পাওয়া অত সহজ নয়। কণিকাবিজ্ঞানের পদ্ধতি এমন যে কণিকা ভেঙেই আরো ক্ষুদ্র কণিকার (linner particle) সন্ধান পাওয়া গেছে। এমন কোনো কণিকা ভাঙলে ঈশ্বরকণা পাওয়া যাবে? কণিকা জগতে প্রোটন হল সবচেয়ে ভারী ও স্থায়ী কণা। প্রোটন ক্ষয় (Decay) এত ধীর যে তা দেখতে অপেক্ষা করতে হবে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর। শেষ পর্যন্ত ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার রিসার্স—সার্ন (CERN) বিজ্ঞান সংস্থা প্রোটন ভেঙে ঈশ্বর কণার সন্ধান করার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রোটন ভাঙা যেমন সহজ কাজ নয় তেমনি ভাঙনের কৌশলগত দিক থেকে তা ডেকে আনতে পারে মহাবিপর্যয়। কারণ প্রোটনের সাথে প্রোটনের ঘর্ষণেই কেবল প্রোটন ভাঙা যাবে। কিন্তু ঐ ঘর্ষণের গতিবেগ থাকতে হবে আলোর গতির সামান্য নিম্নে (আলোর গতির ৯০% থেকে ৯৮% এর মধ্যে)। ফলে যে তাপমাত্রার সৃষ্টি হবে তা হবে বিগ-ব্যাং সূচন তাপমাত্রার সামান্য নিচে। বিগ-ব্যাং সূচন তাপমাত্রায় কোনো পদার্থ কণিকা থাকার সুযোগ নেই। থাকবে ফোটনের মতো ভরহীন কণা আর প্রতিকণা। ভরযুক্ত হিগস পার্টিকেল থাকলেও তার গঠন হবে বিগ-ব্যাং সূচন

www.pathagar.com

মাত্রার অনেক নিচে যখন বিশ্ব সম্প্রসারণে শীতল হয়ে আসছিল। তারপরেও প্রোটন ভাঙার তাপমাত্রার সৃষ্টি হতে পারে মিনি বিগ-ব্যাং যা পৃথিবীর বুকে সৃষ্ট হতে পারে মহাধ্বংসযজ্ঞ। আর একটি সম্ভাবনা এখন প্রোটন ধ্বংসের পর মুহূর্তে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ায় পুনরায় প্রোটন গঠন শুরু হবে আর প্রোটন গঠনের ক্রিয়ার মধ্যে শনাক্ত হবে হিগস পার্টিকেল। কিন্তু তাৎক্ষণিক ক্রিয়াটি হতে পারে ব্ল্যাকহোল গঠনের মতো। অতিভরের তারকা যখন জ্বালানি শেষ করে মহাকর্ষ টানে অন্তঃগভীরে অসীম ভরের অনন্যতা সৃষ্টি করে তেমনি পরীক্ষাগারের তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাসে গঠিত প্রোটন সমষ্টি মহাকর্ষ টানের অতিঘনত্বরূপ এককত্ব থেকে মিনি অনন্যতা সৃষ্টি করতে পারে। যা হবে একটি মিনি কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল। এই মিনি কৃষ্ণগহ্বরও মিনি পৃথিবীটাকে গ্রাস করতে পারে। অবশ্য বিজ্ঞানীরা এ সকল সম্ভাবনা নাকচ করে ২০০৮ সালে হিগস পার্টিকেল খোঁজে পরীক্ষার উদ্যোগ নেন। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষা কখনো কখনো এমন গবেষণাগারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে তার আকার হতে পারে প্রশান্ত মহাসাগরের বা সৌরজগতের মতো বিস্তৃত। তত্ত্বে থাকলেও এরকম পরীক্ষাগার নির্মাণ করা অসম্ভব। সে তুলনায় হিগস পার্টিকেলস পরীক্ষা সামান্য হলেও তা নির্মাণ করা হল ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডের সীমান্তে। ২৭ কিলোমিটার ব্যাসের ডিম্বাকার এবং তিন কিলোমিটার গভীর এক টানেল প্রস্তুত করা হল। এটি বিজ্ঞান জগতে সবচেয়ে বৃহৎ ও ব্যয়বহুল পরীক্ষা। বাজেট ধরা হল এক হাজার কোটি ডলার। বলা যায় অবস্থা ভেদে পদ্মার ওপর ৫টি ব্রীজ নির্মাণের খরচ। বিশ্বের সেরা এক হাজার বিজ্ঞানী কাজ করবেন। প্রোটন ভাঙার এ কাজটি যে যন্ত্রে করা হবে তার নাম লার্জ হ্যাড্রন কোলইডার সংক্ষেপে এলইসি। প্রোটনের কোটি ভগ্নাংশ থেকে হিগস পার্টিকেল সনাক্ত করা হবে দুটি ডিটেক্টর যন্ত্রে, নাম এটলাস ও সিএমএম। ২০০৮ সালের ১০ ডিসেম্বর প্রথম এ পরীক্ষাটির উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ পরীক্ষার ফলাফলে মিনি মহাবিস্ফোরণ এবং মিনি ব্ল্যাকহোল সৃষ্টির আতঙ্ক বিশ্বে ভীতির সঞ্চার করে। ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে আলজাজিরাসহ প্রিন্ট মিডিয়ায় সংবাদটি ছড়িয়ে পড়লে অনেকেই হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। ২০০৮ সালে পরীক্ষাটা চালানোর চেষ্টা হলেও যান্ত্রিক গোলোযোগে তা আপাতত স্থগিত রাখা হয়। এরপর ২০১০ সালে পর পর দুটি পরীক্ষা চালান হয়। কিন্তু সফলতা পাওয়া যায় না। এরপর ১৩ ডিসেম্বর ২০১১ সার্নের বিজ্ঞানীরা আবার পরীক্ষা চালান। তারা আশার কথা শুনিয়েছিলেন, ঈশ্বর কণা সন্ধানের কাজ অব্যাহত আছে।

অবশ্য গোড়ার দিকে সার্নের এক গবেষক একটি ব্লগে এমন খবর ছড়িয়ে দেন যে তারা ঈশ্বর কণা সনাক্ত করেছেন। এতে বিশ্বে আবার হৈ চৈ পড়ে যায়। তবে বিষয়টি ছিল অনুমাননির্ভর। বিয়টি সার্ন কর্তৃপক্ষের নজরে এলে তারা এই বলে

www.pathagar.com

নির্দেশ জারী করেন যে অনুমাননির্ভর কোনো কিছু বলা যায় না। চাই সুনির্দিষ্ট পরীক্ষানির্ভর ফলাফল।

প্রোটন চূর্ণ করার মূল সূত্রটি আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত $E = Mc^2$। কিন্তু পূর্ণ সূত্রটি ব্যবহার করা যাবে না। এর পূর্ণ ব্যবহার হলে তা হবে কেবলি শক্তি। আর পরীক্ষাটা হবে শক্তি কীভাবে উৎপন্ন হয়। ফলে সূত্রের মাত্রাগত অবস্থান নির্ণয়ে রয়েছে জটিলতা। এছাড়া প্রোটন চূর্ণ হওয়ার সেকেন্ডের মিলিয়ন ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে বিচূর্ণীত কণা মিলিয়ে যাবে। তা থেকে জন্ম নেবে মিলিয়ন মিলিয়ন কণিকা এবং প্রতি কণিকার জোড়া। এ কাজটি যে কত কঠিন তা জানা যায় সার্নের ডিরেক্টর রুলফ হাওয়ারের বক্তব্যে ২০১১ সালে তিনি মুম্বাই আসেন গবেষকদের এক সম্মেলনে। এখানে তিনি বলেন ঈশ্বর কণা খোজার কাজটি হল হাজারটা খড়ের গাদা থেকে একটা সুচ খুঁজে বের করা অথবা তুষারে আবৃত পর্বতের ওপর থেকে তুষারের ছবি তোলার মতো।

শেষ পর্যন্ত ৪ জুলাই ২০১২ রয়টার্স, বিবিসি, আলজাজিরা, উইকিপিডিয়ার খবরে প্রকাশ পায় "ঈশ্বর কণা" সদৃশ্য একটি কণার সন্ধান সার্ন কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করেছেন। ৪ জুলাই ২০১২ লন্ডনে সার্নের জমজমাট এক সংবাদ সম্মেলনে ব্রিটেন সায়েন্স এন্ড টেকনলজির ফ্যাসিলিটিজের কাউন্সিলর প্রধান নির্বাহী জন বলেন 'একটি নতুন কণা আবিষ্কারের বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যা হিগস পার্টিকেল তত্ত্বে উল্লেখিত কণাটির সাথে যথেষ্ট মিল আছে।' সার্নে গবেষণা ফলের মুখপাত্র জো ইনকেনডেলা জেনেভায় নতুন কণিকা আবিষ্কারের ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'এটি প্রাথমিক ফলাফল তবে আমরা মনে করি এ ফল যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য।'

উল্লেখ্য ২৭ কিলোমিটার ব্যাসের তিন কিলোমিটার সুড়ঙ্গ পথে ভূগর্ভে হার্জ হ্যাড্রন কোলাইজার কণিকা ত্বরণ যন্ত্রে আলোর গতির কাছাকাছি এক ন্যানো সেকেন্ড রেকর্ড সাত বিলিয়ন বিলিয়ন ইলেক্ট্রন ভোল্ট ক্ষমতায় পরীক্ষা চালানো হয়। তবে কী বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত করে বলেননি এটি হিগস পার্টিকেল নাকি নতুন কোনো কণিকা। কণিটা যদি হিগস পার্টিকেল তাহলে এর ভর হবে ১১৪ থেকে ১৮৫ গিগা ভোল্টের মধ্যে। অর্থাৎ ১৮ কেজির কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ। আর প্রোটন থেকে তার ভর হবে ১২৫ গুণ বেশি। আপাতত বিজ্ঞানীরা বোসন গোষ্ঠীভুক্ত পূর্ণচক্রণের কণিকা হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে হিগস-বোসন (Higgs-Boson)। এই কণাটির চক্রণ হবে ০। উল্লেখ্য কণিকার চক্রণ যদি ০ হয় তাহলে সেটা হবে বিন্দুর মতো এবং থাকবে দর্পণ প্রতিবিম্ব (Mirror image)। অর্থাৎ সেটা যে কোনোদিন থেকেই একই রকম দেখাবে। বলা সঙ্গত যে ১ চক্রণ বিশিষ্ট কণিকা দেখতে একমুখী তীরের মতো আর ২ চক্রণের কণিকা দ্বিমুখী তীরের মতো। চক্রণ 0, 1 ও 2 বিশিষ্ট কণাগুলো দ্বারা সৃষ্ট বলের

www.pathagar.com

প্রভাবে বিশ্ব চুপসে কেন অত্যন্ত ঘন তরল অবস্থায় পৌঁছায় না তা পাউলি প্রস্তাবিত অপবর্জন নীতি (Exclusive Principle) ব্যাখ্যা করে। পদার্থ কণিকাগুলো অত্যন্ত সন্নিকট হলে তাদের গতিবেগের পার্থক্য থাকবেই। এর অর্থ হবে কণাগুলো একটা অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকবে না। পৃথিবীটা যদি অপবর্জন নীতি ছাড়া সৃষ্টি হত তাহলে কোয়ার্কগুলো সুসংগঠিত পরমাণু গঠন করতে পারত না। তারা সবাই চুপসে এক রকম ঘন তরল বা তরকারী সুরুয়ার মতো হয়ে যেত।

হিগস পার্টিকেল, গড পার্টিকেল বা ঈশ্বর কণা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সত্যিই নিহিত আছে হিগস পার্টিকেলের আসল পরিচয় ও কাজে। তবে এর উত্তর পেতে হলে আমাদের কণিকা সৃষ্টির মূলের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে, সে সাথে কণিকার গতিবিধি এবং সৃষ্টিক্রিয়া। অবশ্য এ অর্থেই লেভারম্যান একে গড পার্টিকেল বলতে চেয়েছেন। বিষয়টিকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবা যায়। প্রথমত গড অর্থাৎ ঈশ্বরই এ কণাটি সৃষ্টি করে বিধি মোতাবেক তার কার্যকরীতা দান করেছেন। তাহলে সহজ অর্থেই তা স্রষ্টার সৃষ্টি পার্টিকেল। স্রষ্টা তার সৃষ্টির কৌশলে প্রথম উপাদান হিসেবে এ পার্টিকেলটিই সৃষ্টি করলেন যা জগত বিকাশের একটি সূত্রের দান। এ ক্ষেত্রে কণাটির নাম God particle না হয়ে, হতে হবে God's particle বা ঈশ্বরের কণা। কিন্তু ঈশ্বর অসীম (Infinite)। বিজ্ঞান সব সময়ই অসীমতা পরিহার করে। বিজ্ঞানের পদ্ধতি আরোহী (Inductive) অবরোহী (Deductive) নয়। বিজ্ঞানের পদ্ধতি পরীক্ষণ, নীরিক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে মিলে যাওয়ার বিষয়। ফলে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ অতীত ঈশ্বর-ঈশ্বর কণার আলোচিত বিষয় নয়।

লিয়ন লেভারম্যান পার্টিকেল বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হল সে কণাটির সন্ধান যা সর্বপরি (above all) কণিকা বিজ্ঞানের মডেলগুলির বিচ্যুতি দূরীভূত করবে। অসম্পূর্ণতাকে পূরণ করবে। আর তা যদি হয় সকল বলের উৎসমূল, তাহলে হবে পার্টিকেল জগতের গড পার্টিকেল। হিগস পার্টিকেল ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনস্তিত্বের বিষয়ক কোনো মডেল নয়। বিষয়টি ডাল্টন, ওরেস্টেড, বোহর, ওপেন হেইমার, ম্যাক্সওয়েল, ম্যাক্সপ্লাঙ্ক, থমসন, ডিরাক, রাদারফোর্ড, স্যাডউইক, আইনস্টাইন, ওয়েনবার্গ, সালাম, হকিং প্রস্তাবিত মডেল ও অনুসন্ধান কাজ।

হিগস প্রস্তাবিত পার্টিকেলটি বিশ্ব সৃষ্টির তাত্ত্বিক মডেল আরোপিত করলে বিষয়টির সম্যক জ্ঞান জন্মিবে। এ বিশ্ব পদার্থিক, পদার্থহীন নয়। বিশ্ব পদার্থহীন হলে আমরা থাকতাম না। ফলে হিগস-বোসন নিয়ে কেউ প্রশ্নও করত না। পদার্থ কীভাবে সৃষ্টি হল? এ প্রশ্নটাই বিজ্ঞানীদের তাড়িত করেছে বিশ্ব সৃষ্টির মডেল প্রস্তুতে। এক্ষেত্রে হট বিগ-ব্যাং (Hot Big-Bang) মডেল; সীমানাহীনতার মডেল (No-Boundary), অতিস্ফীত মডেল, অতিনির্ভর বিষয়। বিশ্ব একক অনন্যতা থেকেই হোক বা শূন্যস্থানের কোয়ান্টাম অস্থিরতাতেই হোক, বিশ্ব যে তার বিবর্তনকাল পেরিয়ে

www.pathagar.com

বর্তমানে পৌঁছেছে তা সহজ জ্ঞানেই বোঝা যায়। গ্যালাক্সির গঠন, তারকার জন্ম ও মৃত্যু, কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি, কৃষ্ণবস্তুর (Dark Matter) উপস্থিতির ভালো উদাহরণ। বিশ্ব বিকিরণ প্রধান যুগ (Radiation Dominated Erra) থেকে বস্তু প্রধান যুগে (Matter Dominated Erra) প্রবেশ করে। এই বস্তু প্রধান যুগ থেকে সৃষ্ট হতে থাকে নীহারিকা, তারকা, আমাদের সৌরমণ্ডল। মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড যা রেডিয়েশন বা বিকিরণ হিসেবে আদিম বিশ্বের নিদর্শন আবিষ্কার বর্তমান বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত বিষয়।

বিশ্বের বিবর্তন ইতিহাসে সূচনালগ্নে তাপমাত্রা ছিল উত্তপ্ত যা হট বিগ-ব্যাং মডেলের ভাষ্য। বিশ্বের এই সূচনা তাপমাত্রায় ভরবাহী কোনো কণিকার অস্তিত্ব থাকা একেবারেই সম্ভব নয়। এ সূচনা তাপমাত্রায় থাকবে ফোটন, নিউট্রন বা ইলেক্ট্রনের মতো হালকা কণিকা। বিশ্বের সম্প্রসারণের সাথে তার তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ায় দ্বিতীয় ধাপে সৃষ্টি হবে লেপটন হ্যড্রন, মেসন কোয়ার্ক এবং পরবর্তী ধাপে ভারি কণিকা, নিউট্রন ও প্রোটন। এ অবস্থায় হিগস প্রস্তাবিত পার্টিকেলের জন্ম কোনো ফেজ (phase) বা দশায়। বলা যায় ঈশ্বর-কণা বিতর্ক এখান থেকেই ভালো জমে উঠবে। হিগস পার্টিকেল বা ঈশ্বর কণা যাই বলা হোক বিশ্ব সৃষ্টির সূচন তাপমাত্রায় তার জন্ম হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয় কারণ এর রয়েছে ভর। কেবল ভরমুক্ত কণিকাই সে তাপমাত্রায় বিরাজ করতে পারে।

মনে করে হয় বিগ-ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের সময় মহাবিশ্বের আয়তন ছিল শূন্য কিন্তু উত্তাপ ছিল অসীম। এ সময় মহাবিশ্ব কেবল বিকিরণ হিসেবে বিরাজ করছিল। বিস্ফোরণের এক সেকেন্ড পর তাপমাত্রা নেমে এসেছিল প্রায় এক হাজার কোটি ডিগ্রিতে। এই তাপ সূর্যের কেন্দ্রের চেয়ে এক হাজার গুণ বেশি। এই অবস্থায় মহাবিশ্বের ভেতরে প্রায় সবটাই থাকত প্রোটন, ইলেক্ট্রন এবং নিউট্রিনো। এই নিউট্রিনো অত্যন্ত হালকা কণিকা। এগুলোকে প্রভাবিত করতে পারে দুর্বল বল এবং মহাকর্ষ। এ অবস্থাতে পরমাণু গঠনের সুযোগ ছিল না। ধারণা করা হয় তাপমাত্রা আরো হ্রাসে হিগস কণার সৃষ্টি যা ক্ষেত্র (Field) হিসেবে পরমাণু গঠনে ভূমিকা রেখেছে।

মূলত হিগস কণাকে কণা না বলে কণাজাল (Network of particles) বলা উত্তম কারণ হিগস তত্ত্ব কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি অনুসৃত। আইনস্টাইনের পূর্বে এরকম একটি ইথার প্রকল্প ছিল যা নানা পরীক্ষায় বাতিল হয়ে যায়। তন্তুতত্ত্ব (String theory) ফিল্ড থিওরিভুক্ত যা অপ্রমাণিত। সুপার গ্রাভিটি তত্ত্বেও এমন সুপার পার্টিকেলের প্রস্তাবনা করা হয় তাও অপ্রমাণিত রয়ে গেছে। অবশেষে এই হিগস ফিল্ডের অবতারণা।

www.pathagar.com

যে কণিকা দিয়ে বিশ্ব সৃষ্টি সে কণিকা জগত অতিরহস্যে ঘেরা। হেইসেনবার্গের অনিশ্চয়তার বিধি (Principal of uncertainty) কণিকা জগতের অস্থিরতা এক অলঙ্ঘনও সত্য হিসেবে বিবেচিত। এদিকে ফাইনম্যানের টু স্লিট এক্সপেরিমেন্ট (Two sleet experiment) এ কণিকা নির্দিষ্ট কোনো পথে চলে না বরং কণিকার রয়েছে নানা সম্ভাব্য পথ। অনিশ্চয়তার বিধি অনুযায়ী ক্ষেত্রমান (শক্তি ক্ষেত্র মানে প্রবাহিত) এবং বিনিময় হার শূন্য নয়। ফলে স্থানও শূন্য নয়। শূন্যস্থান বলে আমরা যা ভাবি তা বায়ু ও বায়ুশূন্য স্থান বিশেষ। তবে তার সামান্য আয়তনের মধ্যেও রয়েছে সামান্যতম শক্তি (energy)। একে বলা হয় কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম (Quantum vacuum) আর স্টিফেন হকিং এর ভাষায় কোয়ান্টাম জিটারস (Quantum jitters)। কোয়ান্টাম জিটারস আসলে শূন্যস্থান পরিবর্তনের অস্থিরতা (quantum fluctuation)। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে কণা এবং ক্ষেত্র ভিতরে ও বাইরে সর্বদাই অস্তিত্বে কম্পমান (Particle and fields quivering in and out of existence-Hawking- Gramd Design)।

হিগস প্রস্তাবিত কণাটির চক্রণ ০। চক্রণ শূন্য অর্থ ঈশ্বর কণাকে নিজ অক্ষের ওপর ঘুরতে দিলে কখনই আগের অবস্থায় ফিরে আসে না। কিন্তু 1, 2 এর চক্রণ কণিকার ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন নয়। আসলে ঈশ্বর কণার চক্রণ শূন্য মানে এর চার্জও শূন্য। আবার বৈদ্যুতিক চার্জ যেমন শূন্য কালার চার্জও শূন্য। কালার চার্জ হলো মৌলিক কণাগুলোর একটি বিশেষ ধর্ম, যার সাথে বাস্তব কণার বা রঙের কোনো মিল নেই। বরং এটি ঐ কণাগুলোর নিজেদের মধ্যে ক্রিয়াশীল সবল বলের (Strong interaction) গতি প্রকৃতি নির্দেশ করে। এ সবল বলের জন্যই বিভিন্ন কণা পরস্পর আঠার মতো লেগে থাকতে পারে। যেমন নিউক্লিয়াসে প্রোটন এবং নিউট্রন। মনে করে হয় গ্লুয়োন নামক কণা এ কাজ করে থাকে।

ঈশ্বর-কণার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তা খুবই ক্ষণস্থায়ী। তৈরি হওয়ার পর এর অর্ধায়ু বড়জোর সেকেন্ডের দশ হাজার কোটি কোটি কোটি ভাগের (In the order of 10^{-25} seconds) মতো। অর্থাৎ যতগুলো ঈশ্বর কণা এক সঙ্গে তৈরি হয় ওই সময় পেরোলে তার অর্ধেকই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাকি অর্ধেক নিশ্চিহ্ন হতে আরো কিছু সময় লাগে। বিষয়টি অঙ্ক কষে বের করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো ইলেক্ট্রন প্রোটনের কাজ আমরা জানি কিন্তু ঈশ্বর কণা কী কাজ করে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা ঈশ্বর কণার সন্ধানের গুরুত্ব জানতে পারব। সে সাথে বিজ্ঞানের কণিকা তত্ত্বের নানা অমিলের বিষয়টিও বুঝতে পারব। আসলে ঈশ্বর-কণাকে কণা হিসেবে না ভেবে ক্ষেত্র হিসেবে ভাবলে এর উত্তরটি সহজে বোঝা যাবে। তন্ত্র তত্ত্বের প্রস্তাবনা যখন করা হয় তখনো এরকমটি ভাবা হয়েছিল। কিন্তু তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি অনেকটা ইথার প্রকল্পের মতো যা বিশ্ব

www.pathagar.com

শতাব্দীর গোড়াতেই বর্জন করা হয়েছে। আমরা এখনো অনেকে ইথারকেই বিশ্বাস করি। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এবং লেখকের লেখাতেও ইথার অর্থপূর্ণ শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেন। এটি আমাদের জ্ঞানের দৈন্যতা। থাক সে কথা। আসলে পদার্থিক জগতকে (গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা, গ্যালাক্সি ইত্যাদি নিয়ে যে জগৎ) বাদ দিলে থাকে শূন্যতা (empty space)। এই শূন্যতা শূন্য নয়। এই শূন্যতা কণিকার রাজ্য। বলা হচ্ছে ঈশ্বর কণা শূন্যতার মধ্যে সর্বত্র বিরাজমান হয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে আছে। এ যেন এক বালুকাবেলা যার প্রতিটি বালুকণা এক একটি ঈশ্বর কণা। বালুকাবেলার মতোই ঈশ্বর কণা অস্তিত্ব ধারণ করে আছে মহাবিশ্বব্যাপী যা ঈশ্বর কণার ক্ষেত্র বা হিগস ফিল্ড। এখন হিগস ফিল্ডের মধ্য দিয়ে চলার সময় যে কণা যত বেশি বাধা পায় সেটা তত ধীরে চলে। কণাটির ধীর গতি আর একটি কণার সাথে মিলিত করবে। ফলে কণাটি আরো ভারী হবে। কণাটির বাধা পাওয়ার কারণ তার সামান্য ভর থাকতে হচ্ছে। কয়টি বাধা পেয়ে কোয়ার্ক টপ কোয়ার্ক সংযুক্ত হতে থাকে। ফলে সমষ্টিগত কণিকার ভর যুক্ত হয়ে প্রোটন গঠন করবে। নিউক্লিয়াস ধরে রাখবে প্রোটন আর নিউট্রনকে। তাতে যে ভর বা শক্তি সৃষ্টি হবে তা হালকা কণিকা ইলেক্ট্রনকে আবর্তনের জালে আটকে দেবে। সৃষ্টি হবে পরমাণু। এই পরমাণুর গাঁথুনিতেই পদার্থের ঠিকানা।

হিগস ফিল্ড, কণিকাকে ভারী করে তোলে যার ফলাফলে পরমাণু এবং পরমাণু গঠিত পদার্থের গতি ধীর হয়ে যায়। কিন্তু ফোটনের মতো কণিকা আলোর বেগে ছুটছে কেন? আসলে হিগস ফিল্ডে ফোটন বাধা পায় না। তাই ছোটে আলোর বেগে। ফোটন আগেও ভরহীন ছিল এখনো ভরহীন আছে। ইলেক্ট্রন যদিও খুব হালকা তবুও একেবারে ভরহীন নয়। হিগস ফিল্ড তাকে কিছুটা বাধা দেয়। এ জন্য ইলেক্ট্রন আলোর বেগের চেয়ে একটু ধীর বেগে চলে। প্রোটন বেশি ভারী হওয়ায় হিগস ফিল্ডে বাধা পেয়ে আরো বেশি ভারী হয়ে ওঠে পরমাণু গঠন করে। অবশ্য মহাবিশ্বের শুরুতে অতিউত্তপ্ত অবস্থা থাকায় হিগস ফিল্ডের গড় মান ছিল শূন্য। ফলে কোনো মৌলিক কণারই ভর ছিল না। সব কণিকাই ফোটনের মতো আলোর বেগে ছুটতে পারত। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণে তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকলে সাম্য অবস্থা ভেঙে পড়ায় গড় মান শূন্য থাকে না। এ সময় মহাবিশ্বের নতুন গুণের সৃষ্টি হয় আর তা হল ভর। হিগস ফিল্ডে অনেক কণাই ভর ক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হলেও ফোটন ভরহীন রয়ে গেছে। এটি ব্যতিক্রম কিনা? আসলে হিগস ফিল্ডে মৌলিক কণিকাগুলো কীভাবে কাজ করে তাই হিগস মডেলের আসল পরিচয়।

হিগস বোসনের ব্যপক পরিচিতিতে এ প্রবন্ধ এখানেই শেষ করা যেত কিন্তু আরো কিছু প্রশ্নে হিগস-বোসন তথা ঈশ্বর কণা বিতর্ক আরো জোড়ালো করা যাবে। প্রথম প্রশ্ন আলোচিত কণাটি হিগস প্রস্তাবিত কণা হিগস-বোসন কিনা? দ্বিতীয় প্রশ্ন ঈশ্বর

www.pathagar.com

কণা বলতে সাধারণ্যে যা বলা হচ্ছে সে অর্থে সত্য কি না বা ধর্ম চেতানায় শেষ আঘাত করছে কি না? তৃতীয় প্রশ্ন এটি আইনস্টাইনের স্বপ্ন পূরণের ঐক্যবদ্ধ একক তত্ত্ব (Single theory) বা সবকিছুর তত্ত্ব (Theory of everything) কিনা? চতুর্থ প্রশ্ন হিগস-বোসনের সন্ধানেই কি পদার্থবিজ্ঞানের মরণ? সর্বশেষ প্রশ্ন এটাই কি বিশ্ব গঠনের শেষ উত্তর?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় সার্ন কর্তৃপক্ষ যে কণাটি আবিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছেন তা নিশ্চিত করে বলা হয়নি সেটা হিগস প্রস্তাবিত কণা কিনা? তারা বলেছেন কণাটি হিগস প্রস্তাবিত কণা সদৃশ্য। কণাটি হিগস প্রস্তাবিত কণা কি না তার জন্য আরো পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। এখন পর্যন্ত এ সংবাদই আমাদের নিকটে আছে। কণাটি যদি হিগস প্রস্তাবিত কণাটির সাথে শতভাগ মিল থাকে তাহলে আলোচনা সঠিক গুরুত্ব পাবে। আর যদি তা না হয় তাহলে আবিষ্কৃত কণাটির আচরণের ওপর নির্ভর করবে কণিকা তত্ত্বকে সাজানোর ব্যবস্থা। সে ক্ষেত্রে উইনবার্গ, আব্দুস সালাম, গ্লাশোর দুর্বল বলের মডেলটি পরিবর্তন হতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উপস্থাপনের কারণ হিগস-বোসনকে যেভাবে লেখালেখি, প্রচার প্ররোচনায় উত্থাপন করা হচ্ছে তা অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর। অনেক সাধারণ শ্রোতা, পাঠক ভাবছেন তাহলে কি এই কণাটিই জগৎ সৃষ্টির মুখ্য ভূমিকা পালন করে? অথবা এই ঈশ্বর কণাই কি ঈশ্বর? পিটার হিগস কখনো একে ঈশ্বর কণা বলেননি। পদার্থ সৃষ্টির মৌল কণিকা হিসেবে কণিকা বিজ্ঞানের নানা অসামঞ্জস্যতায় ১৯৬৪ সালে এমন একটি কণিকার অস্তিত্বের প্রস্তাবনা রাখেন। লিয়ন লেডারম্যান যে অর্থে একে গড পার্টিকেল বলেছেন তা অসামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী কণিকা হিসেবে। অথচ বিভিন্ন মিডিয়া, লেখক, বিজ্ঞানী সহজ বাংলা ভাষায় বলে দিলেন 'ঈশ্বর-কণা'। ঈশ্বর কণা নামের পিছনে মতলব থাকতে পারে। কারণ কণিকাটির নাম তারা 'ব্রহ্মকণা' বা 'স্রষ্টাকণা' বলেননি। হয়ত তাতে বিপত্তি বাড়ত। কণাটি আসলে হিগস কণা, আবিষ্কৃত হওয়ার পর 'হিগস-বোসন'। এটি ফারমিয়ন গ্রুপের ইলেক্ট্রন প্রোটন নিউট্রনের মতো বোসন গ্রুপের একটি কণা মাত্র। কেউ যদি একে স্রষ্টা কণা বা ঈশ্বর কণা বলে বিভ্রান্ত ছড়াতে চান তাহলে বলা যাবে তাদের কথায় চালাকি আছে। পরের প্রশ্নগুলোর উত্তরে ধর্মানুরাগী মানুষ আরো বেশি আশ্বস্ত হবেন।

হিগস-বোসন আইনস্টাইনের স্বপ্ন পূরণের তত্ত্ব কিনা। লাপ্লাস প্রথম মত প্রকাশ করেন এ বিশ্ব বিধিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সকল বিধির ভিড়ে যদি অন্যতম বিধির সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে বিশ্ব সৃষ্টির সকল রহস্য জানা যাবে। প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের ক্ষেত্রে আইনস্টাইন স্মরণকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। পদার্থ গঠনের মূলে যেমন কণিকা তত্ত্ব তেমনি কণিকা দ্বারা গঠিত অতিবৃহৎ বস্তু গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকার

www.pathagar.com

গঠন, ভারসাম্য, ভরশক্তি স্থান ও কালের ব্যাখ্যায় আইনস্টাইনের আপেক্ষিক ও মহাকর্ষ তত্ত্ব। দুটি তত্ত্বই বিশ্বের গঠন ও বিকাশে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। আইনস্টাইনের স্বপ্ন ছিল এ দুটি অসম্পূর্ণ বা আংশিক তত্ত্বের মিলনে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের সন্ধান করা যা এক তত্ত্ব (Single theory) হিসেবে সব কিছুর তত্ত্ব (Theory of everything) হবে। হিগস-বোসন কী এমন একটি একক তত্ত্ব এনে দিল? নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় তা নয়। কারণ যে মহাকর্ষ বলের কারণে কণিকা সমষ্টিগত ভাবে বৃহৎ বস্তু গঠন করে এবং বৃহৎ বস্তু যেমন নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহসহ গ্যালাক্সিসমূহের ভারসাম্য রক্ষা করে সেই মহাকর্ষ বলকে কীভাবে হিগস বোসনে সম্পৃক্ত করা যাবে? কারণ অন্যান্য বল ক্রিয়া করে বিক্রিয়ার মাধ্যমে আর মহাকর্ষ বলের ক্রিয়া বিক্রিয়াহীন। এ বল সরাসরি এবং তাৎক্ষণিক ক্রিয়া করে। কাজেই হিগস কণা কোনো ঈশ্বর কণা নয়। একে হিগস ফিল্ড বলাই সঙ্গত। বলা যায় তন্তু তত্ত্বের (String theory) সংস্করণে 'হিগস ফিল্ড থিওরি'। কণিকা জগতের বিক্রিয়া সম্বন্ধে জানা কিছু অসম্পূর্ণতা 'হিগস ফিল্ড তত্ত্ব' সম্পূর্ণ করবে।

হিগস-বোসন আবিষ্কারে কি পদার্থবিজ্ঞানের মৃত্যু ঘটবে? এমন উদ্ভট প্রশ্ন করার কারণ আছে। শতাব্দীর প্রথমে মনে হয়েছিল অবিচ্ছিন্ন পদার্থের হ্রাস বৃদ্ধি এবং তাপ পরিবহনের মতো বিধিতেই সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে। কিন্তু পারমাণবিক গঠন এবং অনিশ্চয়তা বিধি (principle of uncertainty) আবিষ্কারের পর সে আশা ভেঙে যায়। এর পর ১৯২৮ সালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ম্যাক্সবর্ন (Max Born) গোয়েটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল সাক্ষাৎকারীকে বলেছিলেন "আমরা যাকে পদার্থ বিদ্যা বলি ছ'মাসেই তার সমাপ্তি ঘটবে।" তার বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল অনতিকাল পূর্বে পল ডিরাকের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রনের আচরণ নিয়ন্ত্রকারী সমীকরণ। প্রোটনের ক্ষেত্রে তখন মনে হয়েছিল এরকম আর একটি সমীকরণ প্রোটনের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবে। তখন পর্যন্ত প্রোটনই ছিল অন্য আর একটা জানা কণা। অতএব এ সমীকরণ জানা গেলেই পদার্থবিজ্ঞান শেষ হবে। কিন্তু এরপর নিউট্রন ও কেন্দ্রকীয় বল আবিষ্কার সে আশায় আঘাত হানে। পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ করে বিগত শতকের ষাটের দশকের শুরুতে কণিকার ভর, আচরণ, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিয়ে আরো গভীর গবেষণা শুরু হয়। গড়ে ওঠে নানা মডেল। তাদের মধ্যে উইনবার্গ, আব্দুস সালাম, পিটার হিগস, স্টিফেন হকিং, পেনরোজ ইয়াংসহ অনেকের নাম উল্লেখ করা যায়। তাদের মধ্যে হকিং এক কিংবদন্তি নাম। কৃষ্ণগহ্বর আবিষ্কার এবং কৃষ্ণগহ্বরে বিকিরণ কণিকা বিজ্ঞানকে উচ্চতর স্থান দান করেন। তন্তু তত্ত্ব নিয়ে অনেক কাজ করলেও তিনি এখন এম তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনি কণাবাদী তত্ত্বকে মহাকর্ষী তত্ত্বের (Quantum

www.pathagar.com

gravity theory) প্রবক্তা। এ তত্ত্ব কণাবাদী বিজ্ঞানকে আপেক্ষিক তত্ত্বের সম্মিলনে বিশ্বের শুরু আছে কি নেই সে বিষয়ের খোঁজ হয়ত মিলবে। কাজেই হিগস-বোসন পদার্থবিজ্ঞানের শেষ একথা বলার কোনো যুক্তি নেই। এছাড়া আরো একটি বিষয়ের কারণ পদার্থবিজ্ঞানকে আরো বহুদূর অগ্রগামী হতে হবে। বিষয়টি হল অনিশ্চয়তার নীতি (principle of uncertainty)।

কণিকা বিজ্ঞান বিকাশের কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞান অনিশ্চয়তার নীতিকে অতিক্রম করতে পারেনি। অনিশ্চয়তার নীতির বিষয়টি হল যে কোনো কণিকার স্থিতি ও গতি একই সাথে নির্ণয় করা যায় না। কণিকার সঠিক স্থিতি ও গতি নির্ণয়ে অন্তত একগুচ্ছ বা কোয়ান্টাম আলোকপাত ঘটাতে হবে। কারণ আলোক কণা একক ভাবে ব্যবহারে কণিকা সনাক্ত করা যায় না। কিন্তু আলোক কোয়ান্টাম শক্তি কণিকাটিকে অস্থিতিশীল করে তোলে। ফলে এর গতি যত নিখুঁত ভাবে পরিমাপ করতে হয় স্থিতি তত ভুল হয়। আবার স্থিতি যত নিখুঁত ভাবে মাপা হয় গতির তাপমাত্রা তত ভুল হয়। কণিকার সঠিক গতি ও স্থিতির অপরিমেয়তার কারণে কণিকা বিজ্ঞান তত্ত্বটিই অনিশ্চয়তা ব্যক্ত করে। এর অর্থ মহাবিশ্বকে নিয়ে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীর সুযোগ নেই। যা আছে তা সম্ভাব্য ইতিহাস। এ ক্ষেত্রে হিগস-বোসন পদার্থ গঠনসহ বিশ্ব গঠনের নিয়ামক বা নিশ্চিত বিষয় বলার সুযোগ নেই। কারণ অনিশ্চয়তার নীতি নিশ্চিত ফলাফল ঘোষণায় বাধা সৃষ্টি করে আছে। ফলে নিশ্চিত ফলাফল ঘোষণায় পদার্থবিজ্ঞানকে আরো অগ্রগামী হতে হবে। তাই হিগস-বোসনই পদার্থ তথা বিশ্ব কোথা থেকে কীভাবে? এ প্রশ্নের শেষ উত্তর নয়। আর এ কথায় বলা যায় আপাতত পদার্থবিজ্ঞানের মৃত্যু ঘটছে না এবং আমাদের শেষ প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া গেল। অর্থাৎ এ তত্ত্বই বিশ্ব গঠনের শেষ উত্তর নয়।

তাই ঈশ্বর*কণায় কোনো ঈশ্বর কর্ম নেই। জগৎ গঠনে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণার ফলাফলে এটি বলদায়ী কণা। যা হিগস-বোসন বা হিগস পার্টিকেল। এ বিষয়ে হকিং এর মন্তব্যটি স্মরণীয়। গবেষণার প্রাক্কালে ২০০৮ সালে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা যে অর্থে ঈশ্বর-কণা খুঁজতে চলেছ সে অর্থে তা পাওয়া যাবে না।' তিনি বলতে চেয়েছেন জগত গঠনের যে একটি সূত্রের খোজ চলছে হিগস পার্টিকেল তেমন সূত্র দিতে পারবে না। তবে হিগস-বোসন আবিষ্কারটি কণিকা তত্ত্বে নতুন কোনো দিক উন্মোচন করবে যা প্রচলিত বিজ্ঞানের ব্যবহার্য সামগ্রী তথা ফলাফলের মতো আরো উন্নত ফলাফল বয়ে আনবে।

www.pathagar.com

উপসংহার
Conclusion

উপসংহারটি গ্রন্থের মূল্যায়ন। ফিরে দেখা হয়েছে এ যাবত আলোচিত তত্ত্ব যা আবর্তিত হয়েছে মহাবিশ্বের তথা কালের শুরু এবং বিশ্বকে বোঝার উদ্ভাবিত অতিউত্তম বিধি নিয়ে। সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে মহাবিশ্বকে নিয়ে চূড়ান্ত কোনো তত্ত্ব আছে কি নেই অথবা বিশেষ সীমার বাইরে ঘটনাবলীর বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় কিনা। এ বিষয়ে হকিং—

> "We would never be quite sure that we have indeed found the correct theory, since theories can't be proved. But if the theory is mathematically consistent and always gave predictions so that agreed with observations. We could reasonably confident that it was the right. It would bring to an end a long and glorious chapter in the history of the humanity intellectual struggle to understand the universe- It would also revolutionize the ordinary person's understanding the laws govern the universe' (p-138).

অর্থাৎ 'আমরা কখনই নিশ্চিত হতে পারি না যে আমরা সঠিক তত্ত্বটিই আবিষ্কার করেছি কারণ তত্ত্বটি প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু তত্ত্বটি যদি গাণিতিক ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং সব সময়ই যদি সে তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে পর্যবেক্ষণ মিলে যায় তাহলে আমরা সঠিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি এরকম বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত হবে। এ আবিষ্কার মহাবিশ্বকে বুঝবার প্রচেষ্টায় মানব জাতির বুদ্ধির সংগ্রামের দীর্ঘ এবং গৌরবময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এই আবিষ্কার মহাবিশ্বের শাসন বিধি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করবে।'

আসলে মহাবিশ্বের শাসনবিধি উন্মোচিত হচ্ছে ধাপে ধাপে। নিউটনের সময় মহাবিশ্বের একটি রূপায়ণ সংগঠিত হয়েছিল। এরপর নতুন নতুন পর্যবেক্ষণের ফলে তত্ত্বগুলো সব সময়েই পরিবর্তীত হচ্ছে। এই তত্ত্বগুলো সাধারণ মানুষ বুঝবার মতো করে হজম করতে পারে না। বুঝতে গেলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ হতে হয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর অতিসামান্য অংশই আমরা বুঝতে পারি। এছাড়া বিগত শতাব্দী থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই বিকাশের গতি এত দ্রুত যে, স্কুল এবং কলেজে

www.pathagar.com

অনেকটা সেকেলে বিষয় পড়ানোর ফলে বিশ্বকে বোঝার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ মানুষ পশ্চাতেই থেকে যায়। গ্যালিলিও, নিউটনের সৌরজগতের রূপায়ণ আমরা ভালো বুঝি, তা শিশুদের পাঠ্য কিন্তু আইনস্টাইনের জগত বোঝে না। আবার আইনস্টাইন যারা বোঝেন তারা বর্তমান কোয়ান্টাম ম্যাকানিক্স বা কণাবাদী বিশ্ব বোঝে না। মহাবিশ্বকে নিয়ে আমাদের বৌদ্ধিক জগৎ এভাবেই বিকশিত হচ্ছে।

যদি আমরা সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারি তাহলেও তার অর্থ এমন হবে না যে আমরা সব জেনে গেছি বা সব ঘটনাবলী সম্পর্কে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব। তার কারণ দুটি। প্রথম কারণ হলো কণাবাদী বিজ্ঞান আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী করার ওপর একটি সীমা আরোপ করে আর তা হলো অনিশ্চয়তার বিধি। হকিং বলেন এই সীমা অতিক্রম করার কোনো ক্ষমতা আমাদের এখন পর্যন্ত নেই। আর দ্বিতীয় একটি সত্য অনুসারে খুব সহজ সরল পরিস্থিতি ছাড়া বিজ্ঞান নির্ভুলভাবে সমীকরণগুলোর সমাধান দিতে পারে না। যেমন নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্ব অনুসারে তিনটি বস্তুপিণ্ডের গতি সম্পর্কীয় সমীকরণ নির্ভুলভাবে সমাধান করা যায়নি। আমরা জীববিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের মৌলিক বিধিগুলো জানি। তা সত্ত্বেও গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে মানবিক আচরণ (Human behaviour) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার সাফল্য সামান্যই রয়েছে। তারপরেও আশা করা যাক, একগুচ্ছ বা একক কোনো বিধিতে মহাবিশ্বের বর্ণনা আমরা দিতে সামর্থ। সে অবস্থায় পারিপার্শ্বিকতার সম্মুখীন মানব জাতি আবার বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আবির্ভূত হবে। আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো আমাদের নিজস্ব অস্তিত্ব এবং আমাদের সকল পার্শ্বস্থ ঘটনাবলী সম্পূর্ণ বোঝা।

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে মহাবিশ্বের কয়েক শত গ্যালক্সির মধ্যে অনন্ত একটি ছায়াপথ বা আকাশনহর (Milky way) নামের একটি গ্যালাক্সির গোল্ডিলক জোন (goldilocks-zone) বা স্বর্ণাবৃত অঞ্চলে আমাদের বসতি। দশ হাজার কোটিরও বেশি উজ্জ্বল অনুজ্জ্বল তারকা সমষ্টি নিয়ে গঠিত প্যাচানো ও ঘূর্ণয়মান ছায়াপথ গ্যালাক্সির বর্ধিত বাহুতে আমাদের তারকা সূর্য ও তার গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে সূর্যের পরিবার বা সৌরজগৎ। এ সৌরজগৎ থেকে ছায়াপথকে ঘুরে আসতে লাগবে ২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ (আলো প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার গতিতে এক বছরে যে পথ অতিক্রম করে তাকে এক আলোকবর্ষ বলা হয়)। আমাদের সৌরজগত ভারসাম্য রক্ষা করে স্থিতিশীল আছে মহাকর্ষ বলের টানে। সূর্য ও তার গ্রহ এবং গ্রহসমূহের উপগ্রহ যার যার অবস্থানে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে স্ব স্ব কক্ষপথে আবর্তন করছে। পৃথিবী নিজ কক্ষপথে প্রতি সেকেন্ডে ১৮ মাইল গতিতে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আর নিজ অক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘোরে ঘণ্টায় ১১০০ মাইল গতিতে। সূর্য থেকে যে দূরত্বে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে সে দূরত্ব

www.pathagar.com

সামান্য কম হলে সূর্যের মহাকর্ষ বলের টানে পৃথিবী উত্তপ্ত সূর্যের মধ্যে নিপতিত হত। আর দূরত্ব সামান্য বেশি হলে সূর্য থেকে ছিটকে দূর আকাশে ভেসে যেত। সে ক্ষেত্রে পৃথিবী থাকত শীতল বা বরফে ঢাকা। আমাদের মতো মানুষ বা পরিবেশ থাকত না।

কণাবাদী বিজ্ঞান আবিষ্কারের পর আমরা মেনে নিয়েছি সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে ঘটনাবলীসমূহের ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। কারণ কিছু মাত্রায় অনিশ্চয়তা সব সময়েই থাকে। অবশ্য এলোমেলো অনিশ্চয়াতার দায়িত্ব ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই হস্তক্ষেপ হবে অদ্ভুত, কারণ সে হস্তক্ষেপ কোনো অভিমুখের উদ্দেশ্যে, এরকম কোনো প্রমাণ নেই। আর আমরা যদি মহাবিশ্ব বিষয়ক চূড়ান্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারি তাহলে তার অর্থই বা কী হবে? এ বিষয়ে আমরা কখনই নিশ্চিত হতে পারব না যে আমরা সত্যিই সঠিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি। কারণ সব তত্ত্বই প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু তত্ত্বটি যদি গাণিতিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং সব সময়েই যদি সে তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে পর্যবেক্ষণের ঐক্য দেখা যায় তাহলে আমরা সঠিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি এরকম বিশ্বাস করা যুক্তি সঙ্গত হবে। এই আবিষ্কার মহাবিশ্বকে বুঝবার প্রচেষ্টায় মানব জাতির বৌদ্ধিক সংগ্রামের দীর্ঘ ও গৌরবময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাবে।

মহাবিশ্বের বিষয়ের একটি প্রেক্ষাপট চিন্তা করলে আমরা দেখি নিউটনের তত্ত্ব প্রকাশের পর অন্তত একজন শিক্ষিত লোকের পক্ষে মানব জাতির মহাবিশ্বকে নিয়ে ভালো জ্ঞান থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সে জ্ঞানও আমারা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারিনি। এরপর থেকে নতুন নতুন তত্ত্ব হাজির হচ্ছে, প্রচলিত কারণগুলো পরিবর্তন হচ্ছে। এসব তত্ত্ব সাধারণ মানুষের বোঝার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। কারণ এসব তত্ত্ব সঠিকভাবে হজম হয় না, আবার তত্ত্বগুলো সরলাকৃতিরও হয় না। এগুলো বুঝতে গেলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ হতে হয়। কিন্তু তা হলেও বিজ্ঞানের বিধানের গতি এত দ্রুত যে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা পড়ানো হয় সেগুলো সব সময়েই একটু সেকেলে। জ্ঞানের দ্রুততার অগ্রসারতার সাথে শিক্ষিত লোকেরাও তাল রাখতে পারেন না। তবে একথাও ঠিক জ্ঞান বিকাশের দ্রুততার সঙ্গে শিক্ষিত মানুষ তো বটেই সাধারণ মানুষেরও বোধশক্তি এবং মহাবিশ্বকে বোঝার উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্যার এডিংটনের সময় আপেক্ষিক তত্ত্ব বুঝাতেন দুজন (এডিংটনের কথায়) কিন্তু এখনকার দিনে হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এ তত্ত্ব বোঝেন। কালে যদি সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব পাওয়া যায় তা হয়তো বুঝতে মানুষের অসুবিধা হবে না।

কালের প্রবাহে আমরা যদি সম্পূর্ণ একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করি তাহলে কয়েকজন বিজ্ঞানী কেবল নয় সে তত্ত্ব বুঝবে সবাই। ফলে দার্শনিক, বিজ্ঞানী এমনকি সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষেরাও সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। বোধগম্য হবে আমাদেরসহ মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ কী? অথবা যদি এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই তাহলে সেটাই হবে আমাদের চূড়ান্ত বিজয়। আমরা হয়তো তখন থাকবো না। কিন্তু যারা থাকবেন তারা ভাগ্যবান কারণ সেদিন তারা জানতে পারবেন ঈশ্বরের মন।

প্রাচীন গ্রীক, রোম, চীন, ভারতীয় সভ্যতার সময়কালে বা তার পূর্বে যে একমাত্র আরব সেমেটিক গোষ্ঠীর মধ্যে একেশ্বরবাদীতার বিশ্বাস জন্ম নিয়েছিল। জগৎ সৃষ্টির বিষয়ে তারা একমাত্র স্রষ্টার সৃষ্টিকর্ম হিসেবে স্রষ্টার প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করত। কিন্তু গ্রীক, চীনা, ভারতীয়দের মধ্যে দেবদেবী, ড্রাগন, পশু, প্রকৃতির নানা শক্তি, স্তুতি উপাসনা ছিল সংস্কৃতির অঙ্গ। তবে ব্যক্তি বিশেষে গ্রীকদের মধ্যে এবং আলেকজান্দ্রীয়ান সভ্যতায় চিন্তা, চেতনা ও বিজ্ঞানধর্মী জ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু মহাবিশ্বকে নিয়ে কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক মডেল বা যুক্তিশীল কাঠামো প্রস্তুত হয়নি। কেবল খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে টলেমি পৃথিবীকেন্দ্রীক যে মডেল প্রস্তুত করেন ধর্ম, দর্শন এবং বিজ্ঞানের নিরীক্ষায় তা ষোড়শ শতক পর্যন্ত বিশ্বাসের প্রধান মডেল হিসেবে কাজ করেছে।

বস্তুত মহাবিশ্ব তথা প্রকৃতির বিধি উন্মোচনের কাজটি শুরু হয় ষোড়শ শতকে কপারনিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার এবং নিউটনের পর থেকে। তবে এ বিষয়ে ব্যাপক কাজ শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। আর নানা মডেল ও বিধি উন্মোচনের মহা কর্মযজ্ঞ চলমান থাকে বিগত একশত বছর যাবৎ। কিন্তু একের পর এক প্রকৃতির বিধি উন্মোচন, তথ্য, তত্ত্ব, গাণিতিক সমীকরণে বিশ্বাযোগ্য মডেল প্রস্তুতের পরও যেন রহস্য থেকেই যায়। পরতে পরতে বিধির বিস্তৃতি এমন, যেন মহাবিশ্বটাই বিধির সমন্বয়ে একটি বাক্স। এর একটি বাক্সের চাবির সন্ধানে বাক্স খুলে দেখা যায় তার মধ্যে আর একটি বাক্স। সে বাক্সের চাবিও পাওয়া গেল। দেখা যায় তার মধ্যে আর একটি বাক্স। মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনে শেষ বাক্সের চাবির সন্ধান কি খুব দূরে? বিজ্ঞান যত দ্রুততার সঙ্গে অগ্রগামী হচ্ছে, এ ধারা ঠিক থাকলে এবং মানবজাতি অহেতুক ধ্বংসযজ্ঞ শুরু না করলে, রহস্য উন্মোচনের একনিষ্ঠতায় শেষ চাবির সন্ধান পেতে হয়ত অধিককাল অপেক্ষা করতে হবে না। অবশ্য এটা হবে বিজ্ঞানের প্রথম ধাপের সমাপ্তি। এরপর শুরু হবে মানুষের চিন্তন এবং আচরণবিধি উদ্ভাবনের দ্বিতীয় ধাপ।

www.pathagar.com

তত্ত্ব ও তথ্য বিন্যাস

১। A Brief History of Time- S.W. Hawking
২। The Grand Design- S.W. Hawking
৩। The Ultimate Fate of universe- S.W. Hawking
৪। Quantum cosmoloty- S.W. Hawking
৫। The Theory of Relativity- Albert Einstein
৬। The First Three Minute- Weinberg
৭। Quantum Theory and Spacetime- Roger penrose
৮। Cosmos- Karl Sagan
৯। পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের পাঠ্য বই
১০। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও লেখা
১১। পদার্থবিজ্ঞানের বিবর্তন- আলাবার্ট আইনস্টাইন ও লিওপোল্ড ইনফেল্ড।
১২। চরিতাভিধান- বাংলা একাডেমী
১৩। দর্শন শাস্ত্র ও ধর্ম শাস্ত্রের ওপর লেখা বিভিন্ন তুলনামূলক গ্রন্থ
১৪। দ্য গ্রান্ড ডিজাইন- পরিচিতি পর্যালোচনা- প্রফেসর মতিয়র রহমান
১৫। মহাবিশ্বের স্বরূপ- প্রফেসর মতিয়র রহমান
১৬। সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনে বিজ্ঞান- প্রফেসর মতিয়র রহমান

www.pathagar.com

অধ্যাপনার শেষপ্রান্তে এসে মতিয়র রহমানের লেখক জীবনে প্রবেশ। মূলত তিনি জগৎ ও সমাজ বিবর্তনের শেকড় সন্ধানী লেখক ও গবেষক। এ ধারায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দশ। রাজবাড়ি জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য গ্রন্থটি তাঁর বিশেষ অবদান। প্রচারবিমুখ নিভৃতচারী এ লেখক রাজবাড়ি শহরে বসবাস করেন। জন্ম ৩০ জুলাই ১৯৪৭, বিলমালেঙ্গা, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ি। ১৯৬৩ সালে প্রথম বিভাগে এসএসসি। ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। এ আন্দোলনে ২০ জানুয়ারি প্রথম শহীদ হন আসাদ। ঐ মিছিল ও আসাদের শব মিছিলে যোগদান। রাজবাড়ি সরকারি কলেজ, শরিয়তপুর সরকারি কলেজ এবং সব শেষে ২০০৪ সালে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

A Brief History of Time
from the Big-Bang to Blackhole
Parjalochona O Hig-Boson
Eyssor Kana Bitarko
By Professor Matiar Rahman
Published by Muktochinta
Price Tk. 200/-   US $ 20

978-984-521-091-1

www.pathagar.com